ারতী ।

সিক পত্রিকা ।

দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ।

অষ্টম খণ্ড ।

৮০৬ শক ।

লিকাতা

াহ্মসমাজ যন্ত্রে

াস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ।

...ভারতের সাধারণ ভাষা ..
...জ বংশের ইতিহাস ...
...য় প্রকার ...
বৎসর ...
...
... ...
...না ... ...
... ...
... ...
... ১
... ৩২১
... ৩২৩
য় ... ৪৫৮
... ৩৬, ১৩০
বাদ ... ১৭০, ২৭০, ৩
রা ... ৩৫৪
ন ... ২১৮, ২৯৬
... ৪৯৩
ণী ... ৫১
...সহকারে নরজাতির শারী... পরিবর্ত্তন
যা ... ২৬১
ান ... ১৫৩, ১৮৫, ৩৬৮
...ন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ... ৪৪৫, ৫০০
... ৫০৫
... ৫৬৬
... ৩৭৭, ৪২৫
ধ ... ৯৬
... ২০৮
... ১
...অনুরাগ ... ৩২৯, ৩৯৩
... ৩৬০
... ১৯২
... ২২৩
...চনা ১৭৯, ২৭৮, ৩২৭, ৩৭৪, ৪২৪, ৪৭২,
... ২২৮
... ১৯১
...দর্শন ২৪৮
...ড়ী ... ৪১৭, ৪৫০, ৫১৯, ৫৩২

		পৃষ্ঠা
	...	১৪৯
	...	৬২
	...	২৬৫
	... ...	৩৫৫, ৪১৩, ৪৪৫ ৪৭৯
থা	... ...	১৪৩
	... ...	১৮৪
	... ...	৫০৪
	... ...	৩৪০
	... ...	৬৮
	... ...	১৩৭
	... ...	১২০
	... ...	৩০৯
	... ...	৪০০
	... ...	৪০৮
	... ...	৫২৩
	... ...	৪১
	... ...	৭৫
	... ...	৪৩৩, ৪৭৩
	... ...	৩০০
	... ...	৪৭০
	... ...	১২৫
	... ...	১৯৮, ২৮৯, ৩৩৫
	... ...	১৮
	... ...	৪২৩
	... ...	২০৭
দ শ্রবণে	... ...	৩২৭
থে	... ...	২০৬
গু	... ...	৫৪
তুর্থ অবস্থা	... ...	১৬০
সিদ্ধান্ত	... ...	৮৯, ১৭৫
	... ...	৫৫৩
শিক্ষা	... ...	২৮১
	... ...	৯
ব্রাহ্মণ ভৌমিকের ইতিহাস	... ...	৫৩৮
বাহ	... ...	৪৮০
বিবাহ (প্রতিবাদ)	... ...	৫৪৪
চিন্তা	... ...	২৯৫
	... ...	৫৪৪
স্কুলের গুরু	... ...	১৬৭
ছাত্র জীবন	... ...	৮১, ১৪০

ভূমিকা।

এই পত্রিকায় এবার ভূমিকা শীর্ষক রচনাটি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—ভারতীর এবার ভূমিকায় প্রয়োজন কি। ভারতী বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নহেন সত্য বটে, কিন্তু ভারতীর জীবনে যে এক বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা পাঠকমণ্ডলীকে আমাদিগের জ্ঞাত করাইতে হইতেছে।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা মহাশয় বর্ত্তমান বৎসর হইতে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে আমরা উক্ত ভার গ্রহণ করিলাম।

ভারতী এত দিন যেরূপ উৎকৃষ্ট রূপে সম্পাদিত হইয়া আসিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট রূপে ইহা সম্পাদন করা দুর্ঘট, সে আশা দূরে থাক্‌, ভারতীর পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা সমান রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট, কিন্তু কেবল এই আশার বশবর্ত্তী হইয়া যে আমরা ভারতী গ্রহণ করিয়াছি এমন নহে, কিম্বা এতদিন এই পত্রিকার সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ থাকায় ইহার প্রতি যে মমতা জন্মিয়াছে—সেই মমতাও আমাদের এ গুরু-ভার গ্রহণ করার প্রধান কারণ নহে। আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত যিনি এই পত্রিকা এমন সুন্দর রূপে চালাইয়া আসিয়াছেন, অন্য কার্য্য বশতঃ এখন তাঁহার সময় অভাব হইয়াছে, সে নিমিত্ত তিনি যখন সম্পাদকীয় ভার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন তখন ভারতী উঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল. আমাদের দেশের এবং বাঙ্গলা ভাষায় বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীর ন্যায় কোন একখানি পত্রিকার অকাল মৃত্যু বড়ই কষ্টকর। এই-রূপ অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাতেই আমরা ভারতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছি। পূজনীয় ভারতীর পূর্ব্বতন সম্পাদক মহাশয় তাঁহার প্রতিভাকে স্বদেশের উপকার সাধন ব্রতে ব্রতী করিয়া ১২৮৪ সালে ভারতী পত্রিকা সংস্থাপন করেন এবং গত সাত বৎসর ধরিয়া ভারতীকে বহু-যত্নে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, অঙ্ক প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া, পিতার ন্যায় সস্নেহে লালন পালন করিয়া, এখন তিনি ভারতীকে হস্তান্তরে সমর্পণ করিলেন।

মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় কন্যা গভীর দুঃখে অশ্রুজল ফেলিতে থাকেন, তাঁহার পিতামাতা স্বজনবর্গও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়েন তাঁহাদের সাধের প্রতিমা পরের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল—তাঁহাদের মত যত্ন আদর তাহাকে আর কে করিবে। শ্বশুরালয়ে আসিয়া কন্যা যখন দেখিতে পায়—এখানেও তাহাকে আদর করিবার, এখানেও তাহাকে যত্ন করিবার লোক আছে. এখানেও তাহার মলিন মুখ দেখিলে

ক্ষ

প্রাণে ব্যথা পাইবার লোক আছে, এখানেও তাহাকে সুখী করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবার লোক আছে, তখন সেই যত্নে সেই আদরে কন্যা ক্রমে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া উঠে এবং কন্যাকে সুখী দেখিয়া কন্যার পিতা মাতা আত্মীয়বর্গও তখন সুখী হইয়া থাকেন। ভারতীর সম্বন্ধেও আমরা পাঠকদিগকে বিনীতভাবে বলিতেছি যে ভারতী আমাদের হইয়া অযত্নে পড়িবেন না—ভারতীর পূর্ব্বতন বন্ধুগণ তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত যেরূপ শ্রম স্বীকার করিতেন আমরাও ভারতীর জন্য সেইরূপ শ্রম স্বীকার করিতে চেষ্টা করিব। আর এক কথা, কন্যা শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, পিতা মাতা তাহার পর হইয়া যান না, তাঁহারা পূর্ব্বেও যেমন আপনার ছিলেন এখনও তেমনি থাকেন, পূর্ব্বেও যেমন স্নেহ করিতেন এখনও তেমনি স্নেহ করেন—সেইরূপ ভারতী হস্তান্তরিত হইল বলিয়া পূর্ব্বতন বন্ধুদিগের সহিত ইহার সম্বন্ধ রহিত হইল না, তাঁহারা পূর্ব্বেও ইহাঁকে যেরূপ যত্ন করিতেন এখনও ইহাঁকে সেইরূপ যত্ন করিবেন। সুতরাং অন্য গৃহে আসিয়াও পাঠকদিগের নিকট ইনি সেই [পূ]র্ব্বের ভারতীই রহিলেন। সেইজন্য [illegible] করিয়া এই পত্রিকার উদ্দেশ্যাদি বর্ণনা করা যে তেমন আবশ্যক নহে। তবে ভারতী নূতন সম্পাদকের হাতে আসিয়াছেন, আবশ্যক থাক্ আর নাই থাক্, কি প্রণালীতে নূতন সম্পা[দ]ক এই পত্রিকা চালাইতে চাহেন তাহা [illegible]কবার বলা একটি চিরন্তন প্রথা।

সেই জন্য ভারতীর ন্যায় জনসাধারণের পাঠোপযোগী মাসিক পত্রিকার কি কি উদ্দেশ্য, আর আমরা কি কি প্রকারে সেই সকল উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাই, তাহা সংক্ষেপে বলিতে [illegible] হইতেছি।

প্রত্যেক দ্রব্য [illegible] আমরা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি[illegible]—ইহার প্রয়োজন কি, সুতরাং মাসি[illegible]ত্রিকা সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন লোকের মনে উ[দিত] হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে আজ কাল এত মাসিক পত্রিকা দেখা যায়, যে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই মাসিক পত্রিকার প্রয়োজন কি অর্থাৎ ইহা হইতে আমাদের কি কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে—তাহা অবগত আছেন। ইহা সত্ত্বেও এবিষয়ে আমরা দু একটি কথা বলিতে চাই মাসিক পত্রিকা হইতে আমাদিগের কি উপকার হইতে পারে? আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত, অধিকাংশ লোকই অন্ন বস্ত্রের আয়োজনে নিযুক্ত; এই সকল লোকের যে কিছু অবকাশ থাকে তাহা বিশ্রাম করিতেই বোধ হয় নিঃশেষিত হইবা যায়, ইহাঁদিগের নিঃস্বার্থ ভাবে চিন্তা করার সময় হইয়া উঠে না। আমরা কতবার আগুণ জলিতে দেখিয়াছি, কতবার ঐ আগুণে কাষ্ঠ ভস্ম হইতে দেখিয়াছি, কতবার ঐ আগুণ হইতে ধূম উঠিতে দেখিয়াছি। কিন্তু কাষ্ঠ পুড়িয়া যখন আগুণ হয়, তখন কাষ্ঠের কি পরিবর্ত্তন হয়, কাষ্ঠের মধ্যে কোন অংশই বা ধূম হয় আর কোন অংশই বা ভস্ম হয় ইহা

আমাদিগের মধ্যে কয় জন লোকে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা না করার কারণ এই যে আমরা সাধারণতঃ সাংসারিক কার্য্যে এত ব্যস্ত যে যাহাতে আমরা অব্যবহিত ভাবে কোন উপকার দেখিতে পাই না, তাহাতে আমরা সময় দিতে প্রস্তুত নহি। যে কার্য্য করিলে আমরা দুই মণ চাউলের সুবিধা করিতে পারিব কি দুই থান বস্ত্রের সুবিধা করিতে পারিব, আমরা সে কার্য্যে সময় দিতে প্রস্তুত থাকি, কিন্তু কাণ্ডের কোন্ অংশ ভস্ম হয় তাহা জানিয়া আমরা ঐ রূপ কোন উপকারের সম্ভাবনা অব্যবহিত ভাবে দেখিতে পাই না. সুতরাং আমরা ও বিষয় জানিতেও তত উৎসুক নহি। আবার এদিকে ইহাও দেখিতে হইবে যে আমরা যদি মনের বৃত্তি গুলির স্ফূর্ত্তি আকাঙ্খা করি, তাহা হইলে আমাদিগের নিঃস্বার্থ ভাবে চিন্তা করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। আমাদের স্বার্থসিদ্ধি হইবে ভাবিয়া যে সকল কার্য্যে আমরা ব্যাপৃত থাকি সে সকল কার্য্য করিবার সময় হয়ত অন্যের হিতাহিতের উপর আমাদের যথোপযুক্ত মনোযোগ না থাকিতেও পারে, তখন আমাদিগের নিজের সামান্য সামান্য বৈষয়িক চিন্তাকেই আমরা প্রাধান্য দিতে পারি, এবং এইরূপ ভাবে চিন্তা করিয়া আমাদিগের মন চুম্বক শলাকার ন্যায় একদিকেই নামিয়া পড়ে, এরূপ অবস্থায় আমাদিগের সত্য নিরূপণ ক্ষমতা হ্রাস হইয়া যাইতে পারে আর তাহা হইলে সমাজের উন্নতি পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা। সমাজের এই ক্ষতি সম্ভাবনা দূর করিবার অভিপ্রায়ে, সমাজস্থ সাধারণ ব্যক্তিদিগকে নিঃস্বার্থ ভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দেওয়ার বাসনায়, সাধারণের মনের যথাসম্ভব সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব বিধান করিবার উদ্দেশ্যে সমাজের মধ্যে কেহ কেহ মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রকার মাসিক পত্রিকায় সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির আলোচনা করা হইয়া থাকে আর লোকে অবকাশ মতে ঐ পত্রিকা পাঠ করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বৈষয়িক চিন্তা হইতে দূরে থাকিয়া স্ব স্ব মানসিক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন। জন সাধারণের মানসিক সৌষ্ঠব বিধানই মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্য; এখন দেখা যাউক মনের কি কি বিভাগ আর কি কি প্রকারে ঐ সকল বিভাগের উৎকর্ষ সংসাধিত হইতে পারে। আমাদিগের মনে তিন শ্রেণীর ঘটনা দেখা যায়; অনুভূতি, উদ্যম, আর জ্ঞান। আমরা সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারি, এই অনুভব কার্য্যকে অনুভূতি বলা যাইতে পারে; আমরা সুখ প্রাপ্তির কি দুঃখ নিবারণের অভিপ্রায়ে শক্তি প্রয়োগ করিতে উদ্যত হই, এই উদ্যত হওয়াকে উদ্যমন্ বলা যাইতে পারে; আর আমরা যে সকল বিষয় আমাদিগের মনে উপস্থিত হইতে দেখি, তাহাদিগের মধ্যে কোন্টী কি এই যে উপলব্ধি তাহার নাম জ্ঞান।

মনুষ্যের মনের অবস্থা সকল দিকে উন্নত করিতে হইলে, জ্ঞান, অনুভূতি ও উদ্যমন এই তিন প্রকার মানসিক ঘটনার

নিমিত্ত মনে যে তিনটী বৃত্তি আছে, সে তিনটী বৃত্তিরই উন্নতি হওয়া আবশ্যক। এখন দেখা যাউক জ্ঞান বৃত্তির কি প্রকৃতি আর কি প্রকারে ইহার উৎকর্য জন্মিতে পারে। কোন বিষয়ে আমাদিগের সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ঐ বিষয় আমাদিগের প্রত্যক্ষ হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ আমাদিগের কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ বিষয় আমাদিগের মনে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, তাহার পর এই বিষয়টি ইহার পূর্ব্বের প্রত্যক্ষীভূত কোন বিষয়ের সদৃশ কি না—ইহা নির্ণয় করার উদ্দেশে পূর্ব্বে যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ হইয়াছে কল্পনা দ্বারা তাহা মনে করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। যদি পূর্ব্বের কোন একটি বিষয় এইরূপে আপাততঃ প্রত্যক্ষমান বিষয়ের সদৃশ দেখিতে পাই—তবে এই সদৃশ বিষয়টি কল্পনার সাহায্যে ও অপর বিষয় ইন্দ্রিয় কিম্বা কল্পনার সাহায্যে মনের মধ্যে দাঁড় করাইয়া তখন এই দুই বিষয়ের মধ্যে কি কি সাদৃশ্য আছে তাহা দেখিতে হয়, যদি কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তবে ঐ সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া উহাদিগকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে পারা যায়। এইরূপে অবভাস-জগতে (phenomenon) কোন বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যেমন আমি একটী বস্তু দেখিলাম, তাহার চারিটি পা, একটী লেজ, গায়ে লোম, ঘাড়ে কেশর আর তাহার আকৃতি বিশেষ এক প্রকারের, ইহা প্রত্যক্ষ করার পর আমি পূর্ব্বে ঐ প্রকার আর কোন বস্তু দেখিয়াছি কি না ইহা কল্পনা দ্বারা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিলাম, আমি মনে দেখিতে পাইলাম যে ঐ প্রকার অনেক বস্তু দেখিয়াছি, সুতরাং ঐ বস্তুটী এই সকল বস্তুর সহিত এক শ্রেণীর ইহা স্থির করিয়া আমি ইহাকে একটী ঘোড়া বলিয়া জানিলাম। এখন দেখা যাইতেছে যে জ্ঞানের তিনটী সোপান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, কাল্পনিক-জ্ঞান, আর সামান্য-জ্ঞান; (যেরূপ জ্ঞান দ্বারা আমরা দ্রব্যদিগের সামান্য অর্থাৎ সাধারণ গুণ গুলি উপলব্ধি করি তাহার নাম সামান্য-জ্ঞান)। জ্ঞানবৃত্তির উন্নতি করিতে হইলে উহার এই তিন সোপানের উন্নতি হওয়া আবশ্যক; আর একত্রে এই তিন প্রকার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত (বাহ্যিক ও আন্তরিক) বিজ্ঞান চর্চ্চা যত কার্য্যকারী তত বোধ হয় আর কিছুই নহে। বিজ্ঞানে প্রকৃতির ঘটনাগুলি যত্নের সহিত লক্ষ্য করিতে হয়, পরে কল্পনাদ্বারা ঐ সকল ঘটনাগুলি মনের মধ্যে একত্র করিতে হয় আর অবশেষে উহাদিগের মধ্যে কোন সাধারণ গুণ আছে কি না তাহা উপলব্ধি করিতে হয়। এইরূপে বিজ্ঞানে প্রকৃতির নিয়মগুলি অর্থাৎ প্রকৃতির ঘটনাগুলির মধ্যে যে সকল সাধারণ সম্বন্ধ সকল স্থানে সকল সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় সে সকল সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হয়। বিজ্ঞানে ঘটনাগুলি যত্নের সহিত লক্ষ্য করিতে হয়, অর্থাৎ যাহা প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছে তাহাই আমরা দেখিয়াছি বলি; আর যে বিষয় দেখিতে হইতেছে তাহার সমুদয় অবস্থাদি দেখিতে চেষ্টা

করি। আমরা যখন কোন পদার্থ লক্ষ্য করি তখন তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় আমরা প্রকৃত পক্ষে দেখি আর কতকগুলি বিষয় আমরা প্রকৃতপক্ষে না দেখিলেও বোধ হয় যেন দেখিতেছি। যেমন যখন আমরা দূরে একটী গোলাপ দেখি, তখন যাহা দেখিতে পাই তাহা একপ্রকার বর্ণ ও আকৃতি মাত্র, অন্য যেসব দেখি বলিয়া বোধ হয়, যেমন গোলাপের দলের কোমলতা, তাহা কল্পনা দ্বারা দেখি, প্রত্যক্ষ দেখি না; আমরা পূর্ব্বে যখন একটি গোলাপ হাতে করিয়া দেখিয়াছি তখন গোলাপের বর্ণ ও আকৃতি দর্শন দ্বারা আর কোমলতা স্পর্শ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এখন আবার দূর হইতে যখন গোলাপের বর্ণ ও আকৃতি মাত্র দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি তখন কোমলতাও প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া বোধ হয়। * এইরূপে দেখা যাইতেছে যে অনেক সময় আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি মনে করি তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ না করিয়া থাকিতেও পারি। বিজ্ঞানে কোন বিষয় দেখার সময় ঐ বিষয় সম্বন্ধে কি কি প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষ করা হয় তাহা সত্বের সহিত নির্ণয় করিতে হয়। সাধারণতঃ কোন বিষয় দেখার সময় আমরা উহার অবস্থার কতক অংশ বা দেখি আর কতক অংশ বা দেখি না। বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে কোন বিষয় লক্ষ্য করিতে হইলে সে বিষয়ের অবস্থা যতদূর সম্ভব সর্ব্বাঙ্গীন পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে বিজ্ঞান আলোচনায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান শক্তির উন্নতি হয়। বিজ্ঞানে কাল্পনিক জ্ঞানশক্তির অর্থাৎ কল্পনাশক্তিরও উন্নতি হয়; দ্রব্যাদিগের শ্রেণী নির্ব্বাচন করার উদ্দেশ্যে ঐ সকল দ্রব্য কল্পনাদ্বারা মনের মধ্যে উপস্থিত করিতে হয়, পরে উহাদিগের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হয়; এক এক শ্রেণীর কতকগুলি সামান্য বা সাধারণ গুণ থাকে। পরে আমরা কল্পনা-দ্বারা ঐ সকল শ্রেণীগুলি মনের মধ্যে আনয়ন করি অর্থাৎ এই সকল শ্রেণীর সামান্য গুণ সমষ্টিগুলিকে মনের মধ্যে উপস্থিত করি; আর তখন দেখি এই সকল শ্রেণীগুলির মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কি না অর্থাৎ এই সকল সামান্যগুণ সমষ্টিগুলির মধ্যে কোন সামান্য গুণ আছে কি না, এইরূপে আমরা প্রথমতঃ যে সকল শ্রেণী নির্দ্দেশ করি তাহাদিগকে আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করি, পরে তাহাদিগকে আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করি। এই প্রকারে অবশেষে উচ্চতম শ্রেণীগুলি নির্দ্দেশ করা হয়। যেমন গো, অশ্ব, বানর ইত্যাদি শ্রেণীদিগকে স্তন্যপায়ী; সারস, হংস, বক ইত্যাদি শ্রেণীদিগকে পক্ষী; ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভেকদিগকে উভচর; শফরী, রোহিত ইত্যাদি শ্রেণীদিগকে মৎস্য; ফড়িং, আর্সুলা ইত্যাদি

* গোলাপের কি অন্য কোন দ্রব্যের আকৃতি আমরা দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করি এ কথা কতদূর সত্য তাহা সুবিধা হইলে আর এক প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রেণীদিগকে পতঙ্গ, এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীদিগকে আবার উচ্চতর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পরে স্তন্যপায়ী, পক্ষী, উভচর ও মৎস্য এই কয় শ্রেণীর পৃষ্ঠ দণ্ড আছে দেখিয়া ইহা-দিগকে পৃষ্ঠদণ্ডী আর পতঙ্গ ও অন্যান্য যে সকল শ্রেণীর জন্তুর পৃষ্ঠদণ্ড নাই তাহা-দিগকে অ-পৃষ্ঠদণ্ডী বলা যাইতে পারে। আবার শেষে এই দুই উচ্চশ্রেণীকে জন্তু এই উচ্চতম শ্রেণীর অন্তর্গত করা যাইতে পারে। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে বিজ্ঞান আলোচনায় পদে পদে কল্পনা-শক্তির কার্য্য আছে। সুতরাং বিজ্ঞান আলোচনায় কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ উন্নতি সম্ভাবনা ; বিজ্ঞান আলোচনায় যে সামান্য-জ্ঞান শক্তির উন্নতি হয়, তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না, কারণ বিজ্ঞা-নের মুখ্য উদ্দেশ্যই দ্রব্য সকলের সামান্য অর্থাৎ সাধারণ গুণ গুলি লক্ষ্য করিয়া উহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা ও উহাদিগের সাধারণ নিয়ম গুলি আবিষ্কার করা। পাঠকদিগকে আমরা এই স্থলে বলিতেছি যে বিজ্ঞান শব্দে এই প্রবন্ধে কি প্রাকৃতিক কি মানসিক কি সামাজিক সকল প্রকার বিজ্ঞানই বুঝিতে হইবে। জ্ঞান বৃত্তির উন্নতি করার নিমিত্ত যেমন বিজ্ঞান-আলোচনার আবশ্যক, অনুভূতি বৃত্তি ও উদ্যমন বৃত্তির উন্নতির নিমিত্ত আবার সেই রূপ কবিতা, ইতিহাস, উপন্যাস ইত্যাদি পাঠ করা আব-শ্যক। প্রকৃত সৌন্দর্য্য, প্রকৃত মাহাত্ম্য ই-ত্যাদি বিষয় কাহাকে বলে তাহা উদাহরণে দেখানই কবিতা ও উপন্যাসের উদ্দেশ্য।

কবিতা ও উপন্যাসে এক প্রভেদ এই যে পদ্যে যে গুণের বর্ণনা করা হইতেছে সেই গুণই প্রকাশ্যতঃ মুখ্য বিষয় করা হয়, উপ-ন্যাসে কোন একটী গুণ মুখ্য করার অভি-প্রায় থাকিলেও তাহা অন্যান্য কয়েকটী গুণের পার্শ্বস্থ একটী গুণ বলিয়া প্রকাশ করা হয়। এই স্থলে ইহার ভিন্ন ভিন্ন দুইটি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। সীতা কাব্যের নায়িকা— শকুন্তলা—(কাব্যাকার) উপন্যাসের না-য়িকা। সীতার পতিপরায়ণতা দেখানই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য, সীতার প্রতি কার্য্যে প্রতিবাক্যে ঐ এক ভাবই আঁকিতে কবি প্রাণপণে প্রয়াস করিয়াছেন, ইঁহার আনু-ষঙ্গিক মানুষ হৃদয়ের অন্য কোন ভাব যেন কবি সীতাতে প্রকাশ করিতে চাহেন না। যখন রাম বনে গমন করিতেছেন তখনও সীতা ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে-ছেন, স্বর্ণলঙ্কা পুরীতে শত শত দাসী বেষ্টিত হইয়াও সীতা রামবিহনে শূন্যপ্রাণে তাঁহারি ধ্যান করিতে মগ্ন আছেন আবার সেই পতি প্রাণা সতী রাম কর্ত্তৃক নির্দ্দয়রূপে বনবাসে প্রেরিত হইয়াও স্বামীর মঙ্গল কামনা করিয়া অশ্রু ফেলিতেছেন জন্মে জন্মে তাঁহার মত স্বামী পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। সীতাকে কবি মানুষ করিয়া আঁকেন নাই রাম ছাড়া সীতার মনে আর যেন কোন চিন্তা নাই আর যেন কোন ভাব নাই; একমাত্র পতিপরায়ণতা ভাবই সীতাতে মূর্ত্তিমতী। আর শকুন্তলা? শকুন্তলার প্রেম কি সীতার মতই গভীর, নিঃস্বার্থ—দুষ্মন্তময় নহে? ত-থাপি শকুন্তলা মানুষ। শকুন্তলার প্রেম গভীর —কিন্তু তথাপি শকুন্তলার অন্য হৃদয় ভাব একেবারে মুছিয়া যায় নাই। কালিদাস শকু-ন্তলার প্রেমকে মুখ্য পদবীতে দাঁড় করাইয়া অন্য সকল আনুষঙ্গিক ভাবও গৌণরূপে আঁকিয়াছেন। তাই পতিপ্রাণা দুষ্মন্তময় জীবনা শকুন্তলা স্বামী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া অপমানিত হৃদয়ে সরোষে বলিতে-ছেন "অনার্য্য আত্মনো হৃদয়ানুমানেন প্রে-ক্ষসে। ক ইদানীম অন্যো ধর্ম্মকঞ্চুকপ্রবে-শিনস্ তৃণচ্ছন্ন কূপোপমস্য তব অনুকৃতিং প্রতিপৎস্যতে।" 'হে অনার্য্য তুমি আপ-

মার হৃদয়ের দৃষ্টান্তে অন্যের হৃদয় দেখিতেছ, তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় ধর্ম্ম-বেশধারী যে তুমি-তোমার অনুকরণ আর কে করিবে।” ইহাতে শকুন্তলার পতিপরায়ণতার অভাব প্রকাশ পাইতেছে না। শকুন্তলা ভাবিতেছেন বনবাসিনী, মুনিকন্যার প্রাণ মন হৃদয় দুষ্মন্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া এখন তাহাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন; দেবতার মত বিশ্বাস করিয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়া শকুন্তলা যাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে আজ সে শকুন্তলাকে গ্রহণ করিবার অনিচ্ছায় চিনিতে না পারার ভাণ করিয়া রমণীয় সারধন যে সতীত্ব তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে, সব সহ্য করা যায় কিন্তু প্রণয়ীর নিকট হইতে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য, প্রতারণাময়-এরূপ বৃথা সন্দেহ রমণীর অসহ্য। দুষ্মন্তের এই আচরণে মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হইয়া শকুন্তলা আত্মহারা হইয়াছেন। এইখানে কবি প্রেমকে মুখ্য করিয়া মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ উহার আনুসঙ্গিক বিরোধী ভাবও পূর্ণরূপে, আঁকিয়া দেখাইয়াছেন।

পদ্যে কল্পনা শক্তির বিলক্ষণ প্রয়োগ হইয়া থাকে তবে পদ্য প্রভৃতির কল্পনা আর বিজ্ঞানের কল্পনা এই দুয়ে একটী প্রধান প্রভেদ এই যে বিজ্ঞানে সাধারণতঃ দ্রব্যগণের সামান্য-গুণ গুলি অর্থাৎ যে সকল গুণ কতকগুলি দ্রব্যের মধ্যে সাধারণ সেই সকল গুণ ঐ দ্রব্যগুলি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কল্পনা করিতে হয়, আর কবিতা প্রভৃতিতে (সত্য, ন্যায়, বীরত্ব, ইত্যাদি কোন বিশেষের চিত্র অঙ্কিত করার অভিপ্রায় থাকিলেও) তাহা উদাহরণে দেখাইবার নিমিত্ত আমরা রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদি সর্ব্ব গুণ-বিশিষ্ট কোন বিশেষ দ্রব্যের কল্পনা করি। যেমন, বিজ্ঞানে আমরা পদার্থ সমূহ পরীক্ষা করিয়া এই অনুমান করি যে সকল পদার্থই পরমাণু হইতে প্রস্তুত আর তখন আমাদিগের ঐ সকল পরমাণুর কতকগুলি সাধারণ গুণ কল্পনা করিতে হয়। পরমাণুগণ কিরূপে নড়ে কিরূপে পরস্পরকে আকর্ষণ করে—ইত্যাদি সমুদয় বিষয় আমরা কল্পনা করিয়া থাকি—অথচ আমরা কখনও এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করি না। আর কবিতায় আমরা যখন রাবণের ন্যায় দশ মস্তক বিশিষ্ট অদ্ভুত মানুষও কল্পনা করি তখনও সে কল্পনা আমাদের প্রত্যক্ষ পদার্থের রূপান্তর মাত্র। রাবণের মত দশ মুণ্ড একটি বীর পুরুষ আমরা প্রত্যক্ষ করি না বটে, কিন্তু আমরা এক মুণ্ড বীর পুরুষ দেখিতে পাই,—একমুণ্ড হইতে ক্রমে সেইরূপ দশ মুণ্ড কল্পনার দ্বারা একমুণ্ড বীর পুরুষে বসাইতে পারি—এবং এক মুণ্ড বীরের যে বীরত্ব দেখিয়াছি—তাহা হইতে শত শত গুণ অধিক বীরত্ব তাহাতে আরোপ করিয়া রাবণের ন্যায় এক জন বীর পুরুষ কল্পনা করিতে পারি। এইরূপে আমরা কাব্যে যাহা কল্পনা করি না কেন তাহা রূপরসগন্ধস্পর্শাদি গুণ যুক্ত একটি বিশেষ পদার্থ মাত্র। সুতরাং এক অর্থে বিজ্ঞানের কল্পনা কাব্যের কল্পনা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর কেন না বিজ্ঞানের উচ্চতর কল্পনায় প্রত্যক্ষ পদার্থ হইতে পৃথক্‌কৃত সামান্য গুণ সমষ্টি মনের মধ্যে উপস্থিত করার চেষ্টা করিতে হয় আর কাব্যের কল্পনায় সমুদায় গুণ যুক্ত বিশেষ কোন একটী দ্রব্য উপলব্ধি করিতে হয়; যাঁহারা উভয় প্রকার কল্পনার সহিতই বিশেষ পরিচিত আছেন, তাঁহারা বোধ হয় বলিবেন যে সামান্য-গুণ সমষ্টি কল্পনা করা বিশেষ কোন একটী দ্রব্য কল্পনা করা অপেক্ষা অধিক আয়াসসাধ্য। কবিতা, উপন্যাস, ও ইতিহাসপাঠে আমাদিগের উদয়মন্ বৃত্তির উন্নতি সাধন পক্ষে বহুল উপকার সম্ভাবনা। ইতি-

হাসে আমরা দেখিতে পাই মনুষ্য প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে কোথায় কিরূপ ব্যবহার করিয়া কিরূপ সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছে, কবিতা ও উপন্যাসে ঐ বিষয়গুলি কল্পনা দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া চাকচিক্য শালী হয় এবং ইহাতে উহার মনোহারিত্ব আরো বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি মনের যে কয়টী বৃত্তি আছে তাহাদিগের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মানসিক শিক্ষা আবশ্যক। বিজ্ঞানে জ্ঞানবৃত্তির আর কবিতা, উপন্যাস, ইতিহাসে অনুভূতি ও উদ্যমন বৃত্তির বিশেষ উন্নতি সম্ভাবনা। আমরা যদি আবার প্রকৃতির মধ্যে আমাদিগের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিতে চাই, আমরা যদি প্রকৃতির বাহ্য অবস্থা দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে না চাই, আমরা যদি দৃশ্যমান প্রকৃতির গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করিতে চাই, তবে আমাদিগের দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করা আবশ্যক। যদি আমাদিগের মন তাহার সীমা কোথায় জানিতে চাহে—তবে আমাদিগের দর্শনশাস্ত্র অবহেলা করা উচিত নহে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে—অঙ্ক, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, জীবন বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান রাজনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি বিজ্ঞান, দর্শন কবিতা আর উপন্যাসাদি এই সকল গুলিই মাসিক পত্রিকার সাধারণ আলোচ্য-বিষয় এবং এতদিন পর্য্যন্ত ভারতীতে এই সকল বিষয়ই (অধিকই হউক কি অল্পই হউক) আলোচনা হইয়া আসিয়াছে আমরাও এখন এ সকল বিষয়ে ভারতীর প্রতিষ্ঠা সমান রাখিতে চেষ্টা করিব। তবে আমরা এখন হইতে বিজ্ঞানের মাত্রা কিছু বাড়াইতে ইচ্ছা করি—আমাদের মতে বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ উপকারিতা আছে এবং আজ কাল এদেশে বিজ্ঞান আলোচনার কতক অনুরাগও দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষীয় মহিলাগণ আজ কাল বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন অথচ তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ইয়োরপীয় কোন ভাষার সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকায় তাঁহারা বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে অপারক তাহা ছাড়া ইংরাজি জানিয়াও অনেক স্ত্রীপুরুষ অধিক সময় বা অর্থ দিয়া বিজ্ঞান আলোচনা করিতে পারেন না সেই জন্য ভারতীতে সহজ ভাষায় বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনার বিশেষরূপে ইচ্ছা রহিল। পরিশেষে সম্মান-পুরঃসর বক্তব্য এই যে বঙ্গীয় পাঠক ও সমালোচক মণ্ডলী এই পত্রিকার প্রতি এতদিন যে সমাদর দেখাইয়া আসিয়াছেন, এখন যেন তাঁহারা সেই সমাদরের হ্রাস না দেখান। ভারতী এইবার অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, বঙ্গদেশে ইহাঁর এই সময়ের মধ্যে আকাঙ্ক্ষানুযায়ী প্রতিপত্তি হইয়াছে; কিন্তু তথাপি স্বদেশানুরাগী ও মাতৃভাষানুরাগী বঙ্গীয় পাঠকগণের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ভারতীর এখনও তরুণ বয়স, সুতরাং ইহাঁর প্রতি এক্ষণে শিথিলযত্ন হইলে ইহাঁর সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্তি পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে।

ভারতী।

স্থান-মান।

(গত বারের অনুবৃত্তি)

অণুর মধ্য দিয়া প্রসারিত ঋজুতনু। ঋজুতনুর বর্দ্ধিত এবং দ্বিধা-বর্দ্ধিত তনু। বর্দ্ধিত তনুর বর্দ্ধিতাংশ। করের প্রবর্দ্ধিত এবং অপবর্দ্ধিত তনু। ভিন্নাকর কর-দ্বয়। সমদিক্‌বর্ত্তী ভিন্নাকর কর-দ্বয়। এক ঋজুতনু-দ্বারা আর এক ঋজুতনুর কর্ত্তন এবং উভয়ের ছেদ-স্থান। এক ঋজুতনু-দ্বারা আর এক ঋজুতনুর সমসূত্র-কর্ত্তন। ঋজুতনু-দ্বয়ের মিলন-স্থান এবং সম্মিলিত ঋজুতনু-দ্বয়। ঋজুতনুর সমপৃষ্ঠবর্ত্তী. এবং বিপরীত-পৃষ্ঠবর্ত্তী অণুদ্বয় ॥১৭॥

১৭/০ ॥ যে-কোন অণু যে-কোন ঋজু-তনুর প্রান্তেতর আণব অংশ, সেই ঋজুতনু সেই অণুর মধ্য দিয়া প্রসারিত বলিয়া উক্ত হয়।

১৭৶০ ॥ কোন একটি ঋজুতনুর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের মধ্য-দিয়া যে-কোন কর প্রসারিত হউক্ না কেন সেই করই সেই ঋজুতনুর বর্দ্ধিত তনু বলিয়া উক্ত হয়; ও সেই করের মূল-প্রান্ত হইতে যদি তাহার বিপরীত-দিক্‌বর্ত্তী আর-একটি কর প্রসারিত হয়, তবে উভয় করের সমষ্টি প্রথমোক্ত ঋজুতনুর দ্বিধা-বর্দ্ধিত তনু বলিয়া উক্ত হয়॥

১৭৶০ ॥ কোন-একটি ঋজু-তনুর বর্দ্ধিত তনু হইতে পূর্ব্বোক্ত ঋজুতনু বর্জ্জিত হইলে সেই বর্দ্ধিত-তনুর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেই টুকু সেই বর্দ্ধিত তনুর বর্দ্ধিতাংশ বলিয়া উক্ত হয়॥

১৭।০ ॥ কোন-একটি করের বর্দ্ধিত তনু যদি সেই করের মূল-প্রান্ত হইতে বহি-প্রান্তের মধ্য দিয়া প্রসারিত হয়, তবে সেই বর্দ্ধিত তনু সেই করের প্রবর্দ্ধিত তনু বলিয়া উক্ত হয়; আর, কোন একটি করের বর্দ্ধিত তনু যদি উহার বহি-প্রান্ত হইতে মূল প্রান্তের মধ্যদিয়া প্রসারিত হয়, তবে সেই

বর্দ্ধিত তনু সেই করের অপবর্দ্ধিত তনু বলিয়া উক্ত হয়॥

১৭।/০॥ দুই বিভিন্ন আকর হইতে যদি দুইটি কর প্রসারিত হয়, তবে উভয়ে ভিন্নাকর করদ্বয় বলিয়া উক্ত হয়॥

১৭।৶০॥ ভিন্নাকর করদ্বয়ের কোনটি বা কোনটির কোন প্রবর্দ্ধিত তনু বা কোনটির কোন অংশ যদি অন্যটির মূল-প্রান্তের মধ্য দিয়া শেষোক্তের বহিপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, তবে উক্ত ভিন্নাকর করদ্বয় পরস্পরের সমদিক্‌বর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়॥

১৭।৶৹॥ দুই ভিন্নাকর কর-দ্বয় যদি এরূপ হয় যে, উভয়ে পরস্পরের সমসূত্র-বর্ত্তী কিন্তু সমদিক্‌বর্ত্তী নহে, তবে উভয়ে পরস্পরের বিপরীত-দিক্‌বর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়॥

১৭॥০॥ অসমসূত্রবর্ত্তী ঋজুতনুদ্বয়ের একটির কোন প্রান্তের আণব অংশ যদি আর-একটিরও প্রান্তের আণব অংশ হয়, তবে একটি আর-একটি দ্বারা কর্ত্তিত বলিয়া উক্ত হয়, এবং উভয়ে সংকর্ত্তক ঋজুতনুদ্বয় বলিয়া উক্ত হয়; আর, উক্ত প্রান্তের আণব অংশ উভয়ের ছেদ-স্থান বলিয়া উক্ত হয়, ও সেই সঙ্কর্ত্তক ঋজুতনু-দ্বয় সেই ছেদ-স্থানে কাটাকাটি করে বলিয়া উক্ত হয়॥

১৭॥/০॥ অসমসূত্র-বর্ত্তী ঋজুতনুদ্বয়ের একটির কোন-একটি প্রান্তের আণব অংশ যদি আর-একটির সমসূত্রের কোন একটি আণব-অংশ হয়, তবে শেষোক্ত ঋজুতনুর সমসূত্র পূর্ব্বোক্ত ঋজুতনু-দ্বারা কর্ত্তিত বলিয়া উক্ত হয়॥

মন্তব্য॥ বর্ত্তমান সংজ্ঞানুসারে দাঁড়াইতেছে বটে যে, ঋজুতনুদ্বয় কাটাকাটি করিলেই তাহারা পরস্পরের সমসূত্র কর্ত্তন করে, কিন্তু এরূপ দাঁড়াইতেছে না যে, উভয়ে পরস্পরের সমসূত্র কর্ত্তন করিলেই উভয়ে কাটাকাটি করে; এরূপ হইলেও হইতে পারে যে, একটি আর একটিকে কর্ত্তন করে নাই অথচ একটি আর একটির সমসূত্র কর্ত্তন করিয়াছে। দুই ঋজুতনু কাটাকাটি করিলে উভয়েত পরস্পরের সমসূত্র কর্ত্তন করেই, অধিকন্তু উভয়ে কাটাকাটি না করিয়া পরস্পরের সমসূত্র কর্ত্তন করিলেও করিতে পারে॥

১৭॥৶০॥ কোন-একটি অণু যদি দুইটি ঋজুতনুর উভয়েরই সমসূত্রবর্ত্তী হয়, তবে সেই অণু সেই ঋজুতনু-দ্বয়ের মিলন স্থান বলিয়া উক্ত হয়; আর, সেই ঋজুতনু-দ্বয়ের সমসূত্রবর্ত্তী কোন দুইটি ঋজুতনুর একটি সেই অণু-পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে তাহা আর একটির সহিত সেই অণু-স্থানে মিলিত বলিয়া উক্ত হয়॥

১৭॥৶৹॥ যে-কোন অণুদ্বয়ের যোজক যে-কোন ঋজু-তনুর সমসূত্র কর্ত্তন করে সেই অণুদ্বয়ই সেই ঋজুতনুর বিপরীত পৃষ্ঠ-বর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়॥

১৭৸০॥ কোন একটি ঋজুতনুর সহ-তলবর্ত্তী অণু-দ্বয় যদি সেই ঋজুতনুর বিপরীত পৃষ্ঠবর্ত্তী না হয় তবে উভয়ে সেই ঋজুতনুর সমপৃষ্ঠবর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়॥

অণু-স্থিত কোণ। ঋজুতনু-স্থিত কোণ। ঋজুতনুর সমদিক্-

বর্ত্তী এবং বিপরীত-দিক্‌বর্ত্তী কোণ-দ্বয়। ঋজুতনুর সমপৃষ্ঠবর্ত্তী এবং বিপরীত-পৃষ্ঠবর্ত্তী কোণ-দ্বয়। আনু-বর্ত্তিক এবং বৈবর্ত্তিক কোণ-দ্বয়। এক ঋজুতনুর কোণে প্রসারিত আর-এক ঋজুতনু। অপরিহার্য্য রেখা স্থিত শলাকা। দৃঢ়-কোণের একটি কর-কে আর একটি করের একপৃষ্ঠ হইতে আর-এক পৃষ্ঠে ঘুরা-ইয়া রাখা ॥ ১৮ ॥

১৮/০ ॥ যে-অণু যে কোণের চঞ্চু সেই কোণ সেই অণুতে অবস্থিত বলিয়া উক্ত হয়।

১৮৶০ ॥ যে কোন ঋজুতনু যে-কোন কোণের একটি কর, সেই কোণই সেই ঋজুতনুতে কিম্বা সেই ঋজুতনুর বর্দ্ধিত তনুতে অবস্থিত বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৮৵০ ॥ একটি ঋজুতনুস্থিত কোণের কোন একটি কর যদি সেই ঋজুতনুস্থিত আর একটি কোণের কোন-একটি করের সমদিক্‌বর্ত্তী হয়, তবে সেই ঋজুতনু-স্থিত কোণ-দ্বয় সেই ঋজুতনুর সমদিক্‌বর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়; আর উক্ত করদ্বয় যদি পরস্পরের বিপরীত দিক্‌বর্ত্তী হয় তবে সেই কোণ-দ্বয় উক্ত ঋজুতনুর বিপরীত দিক্‌বর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়॥

১৮।০ ॥ একই ঋজু তনুস্থিত দুইটি সহজ কোণের—একটির কোন-একটি বহিপ্রান্ত এবং আর-একটির কোন-একটি বহিপ্রান্ত—দুইটি বহিপ্রান্ত যদি উক্ত ঋজুতনুর সমপৃষ্ঠ-বর্ত্তী হয়, তবে সেই কোণ-দ্বয়ও উক্ত ঋজুত-নুর সমপৃষ্ঠবর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়; আর, যদি উক্ত বহিপ্রান্ত-দ্বয় উক্ত ঋজুতনুর বিপরীত-পৃষ্ঠবর্ত্তী হয়, তবে উক্ত কোণ-দ্বয়ও উক্ত ঋজুতনুর বিপরীত-পৃষ্ঠবর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়॥

১৮।/০ ॥ একই ঋজুতনুস্থিত দুইটি সহজ কোণ যদি সেই ঋজুতনুর সমদিকবর্ত্তী এবং সমপৃষ্ঠবর্ত্তী হয়, তবে সেই কোণ-দ্বয় আনু-বর্ত্তিক কোণ দ্বয় বলিয়া উক্ত হয়; আর একই ঋজুতনুস্থিত দুইটি সহজ কোণ যদি সেই ঋজুতনুর বিপরীত-পৃষ্ঠ-বর্ত্তী এবং বিপরীত দিক্‌বর্ত্তী হয় তবে সেই কোণ-দ্বয় বৈবর্ত্তিক কোণদ্বয় বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৮।৶০ ॥ যে দুইটি ঋজুতনু যে-সহজ-কোণের করদ্বয়, সেই দুইটি ঋজুতনুর একটি আর-একটির সেই কোণে প্রসারিত, এবং সেই কোণে অবস্থিত, বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৮।৵০ ॥ যে-কোন শলাকা এরূপে নিয়ন্ত্রিত যে, তাহা স্বস্থান অতিক্রমণ ক-রিয়া অন্য কোন স্থানে গমন করিতে সমর্থ নহে, সে শলাকা অপরিহার্য্য-রেখা-স্থিত বলিয়া উক্ত হয় ॥

১৮॥০ ॥ কোন একটি দৃঢ় কোণের কোন একটি কর যদি অপরিহার্য্য রেখা-স্থিত হয় এবং তাহার আর একটি কর-কে যদি এরূপ একটি স্থানে ঘুরাইয়া রাখা যায় যে, তাহাকে সেই স্থানে ঘুরাইয়া রাখা প্রযুক্ত তাহার বহিপ্রান্তের প্রয়াণ-স্থান এবং গম্যস্থান পূর্ব্বোক্ত করের বিপরীত পৃষ্ঠবর্ত্তী হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই বলা

যাইতে পারে যে, শেষোক্ত কর-কে পূর্ব্বোক্ত করের এক-পৃষ্ঠ হইতে আর এক-পৃষ্ঠে ঘুরাইয়া রাখা হইল॥

সঙ্কর্ত্তক তনু-দ্বয়ের কোণ-চতুষ্টয়। পার্শ্বলগ্ন কোণ-দ্বয়। অসমসূত্রে প্রসারিত ঋজুতনু-দ্বয়। কর্ত্তক তনু এবং কর্ত্তিত তনু-দ্বয়। ঋজুতনু-দ্বয়ের কোণাষ্টক। ঋজুতনু-দ্বয়ের অন্তকোণ এবং বহিকোণ। সংবর্ত্তী অন্তকোণ-দ্বয়॥ ১৯॥

১৯/০॥ দুই ঋজুতনু কাটাকাটি করিলে উভয়ের ছেদস্থানে যে চারিটি সহজ-কোণ ফলিত হয়, সেই চারিটি কোণ উক্ত ঋজুতনু দ্বয়ের কোণ-চতুষ্টয় বলিয়া উক্ত হয়॥

১৯৵০॥ সঙ্কর্ত্তক ঋজুতনু-দ্বয়ের কোণ-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত যে-কোন কোণ-দ্বয় উক্ত ঋজুতনু-দ্বয়ের একটির সমপার্শ্ববর্ত্তী এবং আর-একটির বিপরীত-পার্শ্ব-বর্ত্তী সেই দুইটি কোণই পরস্পরের পার্শ্ব-লগ্ন বলিয়া উক্ত হয়॥

মন্তব্য॥ কোণ-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেরই দুইটি করিয়া পার্শ্ব-লগ্ন কোণ এবং একটি করিয়া বৈবর্ত্তিক কোণ বর্ত্তমান আছে॥

১৯৶০॥ অসমসূত্রবর্ত্তী ঋজুতনু-দ্বয় যে খান-হইতে যেখানে প্রসারিত হউক না কেন, উভয়ে পরস্পরের অসমসূত্রে প্রসারিত বলিয়া উক্ত হয়॥

১৯।০॥ দুইটি ঋজুতনু যদি তৃতীয় একটি ঋজুতনু দ্বারা কর্ত্তিত হয়, তবে শেষোক্ত ঋজুতনু কর্ত্তক-তনু এবং পূর্ব্বোক্ত ঋজুতনু-দ্বয় কর্ত্তিত তনু-দ্বয় বলিয়া উক্ত হয়॥

১৯।/০॥ কোন একটি ঋজুতনুর দুই প্রান্তের মধ্য-দিয়া দুইটি সহতলবর্ত্তী ঋজুতনু পরস্পরের অসমসূত্রে প্রসারিত হইলে সেই দুইটি প্রান্ত-স্থানে যে চারিটি সহজ-কোণ ফলিত হয়, সেই চারিটি কোণ উক্ত ঋজুতনু-দ্বয়ের অন্তকোণ বলিয়া উক্ত হয়॥

১৯।৵০॥ দুইটি সহতল-বর্ত্তী ঋজুতনু তৃতীয় একটি ঋজুতনু-দ্বারা কর্ত্তিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত ঋজুতনু-দ্বয়ের দুইটি ছেদস্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া যে আটটি সহজ-কোণ ফলিত হয়, সেই আটটি সহজ-কোণ সেই ঋজুতনু-দ্বয়ের কোণাষ্টক বলিয়া উক্ত হয়॥

১৯।৶০॥ কোন দুইটি ঋজুতনুর কোণাষ্টকের মধ্য-হইতে সেই ঋজুতনু-দ্বয়ের চারিটি অন্তকোণ বর্জ্জিত হইলে যে চারিটি কোণ অবশিষ্ট থাকে, সেই চারিটি কোণ সেই ঋজুতনু-দ্বয়ের বহিকোণ বলিয়া উক্ত হয়। আর ঋজুতনু-দ্বয়ের অন্তকোণ-দ্বয় বা বহিকোণ-দ্বয়—ঋজুতনু-দ্বয়ের কোণাষ্টকের মধ্যস্থিত অন্তকোণ-দ্বয় বা বহিকোণ-দ্বয় বলিয়া উক্ত হয়।

১৯॥০॥ ঋজুতনু-দ্বয়ের অন্তকোণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে যে-কোন কোণ-দ্বয় কর্ত্তক-তনুর সমপৃষ্ঠ-বর্ত্তী, সেই দুইটিই সহবর্ত্তী অন্তকোণ-দ্বয় বলিয়া উক্ত হয়॥

ঋজুতনুর পার-দ্বয় এবং পার-দ্বয়ের প্রস্থ। পার-স্থিত ঋজুতনু। সহস্তর-দ্বয়, সহস্তীর্ণ ঋজুতনুদ্বয়,

এবং উভয়ের প্রস্থ। স্তরদ্বয় এবং স্তরাবলী ॥ ২০ ॥

২০/০ ॥ কোন-একটি ঋজুতনুর দুই প্রান্ত হইতে যদি আর দুইটি ঋজুতনু উহার ঋজুকোণে প্রসারিত হয়, তবে শেষোক্ত ঋজু তনু-দ্বয়ের দুইটি সমসূত্র—পূর্ব্বোক্ত ঋজুতনুর দুইটি পার বলিয়া উক্ত হয় ; এবং পূর্ব্বোক্ত ঋজুতনু সেই পার-দ্বয়ের প্রস্থ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২০/০ ॥ কোন-একটি ঋজুতনুর দুইটি পারের যে-কোনটির যে-কোন তানব অংশ হউক্ না কেন, সেই তানব অংশ, বা সেই তানব অংশের অধিবস্তু, সেই পারে অবস্থিত বলিয়া উক্ত হয়, এবং তাহা সেই পারের ঋজুতনু বলিয়া উক্ত হয় ॥

২০/০ ॥ যে-কোন ঋজুতনু হউক না কেন তাহার এক পারের ঋজুতনুমাত্রই তাহার অপর-পারের ঋজুতনুর সহস্তর বলিয়া উক্ত হয় ; এবং সহস্তর দ্বয়-মাত্রই পরস্পরের সহিত সহস্তীর্ণ বলিয়া উক্ত হয় ; আর সেই পার-দ্বয়ের প্রস্থ সেই সহস্তর-দ্বয়েরও প্রস্থ বলিয়া উক্ত হয়।

২০৷৵০ ॥ দুইটি ঋজুতনুর একটি যদি আর একটির সহস্তর হয় তবে উভয়ে স্তরদ্বয় বলিয়া উক্ত হয় ; আর, যদি দুয়ের অধিক ঋজুতনু এরূপ হয়, যে তাহাদের মধ্যেকার ঋজুতনু-দ্বয় মাত্রই পরস্পরের সহিত সহস্তীর্ণ, তবে সেই ঋজুতনুগুলি স্তরাবলী বলিয়া উক্ত হয় ॥

ঋজুধার ফলক ও তাহার ধার। ঋজুধার-ফলকের সন্নিহিত ধার-দ্বয়, সন্নিহিত ধার-ত্রয়, এবং সন্নিহিত কোণ-দ্বয়। ঋজুধার ফলকের অন্তক্কোণ এবং বহিক্কোণ ॥ ২১ ॥

২১/০ ॥ যে-কোন ফলক ঋজুতনু-পরম্পরা-দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহা ঋজুধার ফলক বলিয়া উক্ত হয় ॥

২১৵০ ॥ যে-কোন ঋজুধার ফলক যতগুলি ঋজুতনু দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহাদের এক একটি ঋজুতনু সেই ফলকের এক-একটি ধার বলিয়া উক্ত হয় ॥

২১৶০ ॥ কোন-একটি ঋজুধার ফলকের যে-কোন ধার-দ্বয় একই-কোন কোণের দুইটি কর, তাহার সেই ধারদ্বয়ই পরস্পরের সন্নিহিত বলিয়া উক্ত হয় ॥

২১।০ ॥ ঋজুধার ফলকের যে-কোন ধার-ত্রয়ের কোনটি অবশিষ্ট দুইটির প্রত্যেকেরই সন্নিহিত, সেই ধারত্রয়ই সন্নিহিত ধারত্রয় বলিয়া উক্ত হয় ॥

২১৷/০ ॥ ঋজুধার ফলকের কোন সন্নিহিত ধার-ত্রয়ের মাঝেরটি অবশিষ্ট দুইটির যে-দুই কোণে প্রসারিত, সেই দুই-কোণ পরস্পরের সন্নিহিত বলিয়া উক্ত হয় ॥

২১৷৵০ ॥ ঋজুধার ফলকের সন্নিহিত কোণ-দ্বয়ের কোন-টি যদি সহজ কোণ হয়, আর, সেই কোণ-দ্বয় যদি সেই ফলকের কোন-একটি ধারের সমপৃষ্ঠবর্ত্তী হয়, তবে সেই কোণ-দ্বয়ের প্রত্যেকেই সেই ফলকের অন্তক্কোণ, সংক্ষেপে কোণ, বলিয়া উক্ত হয় ॥

২১৷৶০ ॥ কোন-একটি ঋজুধার ফলকের অন্তঃকোণের করদ্বয়ের একটির অপবর্দ্ধিত তন্তুর বর্দ্ধিতাংশ আর একটির যে-কোণে প্রসারিত হয়, সেই কোণ সেই ফলকের বহিঃকোণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

ত্রিকোণ। সমধার ত্রিকোণ। সমপার্শ্ব ত্রিকোণ। ঋজু ত্রিকোণ। তির্য্যক্ ত্রিকোণ। স্থূল ত্রিকোণ। তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ। ধারের সম্মুখবর্ত্তী কোণ এবং কোণের পার্শ্ববর্ত্তী এবং সম্মুখবর্ত্তী ধার। কোণ-কর্ত্তৃক উপহিত ধার, এবং ধার কর্ত্তৃক উপহিত কোণ। ঋজু-ত্রিকোণের কর্ণ॥ ২২ ॥

২২/০ ॥ যে ফলকের কোণ তিনটি মাত্র তাহা ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২২৵০ ॥ যে ত্রিকোণের ধার-ত্রয় সমদীর্ঘ তাহা সমধার ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২২৶০ ॥ যে ত্রিকোণের দুইটি মাত্র ধার সমদীর্ঘ তাহা সমপার্শ্ব ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২২।০ ॥ কোন-একটি ত্রিকোণ যদি এরূপ হয়, যে তাহার একটি কোণ ঋজুকোণ, তবে তাহা ঋজু ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয় ; নচেৎ তাহা তির্য্যক্ ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২২৷/০ ॥ কোন-একটি তির্য্যক্ ত্রিকোণ যদি এরূপ হয় যে, তাহার একটি কোণ স্থূল কোণ, তবে তাহা স্থূল ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয়, নচেৎ তাহা তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২২৷৵০ ॥ কোন একটি ত্রিকোণের যে দুইটি ধার সেই ত্রিকোণের যে-কোণ-টির কর দ্বয়, সেই দুইটি ধার সেই কোণের পার্শ্ববর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়, এবং অবশিষ্ট ধার সেই কোণের সম্মুখবর্ত্তী, ও সেই কোণ শেষোক্ত ধারের সম্মুখবর্ত্তী, বলিয়া উক্ত হয় ॥

২২৷৶০ ॥ ত্রিকোণের কোণ-মাত্রই তাহার সম্মুখবর্ত্তী ধার-দ্বারা উপহিত বলিয়া উক্ত হয়, ও ত্রিকোণের ধার-মাত্রই তাহার সম্মুখবর্ত্তী কোণ-দ্বারা উপহিত বলিয়া উক্ত হয় ॥

২২॥০ ॥ কোন একটি ঋজু ত্রিকোণের ঋজু কোণের সম্মুখবর্ত্তী ধার সেই ঋজু-ত্রিকোণের কর্ণ বলিয়া উক্ত হয়।

চতুষ্কোণ। সংস্তর। সংস্তরের সম্মুখবর্ত্তী ধার দ্বয় এবং সম্মুখবর্ত্তী কোণ-দ্বয়। সংস্তরের কোণাকোণি প্রসারিত ঋজুতন্তু। সংস্তরের কর্ণ। ঋজুসংস্তর। তির্য্যক্ সংস্তর। চতুরক, চৌকা ফলক কিংবা চক ॥ ২৩ ॥

২৩/০ ॥ যে ঋজুধার ফলকের কোণ চারিটি মাত্র তাহা চতুষ্কোণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২৩৵০ ॥ চতুষ্কোণের ধার-মাত্রই যদি উহার আর-একটি ধারের সহিত সহস্তীর্ণ হয়, তবে তাহা সংস্তর বলিয়া উক্ত হয় ॥

মন্তব্য ॥ স্তর, বিস্তার, আস্তরণ, সংস্তরণ প্রভৃতি শব্দ একই ধাতু হইতে উৎপন্ন ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। বিস্তার শব্দে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ এই দুই প্রকার আয়তনের সংঘাত বুঝায়। একটি শলাকার পৃষ্ঠে দ্বিতীয় একটি সমদীর্ঘ শলাকা, তাহার পৃষ্ঠে তৃতীয় একটি সমদীর্ঘ শলাকা ইত্যাদি ক্রমে যদি সমদীর্ঘ শলাকা-পরম্পরা স্তরে স্তরে সাজানো হয়, তাহা হইলে কুশাস্তরণের ন্যায় একটি আস্তরণ বিস্তারিত হয়,—তাহাই সংস্তর-শব্দের বাচ্য; এক স্থান হইতে আর-এক স্থান পর্য্যন্ত বিস্তারিত এই অর্থে আস্তরণ,—কিন্তু যদি—ডাহিন হইতে বামে বিস্তৃত কিংবা বাম হইতে ডাহিনে বিস্তৃত—পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত বা উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত—ইহার প্রতি লক্ষ না করিয়া কেবল-মাত্র "বিস্তৃত" এই ভাবটির প্রতি লক্ষ করা যায়, তাহা হইলে সে অর্থে আস্তরণ শব্দের পরিবর্ত্তে সংস্তরণ-শব্দের ব্যবহার সবিশেষ উপযোগী ॥

২৩৶০ ॥ সংস্তরের সংকীর্ণ ধার দ্বয়-মাত্রই পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়; এবং সংস্তরের যে যে-কোণ যে-যে-কোণের সন্নিহিত নহে সেই-সেই-কোণ সেই-সেই-কোণের সম্মুখবর্ত্তী বলিয়া উক্ত হয়; আর সংস্তরের দুইটি সম্মুখবর্ত্তী কোণের একটির চঞ্চু হইতে আর-একটির চঞ্চু পর্য্যন্ত প্রসারিত ঋজুতন্তু সেই সংস্তরের কোণাকোণি প্রসারিত বলিয়া উক্ত হয় ॥

২৩।০ ॥ কোন একটি সংস্তরের কোণাকোণি প্রসারিত ঋজুতন্তু, সেই সংস্তরের কর্ণ বলিয়া উক্ত হয় ॥

২৩।/০ ॥ কোন-একটি সংস্তর যদি ঋজু-কোণ-বিশিষ্ট হয় তবে তাহা ঋজু সংস্তর বলিয়া উক্ত হয়, নচেৎ তাহা তির্য্যক্ সংস্তর বলিয়া উক্ত হয় ॥

২৩।৶০ ॥ যে-কোন ঋজু-সংস্তরের সন্নিহিত ধার-দ্বয় সমদীর্ঘ সেই ঋজু সংস্তর চতুরক, চৌকা-ফলক, বা চক বলিয়া উক্ত হয় ॥

চক্র। কেন্দ্র। পরিধি। ব্যাস। অর। ধনু। জ্যা ॥২৪॥

২৪/০ ॥ অর-শলাকার ঘূর্ণন-পরিসর চক্র বলিয়া উক্ত হয়; তাহার ঘূর্ণন-কেন্দ্র সেই চক্রের কেন্দ্র বলিয়া উক্ত হয়; তাহার বহিঃপ্রান্তের ঘূর্ণন পরিসর সেই চক্রের পরিধি বলিয়া উক্ত হয় ॥

২৪৶০ ॥ কোন-একটি চক্রের পরিধির কোন-একটি আণব অংশ হইতে উক্ত চক্রের কেন্দ্রের মধ্য-দিয়া উক্ত পরিধির অন্য-একটি আণব-অংশ-পর্য্যন্ত যে-কোন ঋজুতন্তু প্রসারিত হয়, তাহা উক্ত চক্রের ব্যাস বলিয়া উক্ত হয়, এবং সেই ব্যাসের অর্দ্ধাংশ উক্ত চক্রের অর বলিয়া উক্ত হয় ॥

২৪৶০ ॥ চক্রের পরিধির খণ্ডাংশ মাত্রই ধনু বলিয়া উক্ত হয়, এবং ধনুর প্রান্তদ্বয়ের যোজক—ধনুর জ্যা বলিয়া উক্ত হয় ॥

সামতলিক বিষয়ের সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ। সজাতীয় এবং বিজাতীয় একমাত্রা। তানব

এবং বিস্তৃত এক মাত্রা। বিভিন্ন জাতীয় বিষয়ের বিভিন্ন জাতীয় এক মাত্রা ॥ ২৫ ॥

২৫/০ ॥ যে-কোন তন্নুদ্বয় হউক্ না কেন, উভয়ে পরস্পরের সজাতীয় বলিয়া উক্ত হয়, তেমনি আবার, যে কোন ফলকদ্বয় হউক্ না কেন উভয়ে পরস্পরের সজাতীয় বলিয়া উক্ত হয়; কিন্তু তন্নু এবং ফলক—উভয়ে পরস্পরের বিজাতীয় বলিয়া উক্ত হয় ॥

২৫৵০ ॥ যে-কোন ঋজু তন্নুকে এক বলিয়া ধার্য্য করা যায়, তাহা তন্নুমাত্রেরই সজাতীয় একমাত্রা বলিয়া উক্ত হয়, এবং তাহা ফলক মাত্রেরই বিজাতীয় একমাত্রা বলিয়া উক্ত হয়; আর, তন্নুর একমাত্রা তানব একমাত্রা বলিয়া উক্ত হয় ॥

২৫৶০ ॥ যে-কোন চতুরকের প্রত্যেক ধার তানব একমাত্রা সেই চতুরক—ফলক মাত্রেরই সজাতীয় একমাত্রা এবং তন্নু-মাত্রেরই বিজাতীয় একমাত্রা বলিয়া উক্ত হয়; আর ফলকের সজাতীয় একমাত্রা বিস্তৃত একমাত্রা বলিয়া উক্ত হয় ॥

মন্তব্য ॥ আধিষ্ঠানিক (অর্থাৎ স্থান মান-ঘটিত) একমাত্রা তিন জাতীয়—তানব বিস্তৃত এবং সংহত। সংহত একমাত্রা বর্ত্ত-মান প্রস্তাবের অধিকার-বহির্ভূত ॥

২৫০ ॥ যে-কোন বিষয় হউক্ না কেন তাহার সজাতীয় একমাত্রাই তাহার এক-মাত্রা বলিয়া উক্ত হয় ॥

মন্তব্য ॥ যেখানে ফলকের কথা হই-তেছে সেখানে "এক" বলিলে বিস্তৃত একমাত্রা বুঝাইবে, যেখানে তন্নুর কথা হইতেছে সেখানে "এক" বলিলে তানব একমাত্রা বুঝাইবে; যেখানে দুয়েরই কথা হইতেছে সেখানে দুইই বুঝাইবে, কিন্তু সেখানেও তন্নুরই সম্বন্ধে কেবল তানব একমাত্রা বুঝাইবে ও ফলকেরই সম্বন্ধে কেবল বিস্তৃত একমাত্রা বুঝাইবে ॥ ইতি সংজ্ঞা সমাপ্ত ॥

ক্রমশঃ।

বর্ষ।

বর্ষ সন্ধ্যা।

(১)

রাত আসে দিন যায়
মধুময় সন্ধ্যায়
মরুভূমি মাঝে শ্রান্ত পথিক যেমন
দেখে তার চারিধারে
দিগন্তের সীমা পারে
তারকা-কুসুম-পুরী হতেছে সৃজন
অমনি আকুল প্রাণে
চেয়ে থাকে তার পানে
মনেতে বড়ই সাধ কাছে তার যায়,
তপ্ত বালি বাজে পায়,
দূরে ছুটে যেতে চায়,
ফিরে দেখে সেই স্থান নাহি যে ছাড়ায়।
সংসার মরুতে বসে মানব পথিক
বরষের সন্ধ্যাকালে দেখে চারিদিক,
ভূত ভবিষ্যৎ কোলে
সুখ আশা দলে দলে
ফুটিয়া রয়েছে চেয়ে দেখে অনিমিখ।
ফুলের বিছানা যদি পাতে বর্ত্তমান,
তবু তাহে সুখ নাহি, ব্যথিত পরাণ।
কণ্টকে বিঁধিছে দেহ
সে ফুল চাহে না কেহ
কেমনে খুলিবে কাঁটা জানে না সন্ধান।
বর্ত্তমান ছাড়াইয়া যে দিকেই চাও।
কত ফুল আছে ফুটে দেখিবারে পাও।
কণ্টক নাহি সে ফুলে না পড়ে টুটিয়া।
চিরকাল নব হয়ে থাকে যে ফুটিয়া।
তাইরে আকুল প্রাণে
চাহি গতবর্ষ পানে,
নব-বরষেরে ডাকি অধীর হইয়া।
অশ্রু ফেলি এক তরে,
অন্যে ডাকি সমাদরে
একেতে পুরাণ সুখ আর একে আশ,
ঢালিছে হৃদয়ে স্মৃতি
দুঃখময় সুখ অতি,
ভবিষ্য ভাবিয়ে হৃদি হাসে সুখ হাস।

(২)

গত বর্ষ।

এই ছিল নাই হেথা
পরাণে বাজিল ব্যথা
দেখিতে না পাই আর চৌদিক চাহিয়া
চোখের উপর দিয়া
ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া
অনন্তের কোলে বর্ষ গেল মিলাইয়া।
কুসুম শুখালে পরে
কাছে কাছে ঘুরে ঘুরে
ভাসিয়া বেড়ায় তার সৌরভ যেমন।
যায় যায় তবু হায়
পাছু পানে ফিরে চায়
মায়া ডোর আছে তার বেড়িয়া চরণ।

গতবর্ষ উপছায়া
না পারি ত্যজিতে মায়া
বর্ষের সমাধি পরে বেড়ায় ঘুরিয়া,
এক কায় এক মন
দোঁহে ছিল একজন
ছায়ারে ফেলিয়া কোথা গেল সে সরিয়া?

* * * *

চেয়ে থাকি আনমনে
অতীত জীবন পানে
অতীতের ছবিগুলি পড়ে সব মনে,
সেই অশ্রু সেই হাস
কত কি কত কি আশ
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত কথা আসেরে স্মরণে।
সেই সে পুরাণ গান
সেই মান অভিমান
স্বপ্নমত ছায়ামত জাগেরে হৃদয়ে।
হায় কোথা গেল তারা
কোথায় হ'লরে হারা
অনন্তের কোন রাজ্যে গেলরে মিশায়ে।
বরষের আগমনে
কত আশা ছিল মনে
কতই নূতন শিক্ষা শিখিব জীবনে!
নীরব ভাষাতে বর্ষ
ঢালিছ যে জ্ঞানজ্যোতি,
ভেবেছিনু এইবার লভিব যতনে।
তুমি হে বরষবিন্দু,
কাল সে অনন্ত সিন্ধু,
অনন্তের সাথে তোর হৃদয় বন্ধন,
ক্ষুদ্র পরাণটী দিয়া
ব্যাপিলি অনন্ত হিয়া
অনন্তের সাথে হলো অনন্ত মিলন।

ভেবেছিনু এই শিক্ষা
নরনারী লবে ভিক্ষা—
জগতের প্রাণে প্রাণে হবে এক প্রাণ,
রহিবে না হিংসা দ্বেষ,
যাবে সব দুঃখ ক্লেশ,
ক্ষুদ্র যত মিলে গিয়ে হইবে মহান।
কই সে পুরিল আশা।
বিশ্বব্যাপী ভালবাসা
কই চারিদিক করে পরিমলময়!
তেমনি যে স্বার্থভরে
বসুন্ধরা হাহা করে,
নয়নের জল তার অবিরত বয়।
বরষের আগমনে
কত আশা ছিল মনে,
বরষ গেলরে তবু মিটিল না হায়!
শুধু আশা-ক্ষণপ্রভা
ক্ষণ তরে দিল দেখা
ম্লান হৃদে হাসিরাশি ফুটাইল তায়।
বর্ষ অবসান হ'ল
সে স্বপন মিলাইল,
আবছায়া শুধু তার অঙ্কিত পরাণে।
মরুমাঝে মরীচিকা,
শ্মশানে আলেয়া আলো,
স্বপনেই সুখ শুধু দুর্ব্বল জীবনে।
শুন তবে বর্ষ অয়ি,
অতীতের স্মৃতিময়ী,
সুখময় স্বপ্নগুলি রেখে যাও মনে,
অতীতের পানে চেয়ে
সুখেতে হাসিবে হিয়ে
মনেতে আঁকিব ছবি উজ্জ্বল বরণে—

অতীতের মোহমায়া
পড়িবেক ছায়া ছায়া
দুঃখময় কষ্টময় জীবনে আমার
আর কি কহিব তবে,
বিদায় লইতে হবে,
মাঝে মাঝে এস এই আবাসে তোমার!

(৩)

নববর্ষ।

ওই যে রে হেসে হেসে
নববর্ষ নব বেশে
বর্ষ চক্রে আর বার আসিল ফিরিয়া,
নয়নে সুখাশ্রু রাশি
অধরে সুখের হাসি
ফুলময় আশা-ডালা করেতে ধরিয়া।
কি জানি কি জানে ভাষা,
(ও) নীরবে কি দেয় আশা,
আদর করিতে তারে সবে আসে ছুটি,
কচি কচি ফুলগুলি
বাতাসেতে হেলি দুলি
তারে দেখে অত কেন হেসে কুটি কুটি,
পাখীগুলি গাহে গান
আনন্দে খুলিয়া প্রাণ,
তারি অভ্যর্থনা গীত গাহেরে হরষে,
আশে পাশে বায়ুগুলি
করে সবে কোলাকুলি,
আদরে ডাকেরে তারা নুতন বরষে,
ধরাসনে ধরাবাসী
সুখের সাগরে ভাসি
নব বর্ষে নব আশে হরষে অধীর,
জেগেছে নুতন প্রাণ
জেগেছে নুতন গান
চারিদিক হ'তে বহে উচ্ছ্বাস সমীর।

সহসা একি এ হায়,
কোথায় মিশায়ে যায়
কোথায় মিশাল সবে কোথায়—কোথায়!
হাসি আশা হর্ষ যত
অশ্রুজলে পরিণত
দেখিতে দেখিতে সবি অঙ্কুরে শুথায়।
সেই শোক সেই তাপ সেই অশ্রুধার
বরষের আরম্ভেই কেন রে আবার?
কি শিক্ষা কঠোর অতি
দাও বর্ষ মহামতি,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোক তাপ মুছিয়া ফেলিয়া,
মহান উদ্দেশ্য ধরি
বাধা অতিক্রম করি
সবলে চলিতে হবে মানব হইয়া?
অনন্ত প্রেমের নীরে
হৃদি প্রেম বিন্দুটীরে
মিশালে, ঘুচিয়া যাবে দুখ-অশ্রু-জল
মানব জীবন সত্য হইবে সফল?

শ্রীহিরন্ময়ী দেবী।

ভাউ সাহেবের বখর।

এই প্রকারে ক্ষেত্র ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। গোকুলের নিকটবর্ত্তী গোঘাট (শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাইয়া গরুদের এই ঘাটে জলপান করাইতে আনিতেন এই নিমিত্ত গোঘাট নাম) বলিয়া একটি স্থান আছে, সেইখানে যমুনা তীরে দুরাণীরা শিবির সংস্থাপন করিল। বন্দী গাজুদীখানের তাঁবু নদীর তীরেতেই ছিল; চারিদিকে রোহিলা-প্রহরী নিযুক্ত ছিল, নদীর জল গভীর বলিয়া নদীর দিকের প্রহরীরা ততটা সতর্ক-ভাবে থাকিত না। গাজুদীখান বিলক্ষণ সন্তরণ-নিপুণ ছিলেন। তিনি একদিন সুযোগ পাইয়া নদীতে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে আগ্রার কিল্লা ৭ ক্রোশ। নদীর মধ্যস্থান দিয়া সাঁতার দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ সাঁতার, কিছুক্ষণ বিশ্রাম এইরূপে আগ্রার কিল্লার নিকটে আসিলেন। তখন রাত্রির চারি ঘটিকা অবশিষ্ট, গাজুদীখান অনাবৃত দেহে, অনাবৃত মস্তকে দুর্গদ্বারে উপনীত হইলেন। শত্রুর ভয়ে দুর্গও সতর্ক ছিল। দ্বাররক্ষককে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি গাজুদীখান, শত্রু হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তোমাদের শরণাপন্ন হইতেছি, আজিকার দিন আমাকে দুর্গ মধ্যে গ্রহণ করিয়া আমায় প্রাণদান দাও, এই কথা কেল্লাদারকে গিয়া বল।" কিল্লাদার এই সংবাদ পাইবা-মাত্র দ্বারের খিড়কী উদ্ঘাটন পূর্ব্বক মশাল-হস্তে বাহিরে আসিলেন।

আগ্রার কেল্লা যমুনার তীরে। এক দিকে যমুনার প্রবাহ, অপরদিকে নির্ম্মিত পয়োপ্রবাহ। নির্ম্মিত পয়োপ্রবাহের দুই মুখ যমুনার সহিত মিলিত, এই নিমিত্ত তাহাতে অতল জল। দ্বারের সম্মুখ ভাগ হইতে পয়োপ্রবাহের উপর তক্তা ফেলিয়া দিলে যাতায়াত করা যায়, তক্তা উঠাইয়া লইলে কেল্লা প্রবেশ-চেষ্টা বৃথা। কেল্লা প্রবেশ অসাধ্য। একের পর এক এই প্রকার পাঁচটি পরিঘা, প্রতি পরিঘায় দুই শত তোপ এবং তদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ত্র, সর্ব্বসমেত বার শত তোপ। এ কেল্লা অতীব দুর্গম। ভূমিস্থ কেল্লা আগ্রার তুল্য আর কোথাও নাই। আকবরশাহ পাতশাহ এই কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া তৎকালে যে কেল্লাদার, যন্ত্রধারী গোলন্দাজ প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাদেরই বংশপরম্পরা কেল্লাতে বাস করিয়া আসিতেছে। তৎপরে মহাবীর ওরঙ্গজেব আদি অনেক পাতশাহ হইয়াছেন, মরাঠাদেরও প্রবলতা হইয়াছে, আটক পর্য্যন্ত দেশ জয় করা হইয়াছে। কিন্তু কেল্লা কেহই প্রাপ্ত হন নাই। যিনি আগ্রার স্বামীত্ব করিবেন দুর্গমধ্য স্থিত লোক

দিগের ভরণপোষণের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত। আকবরশাহ পৃথ্বী দিগ্বিজয় পূর্ব্বক ধনরাশি সংগ্রহ করিয়া যে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এমন নহে। তিনি এক অওলিয়া ফকিরের নিকট হইতে এক প্রকার রসায়ন বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। সেই রসায়ন বিদ্যা সম্ভূত দ্রব্য দ্বারা এই অসাধ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বারুদ-গোলা-যন্ত্রের সাহিত্য ইহার মত আর কোন কেল্লাতে নাই।

কিল্লাদার আসিয়া গাজুদীখানের পরিচয় লইলেন। দেখিলেন সত্যই গাজুদী-খান। প্রাণদান প্রার্থনা করিলে কিল্লাদার বলিলেন, "আমি কিল্লাদারী পাইয়া অবধি কোন পরকীয় ব্যক্তিকে আসিতে দিই নাই।" গাজুদীখান উত্তর দিলেন "তোমার উপর নির্ভর করিয়া পথে বাহির হইয়াছি। এক্ষণে হয় তুমি আমাকে স্বহস্তে বধ কর নতুবা দুর্গ মধ্যে স্থানদান কর।" কিল্লাদার ভাবিলেন, "একজন পুরুষকে দুর্গমধ্যে লইলে কি আর হইবে? এ সময়ে ইহাকে আশ্রয় দেওয়া উচিত।" কেল্লার মধ্যে লইলেন ও বস্ত্রাদি দিয়া সান্ত্বনা করিলেন। এদিকে গাজুদীখান পলায়ন করিয়াছে বলিয়া গোলযোগ উঠিল। নজীব-খান প্রহরীদিগের শিরচ্ছেদ করিলেন। অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। গাজুদীখান আগ্রার কেল্লায় আশ্রয় লইয়াছে শুনিয়া অবদুলঅল্লী কুচ করিয়া যমুনা পার হইলেন। দুর্গ সন্নিকটে শিবির সংস্থাপিত হইল। পাঁচজন গিলচ্যা কিল্লাদারের নিকটে পাঠাইলেন আর লিখিয়া দিলেন, "গাজু-দীখানকে আমার হস্তে সমর্পণ কর এবং কেল্লা খালি করিয়া দেও। নতুবা আমি কান্দাহারের পাতশাহ অবদুল অল্লী, আমি কেল্লা খুঁড়িয়া যমুনায় ফেলিব, তোমার শিরচ্ছেদ করিয়া তোমার স্ত্রীপুত্র হাঁড়ি মুচিকে বিলাইয়া দিব।" কিল্লাদার পত্র পাঠ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "শুনিতে পাই অবদুল অল্লী পাতশাহ অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তবে তিনি কেন এই প্রকার লিখি-লেন। ইহাঁর প্রভু নাদিরশাহ আসিয়া কি করিয়াছিলেন? ইনি আবার কি করিবেন? তথাপি সাবধান হওয়া আবশ্যক।" কিল্লা-দার সন্ধান লইয়া জানিলেন নগর একেবারে জনশূন্য, লোকেরা স্বস্বধন সম্পত্তি লইয়া পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু বস্তীতে লোক আছে। মনে মনে বিবেচনা করিলেন গিলচ্যাদের যদি তাড়াইয়া দিই তাহা হইলে দিল্লি ও মথুরার যে দশা ঘটিয়াছে আগ্রারও তাহাই হইবে।" দুই জন গিলচ্যাকে দ্বারে রাখিয়া অপর তিনজনকে পাঠাইলেন আর লিখিয়া দিলেন, "পাতশাহ চারি দিবস কৃপা করুন, চতুর্থ দিবসে কেল্লা খালি করিয়া দিব, গাজুদীখান উজীরকেও হাজির করিব।"

এদিকে কিল্লাদারের অনুরোধে চারি-দিনের মধ্যে সমস্ত শহর, বস্তী একেবারে দীপশূন্য হইল। আগ্রাতে একটি কুকুর পর্য্যন্ত রহিল না, মনুষ্য কি প্রকারে থাকিবে? কিল্লার যে ভাগ গিলচাশিবি-রের সম্মুখীন সেই দিকে চারি শত তোপ,

বারুদ, গোলা প্রভৃতি সজ্জিত হইল। তখন কিল্লাদার অবদুল অল্লীকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আজ আমাদের আনন্দের দিন, শীঘ্র কুচ করুন নতুবা তোপ অগ্নি সংযুক্ত হইবে।" দ্বারস্থ এক গিলচ্যাকে পত্র সহিত পাঠাইলেন, অপরকে তোপের মুখে দিয়া উড়াইলেন। অবদুল অল্লী ও নজিবখান এই সংবাদ পাইয়া মনিবন্ধ চিবাইয়া কেল্লা আক্রমণার্থ সৈন্য সজ্জিত করিলেন। কিল্লাদার চারি শত তোপে একেবারে অগ্নি সংযোগ করিলেন। সৈন্য মধ্যে একেবারে চারি শত গোলা পড়াতে মহা প্রলয় উপস্থিত হইল। সমস্ত সৈন্য পলাইতে লাগিল, দুই তিন ক্রোশ যাইয়া তবে হাঁপ ছাড়িল, কিন্তু পলাতক, গোলার আঘাতে সেখানেও তিষ্ঠিতে পারিল না, পাঁচ ক্রোশ দূরে যাইয়া শিবির স্থাপন করিল। অবদুলঅল্লী নজীবখানের নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, নজীবখান উত্তর দিলেন "আগ্রার কিল্লা বৃহৎ, এখানে কোন চেষ্টা সফল হয় না। এদিকে শুনা যাইতেছে যে রঘুনাথ রাও ও মলহার রাও সসৈন্যে নর্ম্মদার নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন এ সময়ে এখানে যুদ্ধে জড়িত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে।

অবদুল অল্লী কুচ করিয়া কুম্ভেরী অভিমুখে চলিলেন। সুরজমল জাটকে লিখিলেন "ক্রোর টাকা কর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে।" সুরজমল রূপরাম কটাকীকে ডাকিয়া বলিলেন "কন্দাহারের পাতশাহ অবদুল অল্লী আসিতেছেন, তিনি সামান্য লোক নহেন। তাঁহাকে কি উত্তর দেওয়া যাইবে?" রূপরাম কটাকী বড়ই রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বলিলেন, "মরাঠী সেনা নর্ম্মদা পার হইয়াছে, এসময়ে ইহাঁরা যুদ্ধে অগ্রসর হইবেন না। মেজবানী বলিয়া দশ লক্ষ টাকা দিলে গ্রহণ করে তো উত্তম, নহিলে যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হওয়া যাউক। সম্ভবতঃ মরাঠী সেনা ত্বত দিনে আসিয়া পৌছিবে।" এই পরামর্শ সুরজমল জাটের মনোনীত হইল। অবদুল অল্লীকে লিখিলেন, "দশ লক্ষ টাকা মেজবানী দিতেছি, ইহা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রসন্নভাবে চলিয়া যাউন। নতুবা আমি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছি।" অবদুল অল্লী পত্র পাইয়া মরাঠীদের ভয়ে দশ লক্ষ টাকা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন, এবং পত্র দ্বারা সদ্ভাব বিনিময় করিয়া দিল্লি চলিয়া গেলেন।

সুজাউদ্দৌলাকে উজিরী পদ দেওয়া ও তৈমুরসাহকে সিংহাসনে স্থাপন করা আপাততঃ স্থগিত রহিল। অবদুল অল্লী ভাবিলেন, "নজীবখান তো কুলাঙ্গার। যাহার দ্বারা প্রতিপালিত তাহারই এই দশা করিল। ইহার ভরসায় আমার পুত্রকে এখানে রাখিয়া যাওয়া উচিত হয় না।" ইহা মনে মনে স্থির করিয়া নজীবখানকে এইরূপে বুঝাইলেন, "আপাততঃ আমি কন্দাহারে যাইতেছি। আগামী বৎসরে আসিয়া সমস্ত বন্দবস্ত করিব। তোমার ইচ্ছা হয় তো দিল্লির কেল্লা রক্ষা কর।" এই বলিয়া নজীবখানের সহিত পাঁচহাজার

সৈন্য রাখিলেন। মনকা জমানী, চন্দা জমানী ও তৈমুর সাহকে সরহিন্দেতে রাখিয়া তাঁহাদের নিকটে সৈমুদখান কতলরাজের সহিত বিশহাজার সৈন্য দিয়া অবদুল অল্লী কন্দাহারে গেলেন।

রাজশ্রী রঘুনাথ দাদা ও মলহাররাও আস্তে আস্তে আসিতেছিলেন, তাঁহারা এই সংবাদ পাইয়া মজল, দর মজল চলিয়া চমেলী পার হইয়া আগ্রার নিকটবর্ত্তী হইলেন। এ দিকে অন্তাজী মানকেশ্বর শিন্দেকে এইভাবে পত্রের পর পত্র পাঠাইতে লাগিলেন, "হিন্দুস্থান হস্তচ্যুত হইল শীঘ্র ফৌজ-বন্দী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হউন।" এই হেতু তখন লালবন্দীর কাল না হইলেও শিন্দে চল্লিশ হাজার ফৌজকে লালবন্দী দিলেন। প্রস্তুত হইয়া যাত্রা করিতেছেন এমন সময়ে দিল্লির উকীলের পত্র আসিল যে, "দুরাণী সসৈন্যে দেশ বহির্ভূত হইয়াছে। রাজশ্রী রঘুনাথ দাদার ফৌজ চমেলী পার হইয়াছে। তুমি আসিবার জন্য ব্যস্ত হইও না।" পত্র পাইয়া শিন্দে চতুর্মাস বর্ষাকাল বিশ্রাম করিলেন। এ দিকে রাজশ্রী দাদা সাহেব আগ্রার নিকটে আসিয়া সুরজমল জাটের নিকট হইতে কর-গ্রহণ পূর্ব্বক আগ্রা হইতে গাজুদীখানকে বাহির করিয়া আপনার নিকটে আসিলেন। তথা হইতে মজলদর মজল কুচ করিয়া দিল্লি পৌছিলেন। সহরের বিনাশ কাল উপস্থিত। যিনিই হউন আসিয়াই প্রথমে বস্ত্রাপহরণ করিয়া পরে অন্য যে কোন কাজ থাকে করেন। সহরের সত্যনাশ করিয়া কেল্লা বেষ্টন করিলেন। নজীবখান দুর্গ মধ্য হইতে পোনের দিন যুদ্ধ করিলেন। বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, "মরাঠীরা ছাড়িয়া যাইবে না আর এখন অবদুল অল্লীর বলও নাই। এখন কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইতে হইবে।" উকীল দিয়া গোপনে মলহার রাওকে বলিয়া পাঠাইলেন "আমি তোর ধর্ম্ম পুত্র, আমাকে বাঁচাও। শরণাগতের মরণ চিন্তা করিবেক না। ইহাই সমর্থদিগের উচিত।" মলহাররাও বড়ই সাভিমানী। তাঁর জেদ হইল যে, "নজীব খান ধর্ম্ম পুত্র হইল তখন তাহাকে বাঁচাইতে হইবে।" তিনি রাজশ্রী দাদা সাহেবের নিকটে যাইয়া, নানা প্রকারে তাঁহাকে লওয়াইয়া অঞ্চল পাতিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। দাদাসাহেবের মনে হইল যে, নজীবখান বিশ্বাসঘাতক কুলাঙ্গার, ইহার প্রাণ রক্ষা করা উচিত নহে, কিন্তু তিনি মলহররাওয়ের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। মলহাররাও নজীবখানকে কিল্লা হইতে বাহির করিয়া আপনার নিকটে রাখিলেন। পরে অলম শাহকে সিংহাসন, গাজুদীখানকে উজীরী, অন্তাজী মানকেশ্বরকে নগর দুর্গ রক্ষণ কার্য্য দিয়া, পূর্ব্ববৎ বন্দবস্ত করিয়া কুরুক্ষেত্রে গিয়া পৌছিলেন।

তথায় যথা পদ্ধতিতে তীর্থবিধি করিয়া, তুলাদান দিয়া সরহিন্দে উপনীত হইলেন। শ্রীমন্তের উৎকর্ষ কাল। সৈমুদখান কতলরাজ মুখ না দেখাইয়াই লাহোরাভিমুখে পলায়ন করিল, পথে পেল্চাজীতে লুটিয়া

লইল। মরাঠী সেনা মজলদর মজল শতদ্রু, ব্যাসগঙ্গা ও চিনাব উত্তীর্ণ হইয়া লাহোরে উপনীত হইলেন। তথায় সুভা সন্দীপবেগ ছিলেন, দুরাণী তাঁহাকে মারিয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্র কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সন্দীপবেগের পুত্রকে কারামুক্ত করিয়া পাঁচহাজার ফৌজের সহিত তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সন্দীপবেগের লক্ষ্মী নারায়ণ নামক এক দেওয়ান ছিলেন তিনি জাতিতে কায়স্থ, অতীব কৃতি লোক,— লাহোর তাঁহার অধীন করিয়াদিলেন। পরে পঞ্জাব, মুলতান, অটক পর্য্যন্ত দেশ জয় করিয়া চাল পশ্চাতে ফিরাইলেন। লুটেতে পেল্‌চারী ও লস্কর কুবের হইল। রঘুনাথরাও ও মলহাররাও মহান যশ সম্পাদন করিলেন। সে বৎসর গৃহেতেই বাস করিলেন।

রাজশ্রী নানা সাহেবের বন্দেগান অলী নিজাম উলমুলুখের সহিত কোন কারণে মনান্তর ঘটিল। সে সময়ে রাজশ্রী নানা সাহেব রাজশ্রী শিন্দেকে গিয়া বলিলেন, "হিন্দুস্থানে তুমি অনেক বীরত্ব করিয়াছ। মারয়াড়ি রাঠোড়ের মত লোকের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছ। ইহা আমি কানে শুনিয়া মাত্র তৃপ্ত হইয়াছি। কিন্তু স্বচক্ষে দেখি নাই। এক্ষণে মোগলেতে আমাতে মনান্তর ঘটিয়াছে। আমার অধিকাংশ সৈন্য দাদাসাহেবের সহিত গিয়াছে। তুমি অবদুলঅল্লীর গুজব শুনিয়া সৈন্য প্রস্তুত রাখিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমার ভরসায় নিশ্চিন্ত আছি। এবৎসরের মন্ত্রণার ভার তোমার উপরে।" শিন্দে শূর ও জিষ্ণু, নানা সাহেব এইরূপ বলিবা মাত্র তিনি সেনা-সহ দশহরা করিয়া ঔরঙ্গাবাদে যাইয়া নবাবের সম্মুখীন হইলেন। নবাবের সৈন্য সেনাপতি সকলিই মরাঠী, ব্যঙ্কট্‌রাও নিম্বাল কর, জানবা নিম্বালকর, গোপাল সিং রাজা খন্দার কর, ইব্রাম খান গারদী প্রভৃতি। এক যাধব রাওয়ের অধীনেই ত্রিশ সহস্র ফৌজ ছিল। শিন্দের সেনা সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হইল, কিন্তু মোগল বাহির হইলেন না। তাঁহার ভয় হইল যে তাঁহার মরাঠী সেনা পাছে বিশ্বাসঘাতকতা করে। মরাঠী সেনা তাহা বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেক আমাদের প্রতি নবাবের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ইহা ভাল নহে। যুদ্ধ করিতেই হইবে" এই বলিয়া সজ্জিত হইয়া নগরের বাহিরে যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হইলেক। দত্তাজী শিন্দে, জনকোজী শিন্দে, নানা সাহেবের পুত্র বিশ্বাসরাও ইহাঁরাও অগ্রসর হইলেন। নবাব নিজাম অলীও প্রস্তুত হইলেন কিন্তু তিনি ইহাতে না মিশিয়া দূরে থাকিয়া তামাশা দেখিতে লাগিলেন। তিন দিকে যুদ্ধ বাধিল, দত্তাজী শিন্দের সহিত জানবা নিম্বাল কর, জনকোজী শিন্দের সহিত ব্যাঙ্কট্‌রাও নিম্বালকর, অপর ওমরাওদের বিশ্বাস রাও আক্রমণ করিলেন। ব্যাঙ্কট্-নিম্বালকরের ভগিনীর সহিত জন-কোজীর বিবাহ হইয়াছিল। স্বসম্পর্কীয়দিগের সহিত সর্ব্ব প্রকারে আত্মীয়তা রক্ষা করিবে কিন্তু তজ্জন্য ক্ষত্র-ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে

না, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া উভয় পক্ষীয় মরাঠীরা ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বাঙ্কট্রাওয়ের ভগিনীপতি ও জনকোজীর ভায়রাভাই রাজশ্রী নাগোজীমানে ক্ষনবড়কর সমস্ত সৈন্য অতিক্রম করত জনকোজীকে আসিয়া আক্রমণ করিলেন। জনকোজীর নিকটে বন্দুকধারী অশ্বারোহী সৈন্য অনেক ছিল, তিনি তাহাদের চালাইয়া দিলেন। নাগোজী গোলার ঘায়ে ঠায় মারা গেলেন। এ গৈবী মার হইল। ঈশ্বর তাঁহার মনে যথেষ্ট সাহস দেন নাই। অস্ত। ইহলোকে কীর্ত্তি করিয়া পরলোক সাধন করিলেন। নাগোজীমানের মৃত দেহ বাহির করিয়া লইল। সন্ধ্যাকাল হইল। ভগিনীপতির নিমিত্ত বাঙ্কট্রাও পরম দুঃখিত হইলেন। স্ত্রী পুত্রেরাও সঙ্গে ছিলেন, মায়াজালে সকলেরই অত্যন্ত দুঃখ হইল। তাঁহার দেহ সৎকার করা হইল। নবাব বন্দেগান অলী শিবিরে আসিয়া দত্তাজী মানেকে সান্ত্বনা করিলেন। তখন নবাবের মনের সন্দেহ দূর হইল।

রাজশ্রী রামচন্দ্র মাধবরাও পঞ্চ সহস্র সৈন্য সহ নবাবের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত দ্রুত আসিতেছেন, দত্তাজী শিন্দে এই সংবাদ পাইবা মাত্র তাঁহার প্রতি দশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। উভয় সৈন্য সাক্ষাৎ হইতে না হইতেই রামচন্দ্র মাধবরাও শিন্দখেড়াকে আশ্রয় স্বরূপ করিয়া সেই স্থানেই রহিলেন। নিত্য নিত্য যুদ্ধ প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। অন্নাভাবে মাধবরাও দিন দিন কাতর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। নিজাম উলমুলুক ইহা জানিতে পারিয়া চতুর্দ্দিকে তোপচক্র রচনা করিয়া বাহির হইলেন। অনেক মোগল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ইহাঁর মত যোদ্ধা কেহই হয় নাই। এ দিকে নানা সাহেবের পক্ষীয় গোপালরাও রাস্তে ও পঁবার এবং অন্যান্য সেনা আসিয়া শিন্দের সহিত একত্রিত হইল। মধ্যে মোঁগল, মরাঠী সেনা তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ কলহ করিতে করিতে দুই ক্রোশ চলিয়া শিন্দখেড়ায় উপস্থিত হইল। স্বয়ং নানা ও ভাউও তথায় আসিয়া পৌছিলেন। সে দিবস দত্তাজী শিন্দে জেদভরে নিজে রণ ভূমির মধ্যস্থলে থাকিয়া জেলালা, সুতারনালা, হস্তনালা ও তোপ মারিতে আরম্ভ করিলেন। মোঁগল সৈন্যের ঘোড়া, মনুষ্য পলাইতে লাগিল। নবাব বন্দেগান অলী তাহাতে বিষাদিত হইয়া রণ মধ্যস্থলে হাওদা চালাইলেন। তৎকালে উভয় পক্ষীয় যন্ত্র ধ্বনি এই প্রকার হইল যে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। ধূলির অন্ধকারে কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। দত্তাজী শিন্দে রাগোন্মত্ত বন বরাহের মত হইয়া উঠিলেন। ভাউসাহেবের নেত্র সন্তোষ পাইল। প্রশংসা করিয়া বলিলেন "দত্তাজী শিন্দের পৌরুষ অসীম। যেমন কর্ণে শুনিয়াছিলাম তদনুরূপ কার্য্যে দেখাইল।" ইহা বলিয়া বিষম সঙ্কটে দত্তাজী শিন্দেকে বাহির করিয়া লইলেন। প্রায় দুই শত প্রধান প্রধান ব্যক্তি ঠায় মারা গেলেন। নানা সাহেবের এইরূপ মনে হইল যে, মরাঠীদের দ্বারা যুদ্ধ অনেক হইয়াছে কিন্তু এমন যোদ্ধা মরাঠী-

দের মধ্যে আর কেহই নাই। তিনিও শিন্দের অনেক স্তুতি করিলেন। মানী লোকদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। সেই স্থানে শিবির সংস্থাপিত হইল। পরে সন্ধির সূত্র আরম্ভ হইল। আট দিনে মোগল ও মরাঠীদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল।

অনন্তর জনকোজী শিন্দেকে হিন্দু স্থানে যাত্রার আজ্ঞা দিলেন। দত্তাজি শিন্দে বিবাহার্থে চান্দার গোন্দিয়াতে গেলেন। জনকোজী শিন্দে চল্লিশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মজল-দরমজল হিন্দু স্থানে চলিলেন। জনকোজী বয়সে বালক, পরাক্রমে বৃদ্ধ সমান, স্বধর্ম্মশীল ও ভক্তিপরায়ণ। নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইয়া উজ্জয়িনীতে উপনীত হইলেন। তথা হইতে বুন্দি বাড়য়াঁতে বেড়াতে গেলেন। সেই রাজ্যে হরগড় বলিয়া এক কেল্লা ছিল, তাহাতে সুমানসিং নামক এক গিরাষা (পাহাড়ে লুট করনেওয়ালা) থাকিত, সে সমস্ত মারোয়াড় ভয়-বশীভূত করিয়া গুপ্তরূপে কর গ্রহণ করিত। জনকোজী একেবারে গড়ের উপরে গিয়া পড়িলেন। গড় এক অতি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত, কিন্তু চতুর্দ্দিক দুর্গম জঙ্গলে আবৃত। গড়ের উপর কাহাকেই ধরিতে পারিলেন না। গিরাষারা স্ত্রী পরিবার সঙ্গে লইয়া রাত্রেতেই পলায়ন করিয়াছিল।

তথা হইতে অগ্রসর হইয়া খেচীয়াড়া, রাজগড়, পাটল, বুন্দী ও কোট রাজ্যে কর গ্রহণ পূর্ব্বক জয়নগর প্রান্তে উপনীত হইলেন। তথাকার মাধব সিং রাজা সাহস পূর্ব্বক চারিদিবস রহিলেন। কিন্তু যুদ্ধ করিতে অক্ষম জানিয়া বিস লক্ষ টাকা কর দিলেন।

ডুব দেওয়া।

ছোট বড়।

ডুবিয়া যাওয়া কথাটা সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু ডুবিয়া মরিবার ক্ষমতা ও অধিকার কয়জন লোকেরই বা আছে! কথাটার প্রকৃত ভাবই বা কে জানে! কবিরা, ভাবুকেরা, ভক্তেরা কেবল বলেন ডুবিয়া যাও, ইতর লোকেরা চারিদিকে চাহিয়া কঠিন মাটিতে পা দিয়া অবাক হইয়া বলে, ডুবিব কোন্ খানে, ডুবিবার স্থান কোথায়!

জলাশয় ছাড়া যখন্ আর কিছুতে মগ্ন হইবার কথা হয়, তখন লোকে সেটাকে অলঙ্কার বলিয়া গ্রহণ করে—সেই জন্য

সে কথা শুনিয়াও শোনে না, মুখে উচ্চারণ করিয়াও বোঝে না, এবং ও-বিষয়ের স্পষ্ট একটা ভাব মনে আনা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করে। কিন্তু আমি বলিতেছি কি, ও শব্দটাকে অলঙ্কার বলিয়া নাই মনে করিলাম; মনে করা যাক্ না কেন, যাহা বলা হইতেছে ঠিক তাহাই বুঝাইতেছে? সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিতেছেন, "আমরা ত আর জলে পড়ি নাই" কিন্তু যখন কাপড় ভিজিবার বা আশু বিপদের কোন আশঙ্কা নাই তখন একবার মনেই করা যাক্‌না কেন যে "হাঁ, আমরা জলেই পড়িয়াছি" দেখি না, কোথায় যাওয়া যায়!

এ জগতের সকল বস্তুরই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিন প্রকারের আয়তন দেখা যায়। কিন্তু এই সকল আয়তনের অতীত আর-এক প্রকার আয়তন তাহাদের আছে, তাহাকে কি বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাহা অসীমায়তনতা, বা আয়তনের অসীম অভাব।

একটি বালুকণাকে আমরা যদি জড়-ভাবে দেখি তবে দেখিতে পাই, তাহা কতক গুলি পরমাণুর সমষ্টি। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই! তাহাকে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি বলিলেই কি তাহার সমস্ত নিঃশেষে বলা হইল, তাহার আর কিছুই বাকী রহিল না! তাহা কি অনন্ত জ্ঞানের সমষ্টি নহে, অনন্ত ইতিহাস অর্থাৎ অনন্ত সময়ের সমষ্টি নহে! তাহার মধ্যে যতই প্রবেশ কর ততই প্রবেশ করা যায় না কি! তাহার বিষয় জানিয়া শেষ করিবার যো নাই—যতই জান ততই আরো জানার আবশ্যক হয়—জানিয়া জানিয়া অবশেষে যখন শ্রান্ত হইয়া সমুদয় জ্ঞান-শৃঙ্খলকে অতি বৃহৎ স্তূপাকৃতি করিয়া তুলা গেল তখনও দেখা গেল বালির বিষয়ে কিছুই জানা গেল না। অতএব নিতান্ত জড়ভাবে না দেখিয়া মানসিক ভাবে দেখিলে বালুকণার আকার আয়তন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, জানা যায় যে তাহা অসীম।

আমরা যাহাকে সচরাচর ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্ব বলি, তাহা কোন কাজের কথা নহে। আমাদের চক্ষু যদি অণুবীক্ষণের মত হইত তাহা হইলেই এখন যাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতেছি, তখন তাহাকেই অতিশয় বৃহৎ দেখিতাম। এই অণুবীক্ষণতা শক্তি কল্পনায় যতই বাড়াইতে ইচ্ছা কর ততই বাড়িতে পারে। অত গোলে কাজ কি, পরমাণুর বিভাজ্যতার ত আর কোথাও শেষ নাই; অতএব একটি বালুকণার মধ্যে অনন্ত পরমাণু আছে, একটি পর্ব্বতের মধ্যেও অনন্ত পরমাণু আছে ছোট বড় আর কোথায় রহিল! একটি পর্ব্বতও যা, পর্ব্বতের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশও তাই, কেহই ছোট নহে, কেহই বড় নহে, কেহই অংশ নহে সকলেই সমান। বালুকণা কেবল যে জ্ঞেয়তায় অসীম, দেশে অসীম তাহা নহে, তাহা কালেও অসীম, তাহারই মধ্যে অনন্ত ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান একত্রে বিরাজ করিতেছে। তাহাকে বিস্তার করিলে দেশেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না, তাহাকে বিস্তার করিলে কালেও তাহার শেষ পাওয়া

যায় না। অতএব একটি বালুকা অসীম দেশ অসীম কাল অসীম শক্তি সুতরাং অসীম জ্ঞেয়তার সংহত কণিকা মাত্র। চোখে ছোট দেখিতেছি বলিয়া একটা জিনিষ সীমাবদ্ধ নাও হইতে পারে। হয়ত ছোট বড়র উপর অসীমতা কিছু মাত্র নির্ভর করে না। হয়ত ছোটও যেমন অসীম হইতে পারে বড়ও তেমনি অসীম হইতে পারে। হয়ত অসীমকে ছোটই বল আর বড়ই বল সে কিছুই গায়ে পাতিয়া লয় না।

"যাহা কিছু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে!
বড় ছোট কিছু নাই, সকলি মহৎ।"

যাহা বলিলাম তাহা কিছুই বুঝা গেল না, কেবল কতকগুলা কথা কহা গেল মাত্র। কিন্তু কোন্ কথাটাই বা সত্য! বালুকা সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়া থাকে, তাহাতেও বালুকার যথার্থ স্বরূপ কিছুই বুঝা যায় না, একটা কথা মুখস্থ করিয়া রাখা যায়। ইহাতেও কিছু ভাল বুঝা গেল না, কেবল একটা বুঝিবার প্রয়াস প্রকাশ পাইল মাত্র।

বিজ্ঞ লোকেরা তিরস্কার করিয়া বলিবেন, যাহা বুঝা যায় না, তাহার জন্য এত প্রয়াসই বা কেন! কিন্তু তাঁহারা কোথাকার কে! তাঁহাদের কথা শোনে কে! তাঁহারা কোন্ দিন ঝরণাকে তিরস্কার করিতে যাইবেন, সে উপর হইতে নীচে পড়ে কেন! কোন্ দিন ধোঁয়ার প্রতি আইনজারি করিবেন সে যেন নীচে হইতে আর উপরে না ওঠে!

ডুবিবার ক্ষমতা।

যাহা হউক আর কিছু বুঝি না বুঝি এটা বোঝা যায় জগতের সর্ব্বত্রই অতল সমুদ্র। মহিষের মত পাঁকে গা ডুবাইয়া নাকটুকু জলের উপরে বাহির করিয়া জগতের তলা পাইয়াছি বলিয়া যে নিশ্চিন্ত ভাবে জড়ের মত নিদ্রা দিব তাহার যো নাই। এক এক জন লোক আছেন তাঁহাদের কিছুই যথেষ্ট মনে হয় না—খানিকটা গিয়াই সমস্ত শেষ হইয়া যায় ও বলিয়া উঠেন, এই বইত নয়! এই ক্ষুদ্রেরা মনে করেন, জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহাদের হাঁটুজল, ডুবজল কোন খানেই নাই। জগতের সকলের উপরেই ইঁহারা মাথা তুলিয়া আছেন, ঐ অভিমানী মাথাটা সবসুদ্ধ ডুবাইয়া দিতে পারেন, এমন স্থান পাইতেছেন না! অস্থির হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহারা যে জগতের অসম্পূর্ণতা ও নিজের মহত্ত্ব লইয়া গর্ব্ব করিতেছেন ইহাঁদের গর্ব্ব ঘুচিয়া যায় যদি জানিতে পারেন ডুব দিবার ক্ষমতা ও অধিকার সকলের নাই। বিশেষ গৌরব থাকা চাই তবে মগ্ন হইতে পারিবে। সোলা যখন জলের চারদিকে অসন্তুষ্ট ভাবে ভাসিয়া বেড়ায় তখন কি মনে করিতে ছুইবে কোথাও তাহার ডুব দিবার উপযোগী স্থান নাই! সে তাই মনে করুক্ কিন্তু জলের গভীরতা তাহাতে কমিবে না।

"আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া,
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!"

ডুবিবার স্থান।

যখন একটা কুকুর একটি গোলাপ ফুল দেখে, তখন তাহার দেখা অতি শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়—কারণ ফুলটি কিছু বড় নহে। কিন্তু এক জন ভাবুক যখন সেই ফুলটি দেখেন তখন তাঁহার দেখা শীঘ্র ফুরায় না, যদিও সে ফুলটি দেড় ইঞ্চি অপেক্ষা আয়ত নহে। কারণ সে গোলাপ ফুলের গভীরতা নিতান্ত সামান্য নহে। যদিও তাহাতে দুই ফোঁটার বেশী শিশির ধরে না, তথাপি হৃদয়ের প্রেম তাহাকে যতই দাও না কেন, তাহার ধারণ করিবার স্থান আছে। সে ক্ষুদ্রকায় বলিয়া যে তোমার হৃদয়কে তাহার বক্ষস্থিত কীটের মত গোটাকতক পাপড়ির মধ্যে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে তাহা নহে, সে আরো তোমাকে এমন এক নূতন বিচরণের স্থানে লইয়া যায়, যেখানে এত বেশী স্বাধীনতা যে একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয়তার মধ্যে হারা হইয়া যাইতে হয়। তখন এক প্রকার অস্ফুট দৈববাণীর মত হৃদয়ের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়, যে, সকলেরই মধ্যে অসীম আছে; যাহাকেই তুমি ভাল বাসিবে সেই তোমাকে তাহার অসীমের মধ্যে লইয়া যাইবে, সেই তোমাকে তাহার অসীম দান করিবে। কে না জানেন, যাহাকে যত ভাল বাসা যায় সে ততই বেশী হইয়া উঠে—নহিলে প্রেমিক কেন বলিবেন, "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল!" একটা মানুষ যত বড়ই হউক না কেন, তাহাকে দেখিতে কিছু বেশীক্ষণ লাগে না—কিন্তু আজন্ম দেখিয়াও যখন দেখা ফুরায় না তখন সে না জানি কত বড় হইয়া উঠিয়াছে! ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, অনুরাগের প্রভাবে প্রেমিক এক জন মানুষের মধ্যস্থিত অসীমের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, সেখানে সে মানুষের আর অন্ত পাওয়া যায় না; হৃদয় যতই দাও ততই সে গ্রহণ করে, যত দেখ ততই নতুন দেখা যায়, যত তোমার ক্ষমতা আছে ততই তুমি নিমগ্ন হইতে পার। এই জন্যই যথার্থ অনুরাগের মধ্যে একপ্রকার ব্যাকুলতা আছে। সে এতখানি পায় যে তাহা প্রাণ ভরিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না—তাহার এত বেশী তৃপ্তি বর্ত্তমান, যে, সে তৃপ্তিকে সে সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিতে পারে না ও তাহা সুমধুর অতৃপ্তিরূপে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকে। যেখানে অনুরাগ নাই সেই খানেই সীমা, সেই খানেই মহাঅসীমের দ্বার রুদ্ধ, সেইখানেই, চারিদিকে লৌহের ভিত্তি, কারাগার। জগৎকে যে ভাল বাসিতে শিখে নাই, সে ব্যক্তি অন্ধকূপের মধ্যে আট্‌কা পড়িয়াছে। সে মনে করিতেও পারে না এই টুকুর বাহিরেও কিছু থাকিতে পারে। তাহার নিজের পায়ের শিকলিটার ঝম্ ঝম্ শব্দই তাহার জগতের একমাত্র [সঙ্গীত। সে কল্পনাও করিতে পারে না কোথাও পাখী ডাকে, কোথাও সূর্য্যের কিরণ বিকীরিত হয়।

অনুরাগেই যে যথার্থ স্বাধীনতা তাহার একটা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। সম্পূর্ণ নূতন লোকের মধ্যে গিয়া পড়িলে আমরা যেন নিশ্বাস লইতে পারি না, হাত পা ছড়াইতে সঙ্কোচ হয়, যে কেহ লোক থাকে সকলেই যেন বাধার মত বিরাজ করিতে থাকে, তাহারা সদয় ব্যবহার করিলেও সকল সময়ে মনের সঙ্কোচ দূর হয় না। তাহার কারণ, এক মাত্র অনুরাগের অভাব বশতঃ আমরা তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাই না, যেখানে স্বাধীনতার যথার্থ বিচরণ ভূমি সে স্থান আমাদের নিকটে রুদ্ধ। আমরা কেবলি তাহাদের নাকে চোখে মুখে, আচারে ব্যবহারে, নূতন ধরণের কথায় বার্ত্তায় হুঁচট ঠোকর ধাক্কা খাইতে থাকি।

পুরাতনের নূতনত্ব।

অতএব দেখা যাইতেছে জগতের সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে অনন্ত অদৃশ্য বর্ত্তমান। নিত্য-নূতন নামক যে শব্দটা কবিরা ব্যবহার করিয়া থাকেন সেটা কি নিতান্ত একটা কথার কথা, একটা আলঙ্কারিক উক্তি মাত্র! তাহার মধ্যে গভীর সত্য আছে। অসীম যতই পুরাতন হউক্ না কেন তাহার নূতনত্ব কিছুতেই ঘুচে না! সে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই বেশী নূতন হইতে থাকে,সে দেখিতে যতই ক্ষুদ্র হউক্ না কেন, প্রত্যহই তাহাকে অত্যন্ত অধিক করিয়া পাইতে থাকি। এই নিমিত্ত যথার্থ যে প্রেমিক সে আর নূতনের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত নহে, শুদ্ধ তাহাই নয়, পুরাতন ছাড়িয়া সে থাকিতে পারে না। কারণ নূতন অতি ক্ষুদ্র, পুরাতন অতি বৃহৎ। পুরাতন যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই তাহার অসীম বিস্তার প্রেমিকের নিকট অবারিত হইতে থাকে, হৃদয় ততই তাহার মর্ম্মস্থানের অভিমুখে ক্রমাগত ধাবমান হইতে থাকে, ততই জানিতে পারা যায় হৃদয়ের বিচরণক্ষেত্র অতি বৃহৎ, হৃদয়ের স্বাধীনতার কোথাও বাধা নাই। যে ব্যক্তি একবার এই পুরাতনের গভীরতার মধ্যে মগ্ন হইতে পারিয়াছে, এই সাগরের হৃদয়ে সন্তরণ করিতে পারিয়াছে সে কি আর ছোট ছোট ব্যাংগুলার আনন্দ কল্লোল শুনিয়া প্রতারিত হইয়া নূতন নামক সঙ্কীর্ণ কূপটার মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিতে পারে!

সাম্য।

এ জগতে সকলি যে সমান, কেহ যে ছোট বড় নহে, তাহা প্রেমের চক্ষে ধরা পড়িল। এই নিমিত্ত যখন দেখা যায়, যে, একজন লোক কুৎসিৎ মুখের দিকে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া আছে, তখন আর আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই—আর একজনকে দেখিতেছি সে সুন্দর মুখের দিকে ঠিক তেমনি করিয়াই চাহিয়া আছে, ইহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কোন কথা নাই। অনুরাগের প্রভাবে উভয়ে মানুষের এমন স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, যেখানে সকল মানুষই সমান, যেখানে কাহারও সহিত কাহারো

একচুল ছোট বড় নাই, যেখানে সুন্দর কুৎসিৎ প্রভৃতি তুলনা আর খাটেই না। সীমা এবং তুলনীয়তা কেবল উপরে, একবার যদি ইহা ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পার ত দেখিবে সেখানে সমস্তই একাকার, সমস্তই অনন্ত। এতবড় প্রাণ কাহার আছে সেখানে প্রবেশ করিতে পারে, বিশ্বচরাচরের মহাসমুদ্রে অসীম ডুব ডুবিতে পারে। প্রেমে সেই সমুদ্রে সন্তরণ করিতে শিখায়—যাহাকেই ভালবাস না কেন তাহাতেই সেই মহা স্বাধীনতার ন্যূনাধিক আস্বাদ পাওয়া যায়! এই যে শূন্য অনন্ত আকাশ ইহাও আমাদের কাছে সীমাবদ্ধরূপে প্রকাশ পায়, মনে হয় যেন একটি অচল কঠিন সুগোল নীল মণ্ডপ আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে; যেন খানিক দূর উঠিলেই আকাশের ছাতে আমাদের মাথা ঠেকিবে। কিন্তু ডানা থাকিলে দেখিতাম ঐ নীলিমা আমাদিগকে বাধা দেয় না, ঐ সীমা আমাদের চোখেরই সীমা; যদিও মণ্ডপের উর্দ্ধে আরও মণ্ডপ দেখিতাম, তদূর্দ্ধে উঠিলে আবার আর-একটা মণ্ডপ দেখিতাম, তথাপি জানিতে পারিতাম যে, উহারা আমাদিগকে মিথ্যা ভয় দেখাইতেছে, উহারা কেবল ফাঁকি মাত্র। আমাদের স্বাধীনতার বাধা আমাদের চক্ষু, কিন্তু বাস্তবিক বাধা কোথাও নাই!

স্বদেশ।

আমার একজন বন্ধু দার্জিলিং কাশ্মীর প্রভৃতি নানা রমণীয় দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিলেন—বাঙ্গালার মত কিছুই লাগিল না। কথাটা শুনিয়া অধিকাংশ লোকই হাসিবেন। কিন্তু হাসিবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। বরং যাঁহারা বলেন বাঙ্গালায়, দেখিবার কিছুই নাই, সমস্তটাই প্রায় সমতল স্থান, পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি বৈচিত্র্য কিছুই নাই, দেশটা দেখিতে ভালই নহে, তাঁহাদের কথা শুনিলেই বাস্তবিক আশ্চর্য্য বোধ হয়। বাঙ্গলা দেশ দেখিতে ভাল নয়! এমন মায়ের মত দেশ আছে! এত কোল-ভরা শস্য, এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য, এমন স্নেহধারাশালিনী ভাগীরথী-প্রাণা কোমল হৃদয়, তরুলতাদের প্রতি এমনতর অনির্ব্বচনীয় করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায়! একজন বিদেশী আসিয়া যাহা বলে শোভা পায়, কিন্তু আজন্মকাল ইহাঁর কোলে যে মানুষ হইয়াছে সেও ইহাঁর সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না! সে ব্যক্তি যে প্রেমিক নহে ইহা নিশ্চয়ই। সুতরাং বাঙ্গলা দেশে সে বাস করে মাত্র, কিন্তু বাংলা দেশ সে দেখেই নি—বাঙ্গলা দেশে সে কখনো যায় নি, ম্যাপে দেখিয়াছে মাত্র। এত দেশে গিয়াছি এত নদী দেখিয়াছি কিন্তু বাংলার গঙ্গা যেমন এমন নদী আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু কেন? অমুক দেশে একটা নদী আছে সেটা গঙ্গার চেয়ে চওড়া—অমুক সাগরে একটা নদী পড়িয়াছে সেটা গঙ্গার চেয়ে দীর্ঘ—অমুক স্থানে একটা নদী বহিতেছে, গঙ্গার চেয়ে তাহার তরঙ্গ বেশী। ইত্যাদি।

কেন।

এই কেন লইয়াইত যত মারামারী। যে ভালবাসে সে কেনর উত্তর দিতে পারে না। তুমি তর্ক করিলে বাঙ্গালার চেয়ে কাশ্মীর ভাল দেশ হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু তবু আমার কাছে কেন বাংলাই ভাল দেশ। তার্কিক বলেন, বাল্যাবধি বাঙ্গলা দেশটা তোমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাই ভাল লাগিতেছে। ঠিক কথা। কিন্তু অভ্যাস হইয়া যাওয়ার দরুণ ভাল লাগিবার কি কারণ হইতে পারে! তাঁহাদের কথার ভাবটা এই যে বাঙ্গলা দেশে আসলে যাহা নাই, আমি তাহাই যেন নিজের তহবিল হইতে দেশকে অর্পণ করি। এ কথা কোন কাজের নহে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রেম একটি সাধনা। ভাল বাসিয়া আজন্ম প্রত্যহ দেশের পানে চাহিয়া দেখিলে দেশ সদয় হইয়া তাঁহার প্রাণের মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যান—কারণ সকলেরই প্রাণ আছে। ভাল বাসিলে সকলেই তাহার প্রাণে ডাকিয়া লয়। বাহ্য আকার-আয়তনের মধ্যে স্বাধীনতা নাই, তাহা বাধা-বিপত্তিময়—আকার আয়তনের অতীত প্রাণের মধ্যেই স্বাধীনতা—সেখানে পায়ে কিছু ঠেকেনা, চোখে কিছু পড়ে না, শরীরে কিছুই বাধে না—কেবল এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় স্বাধীনতার আনন্দ। ইহার কাছে কি আর "কেন" ঘেঁসিতে পারে! স্বদেশে আমাদের হৃদয়ের কি স্বাধীনতা! স্বদেশে আমাদের কতখানি জায়গা! কারণ স্বদেশের শরীর ক্ষুদ্র স্বদেশের হৃদয় বৃহৎ। স্বদেশের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছি। স্বদেশের প্রত্যেক গাছপালা আমাদের চোখে ঠেকে না. আমরা একেবারেই তাহার ভিতরকার ভাব তাহার হৃদয়পূর্ণ মাধুরী দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য এই স্বাধীনতা সকল দেশের লোকেই সমান উপভোগ করিতে পারেন। ইহার জন্য ভূগোল বিবরণ পড়িয়া রেলোয়ের টিকিট কিনিয়া দূরদূরান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই।

এক কাঠা জমি।

একদল লোক আছেন তাঁহারা যেখানে যতই পুরাতন হইতে থাকেন, সেই খানে ততই অনুরাগসূত্রে বদ্ধ হইতে থাকেন, আর একদল লোক আছেন, তাঁহাদিগকে অভ্যাস-সূত্রে কিছুতেই বাঁধিতে পারে না, দশ বৎসর যেখানে আছেন সেও তাঁহার পক্ষে যেমন, আর একদিন যেখানে আছেন সেও তাহার পক্ষে তেমনি। লোকে হয়ত বলিবে তিনিই যথার্থ দূরদর্শী, অপক্ষপাতী, কেবল মাত্র সামান্য অভ্যাসের দরুণ তাঁহার নিকট কোন জিনিষের একটা মিথ্যা বিশেষত্ব প্রতীতি হয় না। বিশ্বজনীনতা তাঁহাতেই সম্ভবে। ঠিক উল্টো কথা।, বিশ্বজনীনতা তাঁহাতেই সম্ভবে না। বিশ্বের প্রত্যেক বিঘা প্রত্যেক কাঠাতেই বিশ্ব বর্ত্তমান। একদিনে তাহা আয়ত্ত হয় না। প্রত্যহ অধিকার বাড়িতে থাকে। যিনি দশবৎসরে এক স্থানের কিছুই অধিকার করিতে পারিলেন না. তিনি বিশ্বকে অধি-

কার করিবেন কি করিয়া! বিশ্ব সর্ব্বত্রই অসীম গভীর এবং অসীম প্রশস্ত। অতএব বিশ্বের এক কাঠা জমিকে যথার্থ ভাল-বাসিতে গেলে বিশ্বজনীনতা থাকা চাই।

জগৎ মিথ্যা।

যাঁহারা বলেন জগৎ মিথ্যা, তাঁহাদের কথা একহিসাবে সত্য এক হিসাবে সত্য নয়। বাহির হইতে জগৎকে যেরূপ দেখা যায় তাহা মিথ্যা। তাহার উপরে ঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

ঈথর কাঁপিতেছে, আমি দেখিতেছি আলো; বাতাসে তরঙ্গ উঠিতেছে আমি শুনিতেছি শব্দ, ব্যবচ্ছেদবিশিষ্ট অতি সূক্ষ্মতম পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ চলিতেছে আমি দেখিতেছি বৃহৎ দৃঢ় ব্যবচ্ছেদহীন বস্তু। বস্তুবিশেষ কেনই যে বস্তুবিশেষ রূপে প্রতিভাত হয় আর-কিছু রূপে হয় না, তাহার কোন অর্থ পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্য কিছুই নাই, আমাদের নিকটে যাহা বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতেছে, আর একদল নূতন জীবের নিকটে তাহা কেবল শব্দরূপে প্রতীত হইতেছে। আমাদের কাছে বস্তু দেখা ও তাহাদের কাছে শব্দ শোনা একই। এমনও আশ্চর্য্য নহে, আর এক নূতন জীব দৃষ্টি শ্রুতি ঘ্রাণ স্বাদ স্পর্শ ব্যতীত আর এক নূতন ইন্দ্রিয়-শক্তি দ্বারা বস্তুকে অনুভব করে তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। বস্তুকে ক্রমাগত বিশ্লেষ করিতে গেলে তাহাকে ক্রমাগত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে পরিণত করা যায়—অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়ায় আমাদের ভাষায় যাহার নাম নাই, আমাদের মনে যাহার ভাব নাই। মুখে বলি তাহা অসংখ্য শক্তির খেলা, কিন্তু শক্তি বলিতে আমরা কিছুই বুঝিনা। অতএব আমরা যাহা দেখিতেছি শুনিতেছি, তাহার উপরে অনন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। কাজের সুবিধার জন্য রফা করিয়া কিছু দিনের মত তাহাকে এই আকারে বিশ্বাস করিবার একটা বন্দোবস্ত হইয়াছে মাত্র; আবার অবস্থা পরিবর্ত্তনে এ চুক্তি ভাঙ্গিলে তাহার জন্য আমরা কিছুমাত্র দায়িক হইব না।

তুলনায় অরুচি।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে, এই বেলা সেই কথাটা বলিয়া লই, পুনশ্চ পূর্ব্বকথা উত্থাপন করা যাইবে। অনেক লোক আছেন তাঁহারা কথা বার্ত্তাতেই কি, আর কবিতাতেই কি তুলনা বর্দাস্ত করিতে পারেন না। তুলনাকে তাঁহারা নিতান্ত একটা ঘরগড়া মিথ্যা রূপে দেখেন; নিতান্ত অনুগ্রহ পূর্ব্বক ওটাকে তাঁহারা মানিয়া লন মাত্র। তাঁহারা বলেন যেটা যাহা সেটাকে তাহাই বল, সেটাকে আবার আর-একটা বলিলে তাহাকে একটা অলঙ্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা। ইহাঁরা কঠিন নৈয়ায়িক লোক, ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে সকল কথা বাজাইয়া লন, কবিতার তুলনা উপমা প্রভৃতি ন্যায় শাস্ত্রের নিকট যাচাই করিয়া

ভাবে গ্রহণ করেন। অতএব ইহাঁদের কাছে শাস্ত্র অনুসারেই কথা কহা যাক। জগৎসংসারে কোন্ জিনিষটা একেবারে স্বতন্ত্র, কোন জিনিষটা এতবড় প্রতাপান্বিত যে কোন কিছুর সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না? জড় বুদ্ধিরা সকল জিনিষকেই পৃথক করিয়া দেখে, তাহাদের কাছে সবই স্বস্ব-প্রধান। বুদ্ধির যতই উন্নতি হয় ততই সে ঐক্য দেখিতে পায়। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল ক্রমাগত একের প্রতি ধাবমান হইতেছে সহজ চক্ষে যাহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল, তাহারাও অভেদাত্মা হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ বিশ্বরাজ্যে বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ঐক্য, দর্শন দার্শনিক ঐক্য দেখাইতেছে, কবিতা কি অপরাধ করিল। তাহার কাজ জগতের সৌন্দর্য্যগত ভাবগত ঐক্য বাহির করা। তুলনার সাহায্যে কবিতা তাহাই করে; তাহাকে যদি তুমি সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য না কর, কল্পনার ছেলেখেলা মাত্র মনে কর তাহা হইলে কবিতাকে অন্যায় অপমান করা হয়। কবিতা যখন বলে, তারাগুলি আকাশে চলিতে চলিতে গান গাহিতেছে— যথা (There's not the smallest orb
which thou beholdst
But in his motion like an angel
sings.)

তখন তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শুনিয়া গিয়া কবিকে নিতান্তই বাধিত কর।" মনে মনে বলিতে থাক, তারা চলিতেছে ইহা স্বীকার করি, কিন্তু কোথায় চলা আর কোথায় গান গাওয়া! চলাটা চোখে দেখিবার বিষয় আর গান গাওয়াটা কানে শুনিবার—তবে অলঙ্কারের হিসাবে মন্দ হয় নাই। কিন্তু হে তর্কবাচস্পতি, বিজ্ঞান যখন বলে, বাতাসের তরঙ্গ লীলাই ধ্বনি, তখন তুমি কেন বিনা বাক্যব্যয়ে অম্লান বদনে কথাটাকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেল। কোথায় বাতাসের বিশেষ একরূপ কম্পন নামক গতি, আর কোথায় আমাদের শব্দ শুনিতে পাওয়া! সচরাচর বাতাসের গতি আমাদের স্পর্শের বিষয় কিন্তু শব্দে ও স্পর্শে যে ভাই ভাই সম্পর্ক ইহা কে জানিত! বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া করিয়া জানিয়াছেন, কবিরা হৃদয়ের ভিতর হইতে জানিতেন। কবিরা জানিতেন, হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে শব্দ স্পর্শ ঘ্রাণ সমস্ত একাকার হইয়া যায়। তাহারা যতক্ষণ বাহিরে থাকে ততক্ষণ স্বতন্ত্র। তাহারা নানা দিক হইতে নানা দ্রব্য স্বতন্ত্র ভাবে উপার্জ্জন করিয়া আনে, কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃপুরের মধ্যে সমস্তই একত্রে জমা করিয়া রাখে, এবং এমনি গলাগলি করিয়া থাকে যে কোনটি যে কে চেনা যায় না। সেখানে গন্ধকে স্পৃশ্য বলিতে আপত্তি নাই, রূপকে গান বলিতে বাধে না। পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে, যেখানে গভীর সেখানে সমস্তই একাকার। সেখানে হাসিও যা কান্নাও তা, সেখানে সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।

জ্ঞানে যাহারা বর্ব্বর তাহারা যেমন জগতে বৈজ্ঞানিক ঐক্য দার্শনিক ঐক্য দেখিতেও পায় না, বুঝিতেও পারে না,

তেমনি ভাবে যাহারা বর্ব্বর তাহারা কবিতা-গত ঐক্য দেখিতেও পায় না বুঝিতেও পারে না। ইংরাজি সাহিত্য পড়িয়া আমার মনে হয় কবিতায় তুলনা ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে, যাহাদের মধ্যে ঐক্য সহজে দেখা যায় না, তাহাদের ঐক্যও বাহির হইয়া পড়িতেছে। কবিতা, বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসিয়া মিলিবে ও আর কখন বিচ্ছেদ হইবে না।

জগৎ সত্য।

যাহা হউক দেখা যাইতেছে, সবই একাকার হইয়া পড়ে, জগৎটা না থাকিবার মতই হইয়া আসে। যাহা দেখিতেছি তাহা যে তাহাই নহে ইহাই ক্রমাগত মনে হয়। এই জন্যই জগৎকে কেহ কেহ মিথ্যা বলেন। কিন্তু আর এক রকম করিয়া জগৎকে হয়ত সত্য বলা যাইতে পারে।

সত্য যাহা তাহা অদৃশ্য, তাহা কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা একটা ভাব মাত্র। কিন্তু ভাব আমাদের নিকট নানারূপে প্রকাশ পায়, ভাষা আকারে, অক্ষর আকারে, বিবিধ বস্তুর বিচিত্র বিন্যাস আকারে। তেমনি প্রকৃত জগৎ যাহা তাহা অদৃশ্য, তাহা কেবল একটি ভাব মাত্র, সেই ভাবটি আমাদের চোখে বহির্জ্জগত রূপে প্রকাশিত হইতেছে। যেমন, যাহা পদার্থ নহে যাহা একটি শক্তি মাত্র তাহাকেই আমরা বিচিত্র বর্ণরূপে আলোকরূপে দেখিতেছি ও উত্তাপ রূপে অনুভব করিতেছি, তেমনি যাহা একটি সত্তামাত্র তাহাকে আমরা বহির্জ্জগত রূপে দেখিতেছি। একজন দেবতার কাছে হয়ত এ জগৎ একেবারেই অদৃশ্য, তাঁহার কাছে আকার নাই আয়তন নাই, গন্ধ নাই শব্দ নাই স্পর্শ নাই, তাঁহার কাছে কেবল একটা জানা আছে মাত্র। একটা তুলনা দিই। তুলনাটা ঠিক না হউক একটুখানি কাছাকাছি আসে। আমার যখন বর্ণপরিচয় হয় নাই, তখন যদি আমার নিকটে একখানা বই আনিয়া দেওয়া হয়—তবে সে বইয়ের প্রত্যেক আঁচড় আমার চক্ষে পড়ে, প্রত্যেক বর্ণ আলাদা আলাদা করিয়া দেখিতে পাই ও সমস্তটা অনর্থক ছেলেখেলা মনে করি। কিন্তু যখন পড়িতে শিখি, তখন আর অক্ষর দেখিতে পাই না। তখন বস্তুতঃ বইটা আমার নিকটে অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু তখনি বইটা যথার্থতঃ আমার নিকটে বিরাজ করিতে থাকে। তখন আমি যাহা দেখি তাহা দেখিতে পাই না, আর একটা দেখিতে পাই। তখন আমি বস্তুতঃ দেখিলাম, গ-য়ে আকার ছ, (গাছ) কিন্তু তাহা না দেখিয়া দেখিলাম একটা ডালপালা-বিশিষ্ট উদ্ভিদ্ পদার্থ। কোথায় একটা কালো আঁচড় আর কোথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ! কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা বুঝিয়া পড়িতে পারি ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ আঁচড়গুলা কি সমস্তই মিথ্যা নহে! যে ব্যক্তি শাদা কাগজের উপরে হিজিবিজি কাটে তাহাকে কি আমরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিব না! কারণ অক্ষর মিথ্যা। আমার

একরূপ অক্ষর আর-একজনের আর-এক-রূপ অক্ষর। ভাষা মিথ্যা। আমার ভাষা এক তোমার ভাষা আর-এক। আজিকার ভাষা এক কালিকার ভাষা আর-এক। এ ভাষায় বলিলেও হয় ও-ভাষায় বলিলেও হয়। গাছ বলিয়া একটা আওয়াজ শুনিলে আমি মনের মধ্যে যে জিনিষটা দেখিতে পাইব, আর-একজন ব্যক্তি ট্রী বলিয়া একটা আওয়াজ না শুনিলে ঠিক সে জিনিষটা মনে আনিতে পারিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে অক্ষর ও ভাষা তুমি ঘরে গড়িয়া বন্দোবস্ত করিয়া বদল করিতে পার, কিন্তু তাহারি আশ্রিত ভাবটিকে খেয়াল অনুসারে বদল করা যায় না, তাহা ধ্রুব।

জগৎকে যে আমাদের মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার কারণ কি এমন হইতে পারে না যে, জগতের বর্ণপরিচয় আমাদের কিছুই হয় নাই! জগতের প্রত্যেক অক্ষর আঁচড়ের আকারে সুতরাং মিথ্যা আকারে আমাদের চোখে পড়িতেছে। যখন আমরা বাস্তবিক জগৎকে পড়িতে পাইব তখন ইহাকে আর দেখিতেই পাইব না। এ পড়া কি এক দিনে শেষ হইবে! এ বর্ণমালা কি সামান্য!

এজগৎ মিথ্যা নয় বুঝি সত্য হবে,
অক্ষর আকারে শুধু লিখিত রয়েছে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমা রূপ ধরি!

প্রেমের শিক্ষা।

কিন্তু কে পড়াইবে! কে বুঝাইয়া দিবে যে জগৎ কেবল স্তুপাকৃতি কতকগুলো বস্তু নহে, উহার মধ্যে ভাব বিরাজমান। আর কেহ নহে প্রেম। জগৎকে যে যথার্থ ভালবাসে সে কখন মনে করিতেও পারে না, জগৎ একটা নিরর্থক জড়পিণ্ড। সে ইহারই মধ্যে অসীমের ও চিরজীবনের আভাস দেখিতে পায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রেমেই যথার্থ স্বাধীনতা। কারণ যতটা দেখা যায় প্রেমে তার চেয়ে ঢের বেশী দেখাইয়া দেয়!

জগৎকে কখন্ মিথ্যা মনে করিতে পারি না, যখন জগৎকে ভাল বাসি! একজন যে সে লোক মরিয়া গেলে আমরা সহজেই মনে করিতে পারি যে, এ লোক্টা একেবারে ধ্বংশ হইয়া গেল, কারণ সে আমার নিকট এত ক্ষুদ্র! কিন্তু একজন প্রিয় ব্যক্তির মরণে আমাদের মনে হয় এ কখনো মরিতে পারে না। কারণ তাহার মধ্যে আমরা অসীমতা দেখিতে পাইয়াছি। যাহাকে এত বেশী ভাল বাসিয়াছি সে কি একেবারে "নাই" হইয়া যাইতে পারে! সে ত কম লোক নয়! তাহাকে যতখানি হৃদয় দিয়াছি ততখানিই সে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উপরে যতই আশা স্থাপন করিয়াছি ততই আশা ফুরায় নি, রজ্জুবদ্ধ লৌহখণ্ডের মত আমার সমস্তটা তাহার মধ্যে ফেলিয়া মাপিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার তল পাই নাই। যাহার নিকট হইতে সীমা যতদূরে মৃত্যুও ততদূরে। অতএব এতখানি বিশালতার এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্ধান এ কখনো সম্ভবপর নহে। প্রেম আমাদের হৃদয়ের

ভিতর হইতে এই কথা বলিতেছে, তর্ক যাহা বলে বলুক। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রেম আসিয়াই আমাদের শিক্ষা দেয় এ জগৎ সত্য এবং প্রেমই বলে সত্য উপরে ভাসিতেছে না, সত্য ইহার গভীর অভ্যন্তরে নিহিত আছে। যাহা হউক পথ দেখিতে পাইলাম, আশা জন্মিতেছে ক্রমে তাহাকে পাইতেও পারি। ইহাকে অবিশ্বাস করিয়া মরণকে বিশ্বাস করিয়া কি সুখ! হৃদয়ের সভ্যতার যতই উন্নতি হইবে এই মরণের প্রতি বিশ্বাস ততই চলিয়া যাইবে জীবনের প্রতি বিশ্বাস ততই বাড়িবে।

ভাল করে পড়িব এ জগতের লেখা।
শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘৃণা।
লোক হতে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া,
ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার!
বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে!
আঁখি মেলি চারিদিকে করিব ভ্রমণ।
ভাল বেসে চাহিব এ জগতের পানে
তবে ত দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল্য।

চাউল, কাপড়, গাড়ি ঘোড়া ইত্যাদি ব্যবহার্য্য সামগ্রী ক্রয় করিবার সময় আমরা ঐ সকল সামগ্রীর মূল্য দিতে স্বীকৃত হই; কোন সামগ্রীর মূল্য কি নিয়মে নির্দ্ধারিত হয়, তাহা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। মনে কর বাজারে চাউলের মূল্য কি নিয়মে নির্দ্ধারিত হইবে তাহা আমরা জানিতে চাহি; যে মূল্যে চাউলের চাহিদা উহার আমদানির সমান হইবে সেই মূল্যে চাউল বিক্রয় হইবে। চাউলের চাহিদা বলিতে খরিদ দারেরা কত চাউল কিনিতে চায় তাহা বুঝায়, আর চাউলের আমদানি শব্দে কত চাউল বিক্রয় করিবার নিমিত্ত আনা হইয়াছে তাহা বুঝায়। চাউলের আমদানি সম্বন্ধে আমরা এখানে অধিক কথা বলিতে চাহি না; সকলেই প্রায় জানেন যে যে স্থান হইতে অন্যান্য স্থানে গতায়াতের সুবিধা অধিক সে স্থানে চাউল ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর আমদানির সম্ভাবনাও অধিক, আর যেস্থানে ওরূপ গতায়াতের সুবিধা কম সে স্থানে ওরূপ আমদানির সম্ভাবনাও কম। চাউলের চাহিদা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে তাহা আমরা এখন বিবেচনা করিয়া দেখি। কোন সামগ্রীর সাধকত্বের বৃদ্ধির সহিত তাহার মূল্যও বৃদ্ধি পাইতে থাকে আর সেই সঙ্গে

তাহার চাহিদা হ্রাস পাইতে থাকে। কোন সামগ্রীর সাধকত্ব বলিতে যে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য উহার ব্যবহার হয় তাহার কতখানি পূরণ সাধন উহা দ্বারা হইতে পারে তাহা বুঝায়। মনে কর একজন দরিদ্র লোকের এক সপ্তাহের নিমিত্ত পাঁচ সের চাউলের দরকার, এক আনা করিয়া যদি সে চাউলের সের কিনিতে পায়, তবে সে ঐ পাঁচ সের চাউল কিনিতে পারে ; কিন্তু চাউল মহার্ঘ হইয়াছে, চাউলের সের চারি আনা করিয়া বিক্রয় হইতেছে। দরিদ্র লোকটীর এত সঙ্গতি নাই যে সে চারি আনা করিয়া সের কিনিয়া এক সপ্তাহের নিমিত্ত পাঁচ সের চাউল লইতে পারে, অথচ তাহার নিকট চাউল এত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে যে সে ঐরূপ উচ্চ মূল্যেও এক সপ্তাহের নিমিত্ত একসের চাউল কিনিল ; আর বাকী চারিসের চাউলের স্থলে সে শাক কি অন্য কোন সুলভ দ্রব্য ব্যবহার করিল। অতএব এই ব্যক্তি প্রথম একসের চাউলের নিমিত্ত চারি আনা মূল্য দিতে প্রস্তুত আছে, তাহার পর দ্বিতীয় আর একসের চাউলের নিমিত্ত সে চারি আনা দিতে প্রস্তুত নহে কিন্তু তিন আনা দিতে পারে; অর্থাৎ তিন আনা করিয়া সের হইলে সে এক সপ্তাহের নিমিত্ত ছয় আনা দিয়া দুইসের চাউল কিনিতে পারে। এখানে দেখা যাইতেছে ঐ ব্যক্তির পক্ষে প্রথম এক সেরের যত সাধকত্ব, দ্বিতীয় এক সেরের তত নহে অর্থাৎ সপ্তাহের মধ্যে মোটে একসের চাউল পাইলে তাহা পাইতে তাহার যত স্পৃহা হইবে, দ্বিতীয় আর একসের পাইতে তত হইবে না। এখানে দেখা যাইতেছে দ্বিতীয় একসের চাউল অপেক্ষা প্রথম এক সের চাউলের সাধকত্ব অধিক সুতরাং উহার অপেক্ষা ইহার মূল্যও অধিক, আবার আমরা ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে উক্ত দরিদ্র ব্যক্তি তিন আনা করিয়া সের হইলে দুইসের চাউল লইতে পারে আর চারি আনা করিয়া সের হইলে কেবল মাত্র এক সের চাউল লইবে, অর্থাৎ মূল্যের বৃদ্ধির সহিত চাহিদার হ্রাস হইয়াছে। এখন মনে কর চাউলের দর আড়াই আনা করিয়া সের হইল, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি তৃতীয় আর একসের চাউল লইতে পারে অর্থাৎ সাড়ে সাত আনা দিয়া তিন সের চাউল কিনিতে পারে ; চতুর্থ একসেরের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তি দুই আনা দিতে প্রস্তুত আছে অর্থাৎ দুই আনা করিয়া সের হইলে সে এক সপ্তাহের নিমিত্ত আট আনা দিয়া চারিসের চাউল লইতে পারে; আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এক আনা করিয়া সের পাইলে সে পাঁচসের চাউল কিনিতে পারে অর্থাৎ পঞ্চমসেরের নিমিত্ত সে এক আনা দিতে প্রস্তুত আছে। এইরূপে চাউলের সাধনের বৃদ্ধির সহিত তাহার মূল্য বৃদ্ধি পায় আর মূল্যের বৃদ্ধির সহিত চাউলের চাহিদার হ্রাস পায়। ফলতঃ সাধকত্বের বৃদ্ধি বলিলে চাহিদার হ্রাস বুঝায়; কোন সামগ্রী যখন অধিক পাওয়া যায় তাহার তখন সাধকত্ব কম হইয়া পড়ে, সুতরাং অন্যান্য বিষয় সমান থাকিলে সে সামগ্রীর সাধকত্ব অধিক বলিলে যে মাত্রায় তাহা

পাওয়া যাইতেছে তাহা অল্প বলিয়া বুঝিতে হইবে; কিন্তু যে সামগ্রী ক্রয়বিক্রয় করা হইয়া থাকে তাহার পক্ষে এই সামগ্রী অল্প পাওয়া যাইতেছে ইহা বলাও যে কথা এই সামগ্রী অল্প কেনা হইতেছে অর্থাৎ এই সামগ্রীর চাহিদা কম ইহা বলাও প্রকৃত পক্ষে সেই কথা। এখন আমরা আবার সেই দরিদ্র ব্যক্তির উদাহরণ সম্বন্ধে আমাদিগের আর যাহা বলিবার আছে তাহা বলিতেছি; এক সপ্তাহে পাঁচ সের চাউল যদি ঐ ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে সে চাউলের সের এক আনার নীচে হইলে আর অধিক চাউল না লইলেও পারে অথবা চাউল সুলভ দেখিয়া সে কতক ভবিষ্যতে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত পাঁচ সেরের অধিক কিনিলেও পারে। এখন দেখা যাইতেছে যে চাউলের মূল্য যত কম হইবে এই ব্যক্তি তত অধিক চাউল কিনিবে।

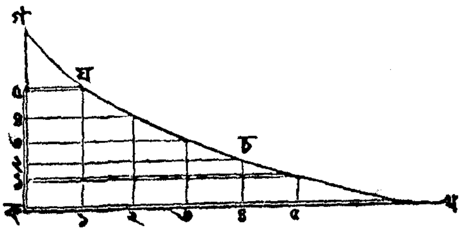

এই ব্যক্তি যে মূল্যে যত চাউল চাহে তাহা একটী রেখা দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে, মনে কর খ গ সেইরেখা; ক খ চাউলের চাহিদার মাত্রা, আর কগ মূল্যের মাত্রা প্রকাশ করিতেছে। ক গ রেখায় ১, ২, ৩, ৪ এই সংখ্যাগুলি এক আনা, দুই আনা, তিন আনা, চারি আনা এই কয়টী মূল্যের মাত্রা আর ক খ রেখায় ১, ২, ৩, ৪ এক, দুই, তিন, চারিসের এই কয়টী চাহিদার মাত্রা প্রকাশ করিতেছে। চারি আনা মূল্যে এই ব্যক্তি একসের মাত্র চাউল চায়, ইহা উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে, ক গ রেখায় ৪ র বিন্দু হইতে ক খয়ের সমান্তরাল রেখা টান, এই রেখা যেখানে খগকে ভেদ করিবে সেখান (ঘ বিন্দু) হইতে কগয়ের সমান্তরাল একটী রেখা টান, এই রেখা কখকে যেখানে ভেদ করিবে সেখান হইতে ক পর্য্যন্ত যত দূর তাহা চাউলের চাহিদার মাত্রা প্রকাশ করিবে। চিত্রে দেখা যাইতেছে যে এই দূরত্ব এক সংখ্যা মাত্র, অর্থাৎ উল্লিখিত ব্যক্তি চারি আনা দামে কেবল একসের মাত্র চাউল লইতে প্রস্তুত। আবার যদি এই ব্যক্তি চারিসের চাউল কেনে, তবে প্রত্যেক সেরের মূল্য দুই আনা হওয়া চাই তাহাও চিত্রে দেখা যাইতেছে। কখ রেখায় ৪ র দাগ হইতে কগয়ের সমান্তরাল রেখা টান, এই রেখা যেখানে খগকে স্পর্শ করিবে সেখান (চ বিন্দু) হইতে ক খয়ের সমান্তরাল রেখা টান এই রেখা ক গয়ের যে বিন্দু স্পর্শ করিবে ক বিন্দু হইতে তাহার

* এই চিত্রে ক গ রেখায় ভ্রমক্রমে ৩ র স্থানে ৪, আর ৪ র স্থানে ৫ বসান হইয়াছে; পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা সংশোধন করিয়া লইবেন। চিত্রে ক গ রেখার যেখানে ৩ আছে সেখানে ২½ পড়িতে হইবে।

যত দূরত্ব চাউলের মূল্যের মাত্রাও তত হইবে, চিত্রে দেখা যাইতেছে যে এই দূরত্ব দুই অর্থাৎপ্রত্যেক সেরের মূল্য দুই আনা। এইরূপে কত মূল্যে কত চাউল এই ব্যক্তি কিনিবে তাহা খগ রেখা হইতে জানা যাইতে পারে। খগ রেখা কগ ও কখ দুই রেখাকেই স্পর্শ করিয়াছে—কগকে স্পর্শ করার অর্থ এই যে মূল্য এত অধিক হইতে পারে যে ঐ ব্যক্তি চাউল একেবারেই কিনিতে সমর্থ হইবে না, কখকে স্পর্শ করার অর্থ এই যে মূল্য যখন একেবারে কিছুই হইবে না তখন ঐ ব্যক্তি চাউল যাহা দরকার তাহা বায়ুর ন্যায় অনায়াসে কি জলের ন্যায় অল্প আয়াসে পাইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই মূল্য ও মাত্রা সূচক (খ গয়ের ন্যায়) একটী রেখা অঙ্কিত করা যাইতে পারে ; (কগ ও কখয়ের ন্যায়) অন্য দুই রেখা হইতে এই রেখার বিন্দুগুলির দূরত্ব দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার মূল্যের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার চাহিদা নির্ণয় করিতে হইবে। পূর্ব্বের উদাহরণে আমরা বলিয়াছি যে একজন দরিদ্র লোক প্রথম একসের চাউলের নিমিত্ত চারি আনা, দ্বিতীয় একসের চাউলের নিমিত্ত তিন আনা, তৃতীয় একসের চাউলের নিমিত্ত আড়াই আনা, চতুর্থ একসের চাউলের নিমিত্ত দুই আনা ইত্যাদি প্রকারে মূল্য দিতে প্রস্তুত আছে। উহার অপেক্ষা অধিক ধনী একজন ব্যক্তি হয়ত প্রথম একসের চাউলের নিমিত্ত আট আনা, দ্বিতীয় একসের চাউলের নিমিত্ত সাত আনা, তৃতীয় একসেরের নিমিত্ত ছয় আনা, চতুর্থ একসের চাউলের নিমিত্ত পাঁচ আনা, ইত্যাদি প্রকার মূল্যে চাউল কিনিতে প্রস্তুত আছে। এই ব্যক্তি অপেক্ষা আরও অধিক ধনী এক ব্যক্তি হয়ত প্রথম একসের চাউলের নিমিত্ত দশ আনা, দ্বিতীয় একসেরের নিমিত্ত নয় আনা তৃতীয় একসেরের নিমিত্ত আট আনা, চতুর্থ একসেরের নিমিত্ত সাতআনা ইত্যাদি প্রকারে মূল্য দিয়া চাউল লইতে প্রস্তুত আছে।

প্রথম ব্যক্তি	মূল্য——	৪,	৩,	২৷৷০,	২,	ইত্যাদি
	×	×	×	×	×	
	চাহিদা —	১,	২,	৩,	৪,	ইত্যাদি
	সমুদয় মূল্য—	৪,	৬,	৭৷৷০,	৮,	ইত্যাদি

দ্বিতীয় ব্যক্তি	মূল্য——	৮,	৭,	৬,	৫,	৪,	৩,	ইত্যাদি
	×	×	×	×	×	×	×	
	চাহিদা—	১,	২,	৩,	৪,	৫,	৬,	ইত্যাদি
	সমুদয় মূল্য—	৮,	১৪,	১৮,	২০,	২০,	১৮,	ইত্যাদি

তৃতীয় ব্যক্তি	মূল্য——	১০,	৯,	৮,	৭,	৬,	৫,	৪,	৩,	ইত্যাদি
	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	চাহিদা—	১,	২,	৩,	৪,	৫,	৬,	৭,	৮,	ইত্যাদি
	সমুদয় মূল্য—	১০,	১৮,	২৪,	২৮,	৩০,	৩০,	২৮,	২৪,	ইত্যাদি

মনেকর চাউলের সের দশ আনা করিয়া হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি চাউল কিনিতে পারে না, তাহা হইলে উল্লিখিত তিন ব্যক্তির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিই কেবল ঐ দরে চাউল কিনিবে আর সে ব্যক্তিও কেবল একসের চাউল কিনিবে; সুতরাং এই তিন ব্যক্তিকেই যদি আমরা ক্রেতৃবর্গ বলিয়া গণ্য করি অর্থাৎ এই তিন ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ ক্রেতা নাই এইরূপ যদি আমরা মনে করি, তবে চাউল বিক্রয় করিয়া কেবল মাত্র দশ আনা হইবে। আবার মনে কর আট আনা করিয়া সের হইলে প্রথম ব্যক্তি চাউল কিনিতে পারে না, তাহা হইলে ঐ দরে কেবল অন্য দুই ব্যক্তি চাউল কিনিবে। তৃতীয় ব্যক্তি ৮ আনা করিয়া ৩ সের, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ৮ আনা করিয়া ১ সের কিনিবে, সুতরাং চাউল বিক্রয় করিয়া সমুদয়ে ২৪+৮=৩২ আনা হইবে। চাউলের দর যদি চার আনা সের হয় তবে তৃতীয় ব্যক্তি ৭ সের, দ্বিতীয় ব্যক্তি ৫ সের, আর প্রথম ব্যক্তি ১ সের কিনিবে; সমুদয়ে ২৮+২০+৪=৫২ আনা হইবে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দরে ভিন্ন মাত্রায় চাউল বিক্রয় হইবে আর সমুদয় মূল্য ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার হইবে। এই উদাহরণে চাউলের চাহিদা যেমন এক সংখ্যা দ্বারা ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে, চাউলের মূল্যও তেমন ২য় ও ৩য় ব্যক্তির পক্ষে এক সংখ্যা দ্বারা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে আমরা এইরূপ অনুমান করিয়াছি কিন্তু ইহা একটী উদাহরণ মাত্র। চাউলের চাহিদার ঐ রূপে হ্রাস হইলে, চাউলের মূল্য অন্য কোন প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহা বলা বাহুল্য। এখন দেখা যাউক চাউলের মূল্য কি নিয়মে নির্দ্ধারিত হইবে। মনে কর কোন দেশে এক জন লোক সমুদয় চাউল উৎপন্ন ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা 'একচেটিয়া' করিয়া লইয়াছে; এরূপ অবস্থায় এই ব্যক্তি প্রথমে বিবেচনা করিবে যে প্রত্যেক সের চাউল উৎপন্ন করিতে ও বিক্রয় করিতে তাহার কত খরচ পড়িবে; সে যত কম খরচে উহা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে, সে এমন দেখিতে পাইতে পারে যে অধিক চাউল প্রস্তুত করিলে (অপেক্ষাকৃত) অল্প খরচ পড়িবার সম্ভাবনা আর তাহা হইলে সে অধিক মাত্রায় চাউল প্রস্তুত করিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বিক্রয়ার্থে চাউল প্রস্তুত করিতে প্রত্যেক সের চাউলে কত কত খরচ পড়িবে আর ভিন্ন ভিন্ন দরে কত কত চাউল বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা সে এই দুই বিষয় বিবেচনা করিবে; তাহার পর কোন্ দরে চাউল বিক্রয় করিলে সমুদয়ে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকলাভ হইবে তাহা স্থির করিয়া সেই দরে যত চাউল বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা তত চাউল প্রস্তুত করিবে। এক সের চাউলের মূল্য হইতে উহা প্রস্তুত করার খরচ বিয়োগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, ঐ একসের চাউল বিক্রয়ে তাহাই লাভ ইহা প্রায় সকলেই জানেন; কিন্তু সমুদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকলাভ এই যে কথাটী ব্যবহার করা হইয়াছে ইহার অর্থ

স্পষ্ট করিয়া বলিলে বোধ হয় বাক্যবাহুল্য হইবে না। চাউলের মূল্য অতিশয় অধিক হইতে পারে কিন্তু তাহা হইলে যে মাত্রায় চাউল বিক্রয় হইবে তাহা অল্প হওয়ার সম্ভাবনা আব চাউল অল্প মাত্রায় প্রস্তুত করিতে অধিক মাত্রায় প্রস্তুত করার অপেক্ষা প্রত্যেক সেরে অধিক খরচ পড়িতে পারে; সুতরাং এদিকে প্রত্যেক সেরের অধিক মূল্য হইতে অধিক খরচ বিয়োগ দিতে হইবে আবার ওদিকে চাউলের চাহিদা অল্প হওয়ায় সমুদয় লাভ অর্থাৎ (প্রত্যেক সেরের মূল্য—প্রত্যেক সের প্রস্তুত করার খরচ) চাহিদার মাত্রা অধিক না হইতেও পারে। কিন্তু চাউলের মূল্য যদি অল্প হয়, তবে চাউলের চাহিদা অধিক হওয়ার সম্ভাবনা আর চাউলের খরচও অপেক্ষাকৃত অল্প হইতে পারে, সুতরাং অল্প মূল্যে চাউল বিক্রয় করিয়া যে সমুদয় লাভ হইবে তাহা অধিক মূল্যে চাউল বিক্রয় করিয়া সমুদয় লাভের অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তির চাউল প্রস্তুত ও বিক্রয় করার একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি দেখিবে কোন্ মূল্যে চাউল বিক্রয় করিলে তাহার সমুদয় লাভ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে আর ঐ মূল্যে যে মাত্রায় চাউল বিক্রয় হইতে পারে সেই মাত্রায় চাউল প্রস্তুত করিবে; সুতরাং কাহারও একচেটিয়া ক্ষমতা থাকিলে সে ব্যক্তি কোন বিশেষ মূল্য স্থির করিয়া তাহার উপযোগী আমদানির রাশির সমান রাশিতে সামগ্রী আমদানি করিবে। কিন্তু চাউল প্রস্তুত ও বিক্রয় করার ক্ষমতা কাহারও যদি একচেটিয়া না থাকে, তবে বাজারে চাউলের যত আমদানি হইয়াছে তাহা হইতে মূল্য স্থির হইবে; যে মূল্যে বিক্রয় করিলে চাউলের আমদানি ক্রেতৃবর্গের চাউলের চাহিদার সমান হইবে অর্থাৎ যে মূল্যে বিক্রয় করিলে চাউলের যত ক্রেতা আছে তাহারা সকলেই ঐ মূল্যে যত যত চাউল চাহে তত তত চাউল পাইবে আর যত চাউল বিক্রয়ার্থে আমদানি হইয়াছে তাহার সমুদয়ই বিক্রয় হইবে সেই মূল্যেই চাউল বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা। উহার অপেক্ষা অধিক মূল্য হইলে হয়ত সমুদয় চাউল বিক্রয় হইবে না, উহার অপেক্ষা কম মূল্য হইলে এই কম মূল্যের উপযোগী চাহিদা চাউলের আমদানির অপেক্ষা অধিক হইতে পারে আর বিক্রেতাগণ তখন চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিবে। সুতরাং এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে চাউলের মূল্য উহার আমদানি ও চাহিদার উপর নির্ভর করে, যে মূল্যে চাউলের চাহিদা উহার আমদানির সমান হইবে সেই মূল্যেই চাউল বিক্রয় হইবে।

চাউলের মূল্য যে নিয়মে নির্দ্ধারিত হয়, অন্যান্য সামগ্রীর মূল্যও সেই নিয়মে নির্দ্ধারিত হয়, অর্থাৎ যে মূল্যে কোন সামগ্রীর চাহিদা উহার আমদানির সমান হইবে সেই মূল্যে সে সামগ্রী বিক্রয় হইবে। তবে ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রীগুলির মধ্যে আমদানির সুবিধাসাপেক্ষত্ব পক্ষে বিভেদ আছে, কোন কোন সামগ্রী (যেমন হীরা, মণি, ইত্যাদি) অনেক দিন ঘরে রাখা যা-

হইতে পারে আর যত দিন বিক্রেতাগণ উহাদিগের নিমিত্ত তাহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী চাহিদা দেখিতে না পায় তত দিন ঐ সকল সামগ্রী তাহারা একেবারেই বিক্রয় না করিতে পারে অথবা অল্প মাত্রায় বিক্রয় করিতে পারে। আবার কোন কোন সামগ্রী (যেমন চাউল, ডাউল, লবণ, ঘোড়া, ইত্যাদি) প্রথমোক্ত সামগ্রীগুলির ন্যায় অতি অধিক কাল রাখা না যাইতে পারিলেও কিছু কাল মজুদ্ রাখা যাইতে পারে, বিক্রেতাগণ তাহাদিগের সুবিধানুযায়ী চাহিদা দেখিয়া ঐ সকল জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে। তৃতীয় আর এক শ্রেণীর সামগ্রী আছে (যেমন মাছ, দই, লুচি ইত্যাদি)—এই সকল সামগ্রী কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়িতে পারে; বিক্রেতাগণ ইচ্ছানুযায়ী চাহিদা দেখিতে না পাইলেও এই সকল সামগ্রী বিক্রয় করিতে পারে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে চাউল যত অধিক প্রস্তুত করা যায় প্রত্যেক সের চাউলে তত অল্প খরচ পড়িবার সম্ভাবনা; এই কথাটী চাউলের পক্ষে কি অন্য কোন কৃষিজাত কি খনি কিম্বা জল হইতে সংগৃহীত সামগ্রীর পক্ষে যত প্রয়োগ হইতে পারে শিল্প জাত সামগ্রীর পক্ষে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রয়োগ হইতে পারে। শিল্প কার্য্যে শ্রমবিভাগের অধিক সম্ভাবনা, আর সেই নিমিত্ত শিল্প কার্য্যে যন্ত্র দ্বারা কার্য্য করারও অধিক সুবিধা, আর তাহা হইলে সামগ্রী প্রস্তুত করার খরচ ও কমিবার সম্ভাবনা।

আমরা ব্যাঙ্কিং নামক প্রবন্ধে আর এই প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি আর এইরূপ প্রকৃতির অন্য কোন প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিতে পারি, সে সকল কথা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে হয়ত স্থলে স্থলে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। বিজ্ঞানে কোন বিষয় আলোচনা করিতে হইলে তাহার আনুষঙ্গিক কতকগুলি ব্যাপার ছাড়িয়া দিতে হয়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময় এই গুলির প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়। যেমন আমরা উপরে বলিয়াছি যে কাহারও একচেটিয়া ক্ষমতা থাকিলে মূল্য হইতে আমদানি স্থির হয়, ইহাতে এমনও হয়ত মনে করা যাইতে পারে যে এই ব্যক্তি যত উচ্চ লাভ পাওয়া সম্ভব মনে করে তত উচ্চ লাভ পাইতে চেষ্টা করিবে; বস্তুতঃ এই ব্যক্তি অতি উচ্চ লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহার অপেক্ষা কম লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, কারণ সে ব্যক্তি দেখিতে পাইতে পারে যে অত্যন্ত অধিক লাভ করিলে তাহার আপাততঃ লাভ হইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে সমাজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিএস্‌সি।

লীলা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনেক রকম।

স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা বাঙ্গালীর ঘরে যেমন এমন আর কোথাও হয় কি, বালক আর বালিকা, দুই জনের হৃদয় কেমন একটু একটু করিয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হঠাৎ চক্ষু মিলন হইলেই দুজনেই মহা লজ্জায় পড়ে। দুয়ারের আড়ালে, থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া বালিকা স্ত্রী বালক স্বামীর দিকে চাহিয়া থাকে। জানালার একটি পাখী তুলিয়া একদৃষ্টে সতৃষ্ণনয়নে স্বামীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে। আবার পশ্চাতে স্বামীর পদশব্দ শুনিলে লজ্জিত হইয়া পলাইয়া যায়। সেইটুক মেয়ের কোথা হইতে এত লজ্জা আসে কেন যে এত লজ্জা তা জানি না। মনে মনে দুজনে কত কি ভাবে তাহারাই জানে। একবার কবে নিদ্রিতাবস্থায় করে কর স্পর্শ হইয়াছিল দুজনে তাহাই মনে করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আর একদিন কেশে কেশে মিশিয়াছিল কপোলে উষ্ণ নিশ্বাস লাগিয়াছিল কেবল তাহাই মনে পড়ে। আর একদিন নিদ্রাভঙ্গের পর চারিচক্ষে মিলন হইয়াছিল। সে লজ্জার কথা মনে করিলেই কপোল রক্তবর্ণ হইয়া ওঠে। সখীদিগের সঙ্গে খেলার মধ্যে সেই অনিন্দিত মুখখানি মনে পড়ে। কাণের কাছে রাজ্যের লোকে দিবানিশি বলিতেছে, তোর বরের মুখ তেমন ধারাল নয়। চোক দুটী ছোট ছোট, নাক একটু চাপা, ঠোঁট পুরু। বালিকা ভাবিয়া দেখে, কোথাও দোষ দেখিতে পায় না। সব সুন্দর; যতই সে মুখ আর সেমূর্ত্তি মানসচক্ষে দেখে ততই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীর যতরূপ সব যেন স্বামীর শরীরে। আর সে স্বামী বই পড়িতে গিয়া কেবল সেই মুখখানি দেখিতে পায়। পাতায় পাতায় যেন সেই মুখের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পায়। শয়ন করিয়া ভাবে সে তাহার পাশে শুইয়া আছে। ভাবে তেমন রূপ ত্রিজগতে আর নাই। সেই রূপের ছবি ভাবিতে সে আর কোথাও রূপ দেখিতে পায় না।

কিরণের দিন দিন কত নূতন নূতন সুখ দুঃখ হইতে আরম্ভ হইল, তাহা গণিয়া উঠিতে পারা যায় না। সমবয়সী মেয়েরা কেবল শ্বশুরবাড়ীর, নিজের নিজের বরের আর কিরণের বরের গল্প করে। যে দিন সুরেশচন্দ্র শ্বশুরালয়ে যান, সে দিন কিরণের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। সমবয়সীরা মিলিয়া তাহাকে কালাপালা করিয়া তোলে।

সুরেশচন্দ্র আসিয়াছেন শুনিলেই তাহার বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া ওঠে। ঠাকুর দেবতাদের মানায়, না এলেই ভাল। তাহা হইলে কেহ তাহাকে এমন করিয়া বিরক্ত করে না। আবার ভাবে আজ রাত্রে কি বলিব, কি বলিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিব? এই ভাবিতে সেই মুখখানি, সে মুখের কথাগুলি মনে পড়ে, আর—আর কি মনে পড়ে? আর ত কেহ নাই, তবু কিরণের এত লজ্জা কেন? কিরণ মনে করিতেছে,—মনে করিতে মুখ লাল হইয়া উঠিল,—মনে করিতেছে, তিনি আগে কথা কহিবেন না হাত দুটি ধরিয়া মুখের পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া থাকিবেন? যদি আগে কথা না কন, তাহা হইলে কিরণ যাহা মনে করিয়াছে, তাহা আর কিছুই বলিতে পারিবে না। শেষ কিরণ রাগ করিয়া ভাবিত, "মানুষের বিয়ে হয় তাই জানি। আবার এ আসাযাওয়া কেন? তিনি কেন সেখানে থাকুন না আমি মার কাছে থাকি।" অমনি সেই মুখ, আর সেই মুখের কথা, আর সেই মধুর দৃষ্টি, একেকটী করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলিত।

এখন, কিরণ দিন দিন ডাগর হইয়া উঠিতেছে। বিয়ের জল পড়িলে মেয়েরা দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া ওঠে। যাহাকে এক বৎসর পূর্ব্বে কোলে করিয়াছ, এখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে লজ্জা করে। কিরণের কাজে কাজেই বাহির বাড়ীতে যাওয়া হয় না। কালে ভদ্রে কখন পূজার দালানে বাহির হইয়া একবার উঁকি মারিয়াই আবার বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া পালায়। কখন কখন ঝিকে সঙ্গে করিয়া দালানের থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া ফেরিওয়ালার জিনিস পত্র দেখিয়া পসন্দ করে। সাবানটা, চিরুনীটা, হয়ত একটা খোঁপার জাল, একগজ মাথার ফিতা, কাঁটা, হয়ত দুটি কাঁচের পুতুল কিনিল। একদিন ধরিল বড় বড় বিলাতী মুক্তার একছড়া মালা কিনিবে। ফেরিওয়ালা চাচা দেখিলেন, সুবিধা মন্দ নয়। এমন দাঁও কদাচ মেলে। তিনি হাঁকিলেন, এক টাকার এক পয়সাও কম হইবে না।

ঝি বলিল, "মর্ মিন্সে। বাঙ্গাল পেলি না কি? অমন এক ছড়া মালা ছ গণ্ডা পয়সা ফেল্‌লে যেখানে সেখানে মেলে।"

চাচা রাগিয়া বলিল, "দর জান না, দর কর কেন? ছ গণ্ডায় এমন মালা পাওয়া যায় ত আমি দুশো ছড়া এখনি কিনি।"

ঝি বলিল, "ও কথা সবাই বলে। যা, তোর মালা চাইনে। একছড়া বিলিতি মুক্তার মালা বই ত নয়, দিদিমণি, আমায় তুমি পয়সা দিও আমি আজই তোমায় কিনে এনে দেব এখন।"

এবার চাচা কিরণকে ধরিল। কহিল, "দেখ দিদিমণি, এমন মালা যদি তোমার ঝি আনতে পারে ত আমি যত বলি সব মিথ্যা। এমন জিনিসের এখন আর আমদানী নেই। আমার কাছে বিশ ছড়া ছিল, তার উনিশ ছড়া বেচেছি আর এই এক

ছড়া আছে। তা না নেও, ত আমি যাই। এখনি আর এক বাড়ীতে নেবে এখন।"

কিরণ কহিল, "মা তুমি নেওনা। আমি ঐ মালা ছড়াটা নেব। তুমি ঠিক দাম বল।"

ঝি বড় রাগিয়া বলিল, "দরওয়ানকে বলি মিন্সেরে তাড়িয়া দিতে! ছেলে মানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিচ্চে। আ গেল যা দেড়ে মিন্সে!"

চাচা দাসীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "তা দিদিমণি, তোমার যখন এত ইচ্ছে, তখন আমি কেনা দামেই তোমাকে মালা ছড়া ছাড়িয়া দিব। দেখ, দশ আনা দিও। আমার এক পয়সাও লাভ হবে না। তা হোক, তুমি ছেলে মানুষ তুমি নাও। কোন পাজি তোমায় ঠকাচ্চে। যে মিথ্যা চলে সে হারাম খায়।"

কিরণ 'পাজি' কথাটা বুঝিল, 'হারাম' বুঝিতে পারিল না। ভাবিল একটা ভারি দিব্য হবে।

চাচা হারছড়া কিরণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। কিরণ হাত বাড়াইয়া মালা লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া গেল। দাসী বকিতে বকিতে তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

কিরণ মাকে মালাছড়া দেখাইয়া কহিল, "মা আমি এইটে নেব।'

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দাম বলে?"

কিরণ। দশ আনা। তার কম সে দেবে না। সে কত দিব্য করলে।

মা। দশ আনায় যে ভারি ঠকা হবে, মা।

কিরণ। তা হোক। আমি ওটা নেব। তুমি মা তাকে ফিরে দিও না।

মা ভাবিলেন, আর কদিনই বা বাছা আমার কাছে আছে। আহা ওর যদি নিতে এত ইচ্ছে গিয়েচে, ত কিনিয়া দিই। মুখে বলিলেন,

"এস মা, আমি দাম দিইগে। কিন্তু এমন করে দাম না জেনে আর কিছু সামগ্রী কিনো না। এখন তুমি বড় হচ্চ, এখন থেকে পয়সা কড়িতে মায়া না হলে কি আর এর পর হবে?"

এই বলিয়া দশ আনা পয়সা ঝির হাতে গনিয়া দিলেন।

আমি দেখিতেছি আমার একটা মস্ত দোষ ঘটিতেছে। বলিতেছি বেশ একটা কথা, আবার তখনি আর একটা কথা পাড়িয়া বসি। কিরণ এখন আর বাহির বাড়ীতে যাইতে পায় না, সেই কথা বলিতেছিলাম। সুতরাং কিরণ সন্ধ্যার সময় অপর মেয়ে ছেলের সঙ্গে ছাদে বেড়ায়। সেই সময় পাড়ার দু চারিটী সমবয়সী আসিয়া জোটে। হয়ত এক দিন কিরণ এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় সম্বাদ আসিল, কিরণের বর এয়েচে। অমনি একজন কিরণের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, "কিরণ, আয় তোর বরকে দেখ্‌বি আয়।"

কিরণ হাত ছাড়াইয়া কহিল, "পোড়াদশা আর কি! আমি কেন দেখতে গে-

লাম? তোর এত সাধ হয়ে থাকে তুই দেখ্‌গে যা।"

আর একজন ধরিল, "কিরণ তোর বর তোকে ডাক্‌চে ভাই।"

কিরণ। দূর, তোকে ডাক্‌চে। ওই শুনেচিস্‌, কার নাম ধরে ডাক্‌চে। যা, যা, ছুটে যা!

যে কিরণের হাত ধরিয়াছিল, সে বলিল, "ওলো, তোর বর যে তোকে উঁকি মেরে দেখ্‌চে।"

কিরণ। আমায় বৈ কি! আমিত আর তোর মত সুন্দরী নই, যে আমাকে দেখ্‌বে। যা, তুই একবার তোর রূপ দেখিয়ে আয়।

"অত ঠাট্টা কেন? তুই না হয় সুন্দরী আছিস্‌। তা, বিধাতা ত সবাইকে সমান গড়ে না। তা বলে অমন করে বল্‌তে নেই।"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "রাগিস্‌ কেন ভাই। আপনার বেলা বুঝি আঁটিসুটি। আমায় সকলে মিলে পাগল করে তুল্লেন, আর যাই আমি একটি কথা বলেচি অমনি মেয়ের রাগ হল। তা এমনি কলি বটে।"

তখন আর একজন আসিয়া কিরণের কাণে কাণে বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই কিরণ, তুই না কি সে দিন তোর বরের গলা জড়িয়ে ধরেছিলি?"

কিরণ ঘোর রোষে তাহাকে এক মর্ম্মান্তিক চিম্‌টি কাটিল। কহিল, "মর্‌ তুই। যত সব বিট্‌কেল কথা। মরণ তোমার।"

কিরণকে ছাড়িয়া তাহারা জামাইবাবুকে ধরিল। বৈঠকখানায় থাকিলে তেমন সুবিধা হয় না, এজন্য জামাইবাবু আর এক ঘরে নীত হইলেন। সেখানে চারি পাঁচজন সুন্দরী মিলিয়া তাঁহার উপর বচন বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সুরেশচন্দ্র সেই খরতর শরজালে আচ্ছন্ন হইলেন। অভিমন্যু সপ্তরথী মধ্যে পড়িলেন।

প্রথম সুন্দরী কহিলেন, "কি গো সুরেশবাবু ভাল আছ ত?"

দ্বিতীয় কহিলেন, "এখন যে আর বড় একটা এদিকে দেখ্‌তে পাইনে। ডুমুর ফুলটী হয়েচ না কি?"

তৃতীয়। তুমি না কি বড় সুন্দর ছড়া বাঁধ্‌তে পার? একটী ছড়া বল না, শুনি।

চতুর্থ। বলি, কিরণকে তোমার পচন্দ হয় ত?

সুরেশচন্দ্র নির্ভীক চিত্ত। এইরূপ বিবিধ প্রহরণেও কাতর হইলেন না, স্থির রহিলেন। কহিলেন, "কার কথায় উত্তর দিই?"

প্রথম সুন্দরী। সকলের কথার উত্তর দাও।

সুরেশচন্দ্র। আমার একটী বই দুটী মুখ নয়। তা, সে মুখটীও তোমাদের রূপে আর তোমাদের কথায় বোবা হয়ে যাবার মত হয়েচে। আমি চার কথার উত্তর একেবারে কেমন করিয়া দিব?

প্রথম সুন্দরী। তা না পার্‌লে ত এত ইংরেজি পড়ে, পাস করে কি হল? আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আমাদের কথার আর উত্তর দিতে পার্‌বে না?

দ্বিতীয়। বাঃ তবে নাকি জামাই তামাসা জানে না?

তৃতীয়। কিরণের যে বেশ বর হয়েচে। আচ্ছা, বল দেখি কিরণ কেমন মেয়ে?

চতুর্থ। হাঁ গা, সুরেশবাবু, তুমি না কি বড় গুণ্‌তে?

সুরেশচন্দ্র এতক্ষণ অস্ত্রপ্রহার সহ্য করিতেছিলেন। এইবার তিনি প্রতিপ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন,

"তোমরা অনেক কথা বল্‌লে। এইবার আমার গোটাকতক কথা শোন। আমি জ্যোতিষ শিখিয়াছি। বল ত তোমাদের মনের কথা বলি।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, বল দেখি।"

সুরেশচন্দ্র প্রথম সুন্দরীকে কহিলেন, "তুমি কাল রাত্রে তোমার বরের সঙ্গে কোঁদল করিয়াছ। সত্য বল।"

সুন্দরী অমনি বলিলেন, "ও কি কথা! অমন করলে আমি এখানে থাকব না, আমি তবে উঠে যাই।"

সুরেশচন্দ্র আর একজনকে বলিলেন, "তোমার বর তোমায় বলেচে এক শিশি অটো ডি রোজ কিনে দেবে।"

তিনি বড় ফাঁপরে পড়িয়া কহিলেন, "মিথ্যা কথা! আমায় যে দিব্য করতে বল, আমি কর্‌চি। সব মিথ্যা।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "তাও কি কখন হয়? আমার গণনায় ভুল হইবার যো নাই। তুমি ঠিক বল।"

বেগতিক দেখিয়া সুন্দরীরা এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "তবে আমরা যাই। অমনতর কথা বল্‌লে আমরা এখনি চলে যাব।"

সুরেশচন্দ্রেরই জিত। তিনি সহাস্যে কহিলেন, "না কাহারও যাইবার আবশ্যক নাই। এস, আমরা এখন তামাসা ছেড়ে অন্য কথা কই।

তখন শান্তি হইল।

আহারাদির পর সুরেশচন্দ্র শয়নাগারে গমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মেঘ।

সহরের ভিতর থাকিলে স্বভাবের শোভা তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। বড় বড় বাড়ী, বড় বড় গাড়ী, বড় রাস্তা এ সব অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মাঠ, দীঘি, গাছ পালা, বন জঙ্গল দেখা যায় না। সহরের সম্মুখে হরিপাদপদ্মবাহিনী পুণ্য সলিলা গঙ্গা দেবীর বিচিত্র নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই। যে স্রোতের মুখে বলদর্পিত ঐরাবত তৃণ তুল্য ভাসিয়া গিয়াছিল, সে স্রোত আজ বাঁধা পড়িয়াছে। গঙ্গার বুকের উপর সেতু ভাসিতেছে, কূল ইঁটের গাঁথনিতে বাঁধা রহিয়াছে। বর্ষার সময় দুই কূল উদ্বেলিত করিয়া, পাড় ভাঙ্গিয়া, গ্রাম ডুবাইয়া, ঘোর জল ভঙ্গ রবে, রাজধানীর সম্মুখে ছুটিবার সাধ্য নাই। ইংরাজের দ্বারে অগ্নি বরুণ বাঁধা, কোন দিন চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু লৌহশৃঙ্খলে রাজদ্বারে বদ্ধ হইবেন।

কলিকাতার বড় মানুষ মাত্রেই সহরের

বাহিরে একটী করিয়া বাগানবাড়ী রাখেন। বাগানের শোভা দেখাই যে উদ্দেশ্য, তা নয়। বাগান বাড়ী কেন করে তাহা সকলেই জানে।

আমাদের বাগানে যে কি কাজ, তা আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি না। পাহাড় পর্ব্বত, বন উপবন, নদ নদী, হ্রদ সরোবর এ সকলের বর্ণনা ভাল ভাল পুস্তকে পড়িতে বেশ লাগে। কিন্তু দেখিয়া যে কি সুখ, তা আমি কোন মতেই বুঝিতে পারি না। দশ বিশ টাকা রোজগার করিলাম, সংসার পালিলাম, সময় সময় থিয়েটর, ঘোড়ার নাচ দেখিলাম, ইহাতেই কি মন ওঠে না? আবার অন্য দেশ দেখিতে যাওয়া, গাছ পালা দেখিতে যাওয়া কেন? এই কলিকাতার নিকটেই আলিপুরের চিড়িয়াখানা আর শিবপুরের কোম্পানীর বাগান রহিয়াছে। এ দুটীর মধ্যে কোনটী দেখিতে ভাল? চিড়িয়াখানায় কত রকম জানোয়ার, একবার দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা করে। আর কোম্পানীর বাগান— আ ছিঃ কেবল গাছ, গাছ, গাছ। তাও যদি দুট চারটে ফলের গাছ থাকে তা হলেও বুঝি। বাগান করিতে হয়, আম, লিচু, গোলাপজাম, আনারসের বাগান কর, যাহাতে কাজ দেখিবে। শিবপুরের বাগানে লোকে গিয়া ভারি ঠকে। আমি একবার দেখিতে গিয়াই নাকে খত দিয়া আসিয়াছি। যে দিকে তাকাও সারি সারি গাছ। সাগু গাছের সারি এমন এক পোয়া পথ। আবার এক দিকে দোধার তাল গাছের সারি। এক এক জায়গায় বড় বড় ঝোপ, এক দিকে গাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় মিশিয়া অন্ধকার করিয়া রহিয়াছে। এ সকল দেখিয়া কি হইবে?

তুমি যেন বুঝিলে, আমিও যেন বুঝিলাম। কিন্তু সকলে তা বুঝে কই, এমন লোক আছে যাহারা গাছ পালা দেখিবার তরে পাগল, যাহারা আকাশের দিকে চাহিয়া কত সুখ পায়। সারাবেলা চাহিয়া চাহিয়া মেঘ দেখে। আমি জানি মেঘ কেবল ছোট ছোট ছেলেরাই দেখে। বুঝি তাই বলে যে ছোট ছেলেদের মত আর কবি নাই। সুরেশচন্দ্র কাহারও কথা না শুনিয়া হয়ত মেঘের দিকে চাহিয়াই আছেন। অন্যমনস্ক হইয়া অনিমেষ চক্ষে মেঘ দেখিতে দেখিতে হয়ত সে দিন আর পড়া হইল না। সুরেশচন্দ্র বন্ধুদিগকে বলিতেন, "তোমরা আর কিছু না দেখ, আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিও। মেঘের অনন্ত চিত্রপট দেখিও। রাত্রিকালে নক্ষত্র দেখিও। তাহা হইলে মন ভাল থাকিবে। যে আকাশের দিকে চায় না, সে মানুষ নয়, সে পশু।"

গণেশচন্দ্র একথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বলেছ ভাল, কবিকঙ্কণ। তবে তোমার যে কল্পনাশক্তি, তাহাতে কিছু বেশি উপরে উঠিয়াছ। আকাশ দেখিতে হইলে কি মেঘ পর্য্যন্ত চোক তুলিতে হইবে, না দোতালার বারাণ্ডা পর্য্যন্ত তুলিলেই হইবে?"

সুরেশচন্দ্র বিদ্রূপ শুনিলে হাসিতেন,

আবার মেঘ দেখিতে বসিতেন। এক দিন এই রকম একটা মেঘের বর্ণনা লিখিয়াছিলেন :—

"প্রভাত সূর্য্যের কিরণে সুবর্ণময় মেঘের ছটা, কোথাও মেঘমালা ভেদ করিয়া কিরণ কিরীটী দেখা যাইতেছে। পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে একে একে মেঘখণ্ড ভাসিয়া চলিয়াছে। সে স্বর্ণজ্যোতি দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে মধ্যাহ্ন হইলে আবার কত রকম চিত্র অঙ্কিত হয়। কৃষ্ণ মেঘখণ্ড, তাহার চতুষ্পার্শ্বে অতি শুভ্র রজত রেখা। কখনও আকাশ নির্ম্মল, কোথাও কিছু নাই, কেবল অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ শুভ্র মেঘখণ্ড দিশাহারা তরণীর মত ঘুরিতেছে। আবার প্রকাণ্ড তুষারশুভ্র পর্ব্বত চূড়া, হিমালয়ের নীহারমণ্ডিত শৃঙ্গ নিচয়কে ব্যঙ্গ করিতেছে। আশুমুক্ত খনিজ রজতরাশির তুল্য স্থানে স্থানে রজতের স্তূপ। স্তূপের উপর স্তূপ। কখনও মেঘমধ্যে অতি ভয়ানক অরুণসঙ্কাশ যোগীমূর্ত্তি। মস্তকে ভীষণ জটাজূট, ললাটে ত্রিবলী অঙ্কিত, রক্তবস্ত্র পরিহিত, হস্তে কমণ্ডলু শোভিতেছে। কোথাও তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, কল্লোলিত সমুদ্রতুল্য তরঙ্গায়িত ; তরঙ্গ-মুখে শুভ্র ফেণকুসুম ফুটিতেছে। পশ্চিমে অতি মনোহর সৌধ শ্রেণী, দ্বিতল, ত্রিতল, ষষ্ঠতল প্রাসাদরাজি। নানাবর্ণে রঞ্জিত, দীপমালায় পরিশোভিত। পূর্ব্বদিকে বিশাল বনস্পতি ভূষিত নিবিড় অরণ্য। শাখা হইতে শাখান্তরে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ভয়ঙ্কর অজগর সর্প কুণ্ডলী পাকাইয়া ফিরিতেছে। উত্তরে রজত প্রাচীর পরিবৃত অন্ধকার কূপ। কোথাও মেঘনির্ম্মুক্ত শত শত সূর্য্য ঝলসিতেছে। সধূম সপ্তশিখ-বহ্নি জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক আকাশ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। আবার দেখ, অতি বিশাল মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। তাহাতে বালুকার তরঙ্গ উঠিয়াছে! ঝটিকাবসানে নদীর বালুকাসৈকতে যেরূপ সোপান চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, কোথাও বা সেইরূপ রহিয়াছে। তরঙ্গ সোপানের পর সোপান, এইরূপ দীর্ঘ সোপানাবলী বিস্তৃত রহিয়াছে। এদিকে শুভ্র কুজ্ঝটিকা, অপর দিকে জলপূর্ণ, ধূমময়, ধীরগতি জলদরাশি। গোধূলীকালে পশ্চিমাকাশে স্বর্ণস্রোত ছুটিতেছে। আর তাহার নীচে হইতে অন্ধকার বদন ব্যাদান করিয়া নিঃশব্দ পদক্ষেপে সেই রূপরাশি গ্রাস করিবার জন্য ধীরে অগ্রসর হইতেছে। চকিতের মধ্যে সব ফুরাইল। কালমেঘে সব ঢাকিল। স্বর্ণ রজতবর্ণ, ইন্দ্রচাপধারী মেঘের হাস্যময় মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। সেই মনোহর, নয়নরঞ্জনকারী ইন্দ্রধনু হইতে শর ছুটিল—বিদ্যুৎ! সে ধনুকের টঙ্কার বজ্র নির্ঘোষে হৃদয় কম্পিত করিয়া শব্দিত, প্রতিশব্দিত, পুনঃ শব্দিত হইতে লাগিল।"

গণেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে সুরেশচন্দ্রের কবিতা অধিকাংশই অপহৃত। আমি তাঁহার কথায় কিছুমাত্র সন্দেহ করি না। আর নীরদা একদিন চুরী ধরিয়া দিয়াছিল। সুরেশচন্দ্র তাহার কাছে স্বীকার করিয়াছিলেন। অপরের সাক্ষাতে অস্বীকার

করিতেন। যে চুরী করে সে সহজে তাহা স্বীকার করে না।

কিন্তু আমার এক একবার সন্দেহ হয় যে তিনি মেঘ হইতেই অধিকাংশ কবিতা চুরী করিতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আড়িপাতা—প্রাচীনা ও নবীনা।

আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে নবীনা ও প্রাচীনা। এ দুইজনকে লইয়া সর্ব্বদা তুলনায় সমালোচন চলিয়া থাকে। নবীনাদের অখ্যাতি এবং প্রাচীনাদের সুখ্যাতি করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ বিষয়ে আমার বিস্তর আপত্তি আছে। পুরুষে স্ত্রী চরিত্র মীমাংসা করিবার কে? পুরুষ রমণীর কবে কি বুঝিয়াছে যে তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে? আর প্রাচীনার সুখ্যাতি করিলে কি লাভ? ঠাকুরুণদিদির ডাল্‌নার, অম্বলের সুখ্যাতি কর, তাঁহার তৈয়ারি করা আমের আচারের সুখ্যাতি কর, তিনি বেশ বুঝিতে পারিবেন। অন্য রকম সুখ্যাতি করিয়া দুই দিস্তা কাগজ পুরাইলে তিনি কি বুঝিবেন? তুমি সাদা কাগজের উপর কালো কালো মাথামুণ্ড কি আঁচড় কাট, তাহা কি তিনি কখন পড়িবেন, না বুঝিবেন? আর এখনকার শিক্ষিতা, নভেলপড়া নবীনার কোন সাহসে নিন্দা কর? সে দিন কোন কাগজে নবীনার নিন্দা করিয়াছিল, অমনি একজন নবীনা এমনি এক উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, যে নবীন মহাশয়েরা পড়িয়া ব্যতিব্যস্ত হইলেন। বাহিরের গালি খাইয়া কি পেট পূরে না, যে আবার ঘরের লোককে ঘাঁটাইয়া গালি খাও। আমি প্রাণান্তেও কখন নবীনাদের নিন্দা করি না! হয়ত এইমাত্র বলি যে ঠাকরুণদিদি মরিলে সরিষা ফোড়ন দিয়া এমন সুন্দর অম্বল, আর এই উপাদেয় মোচার ঘণ্ট কে রাঁধিবে? কোন কোন নবীনা মাছ মাংস খুব ভাল রাঁধিতে শিখিয়াছেন বটে, কিন্তু, হায়, এমন সুক্ত প্রাচীনা ছাড়া আর কে রাঁধিতে জানে?

অন্য দিকে যতই অসাদৃশ্য হউক, আড়ি পাতিতে দুইজনেই সমান। সুরেশচন্দ্র শশুরবাড়ী গেলে, বুড়ী যুবতী সকলেই আড়ি পাতিতেন। নবীনা ও প্রাচীনা উভয়েই আড়ি পাতিতে ভাল বাসেন; সত্য বলিলে ধর্ম্ম তুষ্ট হন,—বোধ করি যুবতীরা আড়ি পাতিতে আরও অধিক ভাল বাসেন। আড়ি পাতাকে কেহই ভাল বলে না, কিন্তু আড়ি পাতিতে কেহ ছাড়েও না। আড়ি পাতা পদ্ধতি কেমন করিয়া আরম্ভ হইল? আমি এ বিষয়ে একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছি।

আড়ি পাতা বাল্যবিবাহের একটী ফল। আমার বোধ হয় আড়ি পাতা প্রথমে তেমন দোষের ছিল না। প্রেম যেমন স্বার্থপর, এমন আর কেহ নয়। স্বামীতে স্ত্রীতে প্রেম,—আর কেহ তাহার কিছুই জানিতে পারে না। দুজনে যা কথাবার্ত্তা কয়, অপর লোকে তার একটা কথাও শুনিতে পায় না। ভালবাসার একটা গুণ আছে, যে দেখে তারও মনে একটু আহ্লাদ হয়,

কিন্তু যুবক যুবতীর ভালবাসা আর কাহারও চোক সহিতে পারে না। দুজনে আপনাকে লইয়া এমনি মজিয়া থাকে যে তাহারা আর কাহারও দিকে ফিরিয়া চায় না, আর কাহাকেও কাছে আসিতে দেয় না। কিন্তু বালক বালিকার তা হয় না। তাহারা প্রণয়ের স্বার্থপরতা জানে না, কোমলতা মাত্র জানে। তাহাদের ভালবাসায় অন্য লোকে ভাগ বসাইলে কিছু ক্ষতি হয় না। যাহারা আড়ি পাতে তাহারা মনে করে আমরাও এককালে এমনি সরল ছিলাম। বুড়ীরা কত পুরাতন কথা মনে করে, যুবতীরাও নিশ্বাস ফেলিয়া মনে করে যে আমাদের আর সে দিন নাই। কিন্তু এখন আর তেমন বাল্যবিবাহ হয় না। আড়িপাতাও যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই ভাল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ফুল ধরে।

কিরণ বাড়িতে লাগিল। বার বছর উত্তরাইয়া তেরোয় পড়িল। সুরেশচন্দ্র খুব ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ী আসেন না বটে, কিন্তু প্রেমের আঁটাআঁটি হইতে কতক্ষণ? প্রেমের কল্পতরু পল্লবিত, মুকুলিত, কুসুমিত হইতে লাগিল। বৃক্ষের মূল দুই জনের হৃদয় মধ্যে।

এ দম্পতীর প্রণয় যে খুব নূতন রকম হইল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সে সব অর্থহীন আদরের কোটি কোটি কথা, সে অনেক ক্ষণ ধরিয়া চোখোচোখি, সে হাত ধরাধরি করিয়া মুখ চাওয়াচায়ি, সে অভিমান, সে মধুর লাঞ্ছনা, সে সব ঠিক সেই রকম আর কখন হয় নাই, ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিরণ প্রথম প্রথম ভারি গোলে পড়িয়াছিল। পাড়ার সব যুবতীরা মিলিয়া তাহাকে প্রণয়ের পাঠশালায় অনেক শিক্ষা দিয়াছিলেন। "তোর বরের সঙ্গে এমনি করিয়া কথা কহিবি, এমনি করিয়া বরের মন রাখিবি, এমনি করিয়া মান করিবি, আবার একটু, একটু, একটু করিয়া,এমনি করিয়া,এমনি করিয়া সে মান ভাঙ্গিবে।" যদি কিরণ এই শিক্ষামত কাজ করিত, তাহা হইলে আমি বিনা ওজরে স্বীকার করিতাম যে সে নূতনতর কিছুই করে নাই। কিন্তু গোড়াগুড়িই বড় বিভ্রাট হইয়াছিল। কিরণ যাহা শিখিয়াছিল, সব উলট পালট গোলমাল হইয়া গেল। শিক্ষার সঙ্গে কিছুই মেলে না। না তেমন কথা কহা হয়, না তেমন মন রাখা হয়, না তেমন অভিমান করা হয়। সব নূতন। কিরণ পাঠাভ্যাস ছাড়িয়া দিয়া আপনি যেমন পারিল, তেমনি ভাল বাসিতে শিখিল। কাজেই তাহাদের ভালবাসা বড় নূতন রকম হইল।

কিরণ আর তত চঞ্চল নাই। সংসারের কাজ কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রায় কোন কাজ ভাল করিয়া করিতে পারে না, না পারিলে হাসিয়া ফেলে। ঠাকুরমা রাগ করিতেন, কখন কিরণকে, কখন কিরণের মাকে বকিতেন। কিরণের মা কিরণের কোন অকর্ম্ম দেখিয়া হাসিলে,

ঠাকুরমা বলিতেন, "ও কি বউমা, ছেলে-পুলেকে অত আদর দেওয়া ভাল নয়। অকর্ম্ম কোর্‌লে কোথায় তুমি শাসাবে, না তুমি আরও হাস্‌চ? কিরণ যদি ছেলে হত তা হলে অমন আদর সাজত। মেয়ের কি অমন আদর কোর্‌তে আছে? আদুরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে যখন গৃহস্থের কাজ কোর্‌তে পারবে না তখন নিন্দা হবে কার, তোমার না আমার?" কিন্তু ঠাকুরমা যাই বলুন, কিরণের উপর আমার কিছুতে রাগ হয় না। এমন হাসি হাসি সোনার মুখ-খানি দেখিয়া কি তার উপর রাগ করা যায় গা? না যে মেয়ে দুদিন পরে পরের ঘরে যাবে তাকে মন্দ কথা বলা যায়?

তোমরা কিরণকে সুন্দরী বল আর নাই বল, আমি তাহাকে সুন্দর দেখি। আর সুরেশচন্দ্র যে তাহাকে কত সুন্দর দেখিতেন তা বলা যায় না। কিরণ আগের চেয়ে শান্ত হইয়াছে। রূপ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেশ থক্‌থকে গড়ন, রং আ-গের চেয়েও সুন্দর। চোখের চাহনি স্থির, শান্ত, একটুখানি আলস্য মাখা। সুরেশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন চক্ষের তারা কটা নয়।

আমার মনে মনে বড় ইচ্ছা ছিল যে কিরণের বিদ্যাশিক্ষার ও সূচী শিল্পের প্রশংসা করিব। কিন্তু কিরণ, অসেয়ানা মেয়ে, আমার সে সাধে বাদ সাধি-য়াছে। কিরণ যে বই পড়িতে একে-বারে নারাজ, তা নয়। গল্পের বই পাইলে পড়িতে ভাল বাসে, কিন্তু আর কোন কেতাব হাতে করিলেই তাহার হাই ওঠে, চোক যেন বুজিয়া আসে। সূচের কাজ চলনসই এক রকম শিখিয়াছিল, কা-র্পেট, জুতা, গলাবন্দ বুনিতে পারিত বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম কাজে তেমন পাকা হইয়া উঠিতে পারে নাই। একবার একখানা ছাঁটা ফুলের আসন বুনিতে গিয়া কাঁচি দিয়া পশম কাটিবার সময় বড় হাসাইয়াছিল। দুটা ফুল সমান কাটিতে পারে নাই। একটা উঁচু, একটা নীচু করিয়া ফেলিল,—দেখিলে বোধ হয় যেন কাকে ঠোকরাইয়া রাখি-য়াছে। সে আসনখানা সেই অবধি কিরণ যে কোথায় একটা কাপড়ের সিন্দুকের কোণে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা কেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই।

একদিন রাত্রে সুরেশচন্দ্র দুই হাতে কিরণের মুখ ধরিয়া, অনেকক্ষণ তাহার মুখ দেখিয়া কহিলেন, "কিরণ, তুমি যে আরও সুন্দর হচ্চ।"

কিরণ কহিল, "যাও, তামাসা কোর্‌তে হবে না," এই বলিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

একটু পরে সুরেশচন্দ্র ধীরে ধীরে কহি-লেন, "কিরণ, আমি কি ভাবি জান?"

কিরণ মুখ তুলিয়া, স্বামীর মুখে চোক রাখিয়া কহিল, "কি?"

সুরেশচন্দ্র। আমি ভাবি যে আমার সঙ্গে বিয়ে না হলে তুমি সুখে থাক্‌তে পার্‌তে। আমি কি কখনো তোমায় তেমন আদর যত্ন কোর্‌তে পারব?

কিরণ রাগ করিয়া সরিয়া বসিল। বলিল, "কি কথাই শিখেছেন! রাগ ধরে।

আমি তোমার ছাই ছাই কথা শুন্‌তে চাইনে।"

সুরেশচন্দ্র একটী ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তুমি যদি রাগ কর তা হলে না হয় আর বল্‌ব না। আর আমার কাছে আস্‌বে না?"

নিশ্বাসটী পড়িল, কিরণ শুনিতে পাইল। দেখিল স্বামীর মুখে বিষাদের চিহ্ন। আর কি রাগ থাকে? কিরণ আস্তে আস্তে স্বামীর কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া, স্বামীর একটী হাত তুলিয়া লইয়া আপনার গালের উপর রাখিল। মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বড় কোমল স্বরে কহিল, "তুমি কি ভাব্‌চ, আমায় বল না।"

কিরণ ত এই টুকু মেয়ে কিন্তু সে ইহারই মধ্যে স্বামীর দুঃখের ভাগ চায়। যে দুঃখের ভাগী নয় সে কেন সুখের ভাগী হইতে চায়?

সুরেশচন্দ্র কিরণকে আরও কাছে টানিয়া লইলেন। কহিলেন, "আমি কোন দুঃখের কথা মনে করি নি। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার এখানে ভাল লাগে না পাড়া গাঁয়ে ভাল লাগে?"

কিরণ স্বামীর মুখে তাড়াতাড়ি হাত দিয়া কহিল, "রক্ষা কর! পাড়াগাঁয়ের আর নাম কোরো না। এইখানে বেশ। পাড়াগাঁয়ে না কি আবার মানুষ থাকে! মাঠের মাঝখানে একলাটি,—মাগো!"

সুরেশচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "মাঠের মাঝখানে ভয় কিসের? এখানে কেবল গলি ঘুঁজি, ভাল কোরে নিশ্বাস ফেল্‌বার যো নেই। পাড়াগাঁয়ে বেশ ফাঁকা কোন বালাই নেই। পাড়াগাঁ মন্দ হল কিসে?"

কিরণ। না, বড় ভাল। কেবল চারিদিকে গাছ আর অন্ধকার আর শেয়াল। সন্ধের সময় পুকুরে কাপড় কাচ্‌তে যাও, পথে কেবল বাঁশ ঝাড়। ঘোরঘোরের সময় বাড়ী ফিরে আস্‌তে হয়ত একটা বাঁশ নুয়ে ঘাড়ে পড়ল,—সে কথায় কাজ নেইক মনে কর্‌লে কেমন গা শিউরে ওঠে!

সুরেশচন্দ্র। আমি যদি তোমায় পাড়াগাঁয়ে নিয়ে যাই।

কিরণ। তা হলে যাব। আর কোন দিন ভূতে ঘাড় মুচ্‌ড়ে খাবে। তোমার ত তা হলে বেশ হয়, আর একটী সুন্দর দেখে বিয়ে কর্‌বে।

সুরেশচন্দ্র। আমি বুঝি রাগ কর্‌তে জানিনে? এখন থেকেই বুঝি মন্দ কথা বল্‌তে শিখ্‌চ?

কিরণ হাসিতে লাগিল।

সুরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরণ, তুমি কি ভূত আছে, বিশ্বাস কর?"

কিরণ বলিল, "তা করি আর না করি, লোকে ত বলে।"

তারপর খানিকক্ষণ আর কোন কথা হইল না। কিছু পরে সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "বড় গরম বোধ হচ্চে, জানালার একটা পাকি খুলে দাওত।"

কিরণ ছল ধরিয়া ভারি হাসিয়া উঠিল। কহিল, "জানালা আবার কোন দেশী কথা? আমাদের কেউ জানালা বলে না।"

সুরেশচন্দ্র। তবে কি বলে?

কিরণ। জান্‌লা বলে।

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "তোমাদের দেশী সব কথা জানে এমন একটী বর তোমার জুটিলে বেশ হইত। আমি একটী খুঁজ্‌ব না কি?"

কিরণ কোন কথা না কহিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যায় দেখিয়া, সুরেশচন্দ্র তাহার হাত ধরিলেন। কহিলেন, "আগে ঠাট্টা কর কেন?"

এ রকম যে কতবার হইত তা আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও গণিয়া উঠিতে পারি নাই। কিরণ কথায় কথায় ছল ধরিত। ছল ধরাধরি,রাগারাগির পালা পড়িয়াছিল। খুব ভালবাসা না হইলে ধাঁ করিয়া ছল ধরা যায় না। ছোট ছোট মেয়েগুলি কিছু বেশি ছল ধরে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভালবাসার কিছু বেশি ছড়াছড়ি। একটু বড় হইলে আর তত সহজে ছল ধরে না। যে তোমার কথায় ছল ধরে, সে তোমায় ভাল বাসে।

দশম পরিচ্ছেদ।

নূতন মানুষ।

এই সময় কিরণের একটী নূতন সঙ্গিনী জুটিল। মেয়েটীর নাম লীলাবতী। কিরণের বয়স তের বছর, লীলাবতীর সতের। কিন্তু এমন দু চার বছরের ছোট বড় হইলে কিছু আসিয়া যায় না। এ দুই জনে খুব ভাব হইল।

অলৌকিক রূপের বর্ণনা অনেক পড়িতে পাওয়া যায়। সুন্দরী রমণীর এমন ছবি দেখিতে পাওয়া যায় যে মনে হয় এমন রূপ পৃথিবীতে নাই। কিন্তু কোন সময় স্বচক্ষে এমন রূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে রূপের কল্পিত আদর্শ অপেক্ষা অধিক সুন্দর বোধ হয়। সে রূপ একবার দেখিলে আর ভোলা যায় না। যখন তখন, চলিতে ফিরিতে, সুখের সময়, দুঃখের সময় কেবল সেই রূপের ছবি মনে পড়ে।

বোধ করি লীলাবতীর রূপ সেই রকম।

এমন রূপ ত আমি কোথাও দেখি নাই। কিন্তু এ রূপ না দেখিলে আমি ভাল থাকিতাম। রূপ ত আনন্দের জন্য হইয়াছিল, তবে এ রূপ দেখিয়া চক্ষে জল আসে কেন? এমন চন্দন কাঠের পুত্তলিতে কোথায় ঘূণ ধরিয়াছে? এত রূপে এত বড় খুঁত কোথায়? এ রূপ ত পূর্ণ নয়, একটা কিছু গুরুতর অভাব আছে। এমন রূপ পূর্ণ নয় কেন?

লীলাবতী বিধবা।

লীলাবতীর বয়স যখন চৌদ্দ বছর তখন সে বিধবা হয়। এখন তাহার বয়স সতের বছর। সে এই তিন বছর বিধবা হইয়াছে।

দেখ, তোমরা একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখ! সে দিন সে রূপে আলো করিয়া, অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া কত আহ্লাদে বেড়াইত। যখন এক ঘর বড় মানুষের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিল, তখন তাহার রূপের প্রশংসা কাহারও মুখে ধরে না। যাহারা কোথাও নির্দ্দোষ সুন্দরী দেখিতে পায় না, তাহারা সে রূপে মুগ্ধ

হইয়া বলিয়াছিল, "ঢের ঢের সুন্দরী দেখেছি বাপু, এমন রূপ কখনো দেখি নি " কেহ বলিয়াছিল, 'ইটি কাদের বউ গা? এত রূপ ত কোথাও দেখি নি! ঠিক যেন ছবি খানি! যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুণ!" সে কথা এখনো লীলার কাণে লাগিয়া আছে। এ সব যেন কালিকার কথা। আহা দেখ, দু হাতে দু গাছি বালা পরিত, আজও যেন হাতে তাহার দাগ রহিয়াছে! মাথায় যেখানে চিরুণী দিয়া সিতে কাটিয়া সিঁদুর পরিত, সে খানে দু চার গাছি চুল এখনো ওঠে নাই। ছোট পা দুখানিতে এখনো মলের কলঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। তিন বছর আগে সে সুন্দরী ছিল, এখন কি আর তেমন সুন্দরী নাই? হাত দুখানি শুধু, তবু যেন কত গহনা পরাইয়া রাখিয়াছে। এমন হাতে যদি সোনা দানা না উঠিল, এমন অঙ্গে যদি মণি মুক্তা না উঠিল ত গহনা কেন হইয়াছিল? আহা, লীলা এমন শান্ত মেয়ে, সে কখন কাহাকে ভুলিয়াও মন্দ বলে নাই, ঝি চাকরদের কখন তুমি বই তুই বলে নাই। কি অপরাধে, কোন পাপে, এই বয়সে তাহার কপাল পুড়িল? তাহার কোন সাধ মেটে নাই, কোন আশা পুরে নাই, কোন দুঃখ ঘুচে নাই, তবে সে কেন এই বয়সে চিরবিধবা হইল? বিধাতা কেন তাহাকে এত রূপ দিয়া গড়িল, কেনই বা তাহার ললাটে অনন্ত যন্ত্রণাময় চিরবৈধব্য লিখিল? লীলা অশান্ত নয়, দেখিয়া শুনিয়া, সব মাটী মাড়াইয়া হাঁটে, সে কেন এমন অন্ধকূপে পতিত হইল? সে দিন হাঁটিবার সময় পায়ে ঝম্ ঝম্ করিয়া মল বাজিত, আজও সে এক এক সময় চমকিয়া উঠিয়া ভাবে, আমার পায় মল নাই কেন? অমনি সব মনে পড়ে। আগে সে যেখানে যাইত, পাড়া শুদ্ধ স্ত্রীলোকে তাহাকে দেখিতে আসিত, এখন তাহাকে দেখিয়া তাহারা সরিয়া যায়। কেহ একবার আহা বলে, কেহ একটী নিশ্বাস ত্যাগ করে, তাহার পর অন্যদিকে চলিয়া যায়। দু দিন আগে সে যেন চন্দন মাখিয়া বসিয়াছিল, সেই সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া লোক জড় হইত। এখন যেন সে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়াছে, এজন্য কেহ তাহার নিকটে আসে না। আগে পাড়ায় কোথাও বিবাহ হইলে, তাহাকে এয়ো বলিয়া সকলের আগে ডাকিতে আসিত। এখন সধবাদের সঙ্গে থাকিলে লোকে ভাবে তাহাদের অমঙ্গল হইবে। যে শাশুড়ী বউমা বলিতে অজ্ঞান, তিনি এখন ডাইনি, পোড়াকপালী, সর্ব্বনাশী, আরও কত কথা তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলেন। বল দেখি, লীলার কি অপরাধ? কপালে যাহা ছিল তাহা ত হইয়াছে, তাহার উপর আবার এ গঞ্জনা কেন? নূতন নূতন একাদশী করিতে যে কি কষ্ট, তাহা বলিবার নয়। সকাল বেলা লীলা মুখ না ধুইতে শাশুড়ী খাবার হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতেন,—"বউ মা, জল খাবে এস।" আর যখন বৈশাখ মাসের রৌদ্রের সময় অনাহারে, পিপাসায় পাগল হইয়া সেই সোনার পুত্তলি মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, তখন কেহ তাহার গায়ে একবার হাত বুলা-

ইয়া দিল না, কেহ একবার সেই ধূলিধূসরিত অশ্রুবিগলিত করুণ মুখখানি আপনার আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিল না। লীলা যখন মাটী হইতে মুখ তুলিয়া, ভাঙ্গা গলায় বলিল, "আমার প্রাণ যায়। তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেল। এক ফোঁটা জল খেতে না দাও, আমার হাতে মুখে একটু জল দাও। ওগো, তোমাদের সকলের পায়ে পড়ি, আমায় বাঁচাও," সে সময় কেহ একবার তাহার ঘরে উঁকি মারিল না। কেবল একটা দাসী তাহার দুঃখে কাতর হইয়া কাছে বসিয়া দুটা সান্ত্বনা বাক্য বলিয়াছিল। তাহার পর নির্জ্জলা একাদশীর কষ্টও ক্রমে সহিয়া গেল। প্রথম প্রথম লীলা লুকাইয়া লুকাইয়া কত কাঁদিত। রাত্রি হইলে তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিত না, চক্ষের জলে কাপড়, বালিশ সব ভাসিয়া যাইত। যুবতীরা যেখানে জড় হইয়া চুপি চুপি গান করিত, লীলা সেখানে যাইত না। সে কখনো কাহারও কাছে দুঃখ করিত না, কাহারও কাছে আপনার অদৃষ্টের নিন্দা করিত না। সে যে বড় বুদ্ধিমতী, সে একেবারেই বুঝিল যে তাহার দুঃখ আর কেহ বুঝিবে না, আর কেহ বুঝিতে পারিবে না। পরের কাছে কাঁদিলে কি হইবে? তাহার দুঃখ ত এ জন্মে আর ঘুচিবে না। সংসারে যত সুখ আছে সব সুখের দুয়ারে কাঁটা পড়িয়াছে।

বিধবা হইয়া লীলা শ্বশুর বাড়ীই রহিল। সে আগে ঘরের লক্ষ্মী ছিল, এখন যেন ঘরের অলক্ষ্মী হইয়া উঠিল। সকলে হতশ্রদ্ধা করে, খোঁটা দেয়, প্রায় দূর ছাই করে। লীলা কখন একদিনের তরেও মুখ তুলিয়া একটী কথা বলে নাই। যার সব ফুরাইয়াছে, তার এ টুকু অধিক দুঃখে কি হইবে?

লীলার পিতা নাই। মাতা দুঃখী। তিনি লোকের মুখে লীলার যন্ত্রণা শুনিতে পাইলেন। লীলা তাঁহাকে নিজে কখন কিছু লিখিত না, চিঠি লিখিলেই লিখিত, ভাল আছি। কন্যার কষ্ট শুনিয়া মার প্রাণ স্থির রহিবে কেন? তিনি লীলাকে একবার দেখিবেন বলিয়া আনাইলেন, কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে তাহাকে আর শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবেন না। লীলা মার কাছে রহিল।

এইরূপে দুই আড়াই বছর গেল। তাহার পর লীলার মাতার মৃত্যু হইল। লীলার দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। একবার ভাবিল, শ্বশুরবাড়ী সংবাদ পাঠাই। আবার ভাবিল, আমি সেখানে গেলে তাঁহারা ত সন্তুষ্ট হবেন না। লীলা চক্ষের জল মুছিল। মাতার মৃত্যু হইলে সে বড় কাঁদে নাই। দুঃখে দুঃখে তাহার হৃদয় কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। একবার ভাবিল, আমিও কেন মরি না? আবার ভাবিল, আর কি বাকি আছে? খেতে না পাই, ভিক্ষা করব। তা না পাই, উপোস করব।

শ্বশুর বাড়ী হইতে লীলাকে লইতে আসিল না। কিরণের মা গ্রাম সম্পর্কে লীলার মাসী। তিনি সব শুনিতে পাইলেন। তৎ-

ক্ষণাৎ পাল্কী, বেহারা, ঝি, দরওয়ান পাঠাইয়া দিলেন। লীলার বাপের বাড়ী কলিকাতা হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ। লীলা কলিকাতায় আসিল। কিরণের মা তাহাকে কন্যার অধিক যত্ন করিতে লাগিলেন। মাতার মৃত্যুর পর লীলা আর কাঁদিত না, পিতৃ গৃহ শুষ্ক চক্ষে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কিরণের মার যত্ন ও স্নেহ দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "বিধবাকে যে কেউ এমন যত্ন করে, তা আমি আগে জান্‌তাম না।"

লীলাকে দেখিয়া কিরণ ও একবার কাঁদিয়াছিল। তার পর লীলাকে দিদি বলিয়া ডাকিল, তাহাকে ভাল বাসিল। লীলাকে সকলে এত যত্ন করে দেখিয়া কিরণও তাহাকে সাধ্যমত যত্ন করিত। লীলার কিসে মন ভাল থাকে, কিরণের সেইটা মস্ত ভাবনা। লীলার মন ভাল থাকিবে বিবেচনা করিয়া সে তাহার কাছে আপনার সুখের কথা বলিত। স্বামীর ভালবাসা, দুই জনের অনুরাগ, স্বামীর সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা হইত, সব লীলাকে বলিত। যে সব বড় লুকান কথা, বড় ভালবাসার কথা, তাহাও বলিতে আরম্ভ করিল। কিরণের এত বুদ্ধি ছিল না যে সে সব তলাইয়া ভাবিবে। তাহার কথায় যে লীলার দুঃখ হইতে পারে, কিরণ তাহা কখন মনে করিত না। যে সব কথায় তাহার এত আহ্লাদ হয়, যে সব কথা সে দিনরাত মনে করে, তাহাতে যে আর কাহারও কিছু দুঃখ হইতে পারে, কিরণ স্বপ্নেও এরূপ মনে করিতে পারিত না। বাস্তবিক কিরণের সুখের কথা শুনিয়া লীলার মন অনেক ভাল থাকিত। কেবল একটা দোষ ঘটত। কিরণের স্বামীর কথা শুনিয়া লীলার নিজের স্বামীকে মনে পড়িত। যদি সে স্বামী ভাল হইত তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি ছিল না। কি পোড়া কপাল দেখ! তেমন দেববাঞ্ছিত স্ত্রীরত্ন পরিত্যাগ করিয়া লীলার স্বামী বারবিলাসিনীতে আসক্ত হইয়াছিল। লীলা স্বামীকে মনে পড়িলেই, ঘূর্ণিত রক্তচক্ষু, মুখে দুর্গন্ধ আর অশ্রাব্য কটু গালি, স্খলিতবসন, অস্থির গতি যুবককে চক্ষের সম্মুখে দেখিত। অত্যাচারে, অনিয়মে, অতিরিক্ত মদ্যপানে তাহার মৃত্যু হয়। কেবল মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার চৈতন্য হইয়াছিল। তখন লীলার সাক্ষাতে কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "তোমার মত স্ত্রীকে আমি এত দিন ফিরিয়া দেখি নাই। এখন এই বয়সে তোমায় পাথারে ভাসাইয়া চলিলাম। আমার নরকেও স্থান হইবে না।" লীলা সব ভুলিয়া গিয়াছিল, স্বামীর পা বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কত কাঁদিয়াছিল, কত ঠাকুর দেবতাদের মানাইয়াছিল। স্বামী যাই হউক, গেলে ত আর আসিবে না। কিন্তু যম লীলার মুখ চাহিল না, যাহাকে লইতে আসিয়াছিল, তাহাকে লইয়া গেল। লীলা আর সব ভুলিয়া স্বামীর সেই শেষ কয়টী কথা মনে করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু মনে পড়িলে সুখের কথা যেমন মনে পড়ে, দুঃখের কথা তার চেয়েও বেশী মনে পড়ে।

কিরণ অবুঝ মেয়ে। এক দিন লীলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "তোমার স্বামী কি তোমায় ভাল বাস্‌তেন?"

লীলা অনেকক্ষণ কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, "আগে বাস্‌তেন না।"

কিরণ কহিল, "সে কি! তোমার মত সুন্দরী, শান্ত স্ত্রীকে ভাল বাস্‌তেন না?"

লীলার চক্ষে জল পূরিয়া আসিতেছিল। বলিল, "তিনি শেষাশেষি আমায় ভাল বাস্‌তেন, কিন্তু সে ভালবাসা আমার অদৃষ্টে বেশি দিন ছিল না।"

কিরণ লীলার মুখ দেখিতেছিল। সে লীলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তুমি চক্ষের জল ফেল না, দিদি। আমি আর কখন তোমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করব না।"

লীলা চোক মুছিয়া একটু হাসিল। কহিল, "আমি ত কিছু মনে করি নি। তোমার যখন যা ইচ্ছা হবে তাই জিজ্ঞাসা কোরো।"

কিরণ সেই অবধি আর কখন লীলার স্বামীর কথা পাড়িত না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

লীলা।

লীলার বয়স সবে সতের বছর। জীবনের নিগ্রহ আরও কত দিন আছে, কে জানে? মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেমন করিয়া কাটিবে? কেমন করিয়া জীবনের দীর্ঘ রাত্রি পোহাইবে, এ অন্ধকারে কত কাল মরণের পথ চাহিয়া থাকিবে? কাহার মুখ চাহিয়া সে জীবনের ভার বহন করিবে? সবাই মরে কেবল পোড়া বিধবার মরণ নাই। তাহার বাঁচিয়া কোন সুখ নাই, মরণের কোলে শয়ন করিতে পারিলে তাহার প্রাণ জুড়ায়, কিন্তু যম তাহাকে ছোঁয় না, তাহার ছায়া মাড়ায় না। যে দিবানিশি মরণের পথ চাহিয়া থাকে, তাহার দ্বারে একবার ঘা মারে না। বাড়ীতে কঠিন পীড়া হইয়াছে, বাপ গেল, কার্ত্তিকের মত ভাই, স্বামীসোহাগিনী ভগিনী, কচি কাচা সব গেল, শূন্য ঘরে হাহাকার উঠিল, কেবল সেই হতভাগিনী বিধবা মরিল না। বিধবা হইলেই যেন অমর হয়। তাহার বাঁচিয়া কোন সুখ নাই, জীবনের সব বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সে যায় না। যাহারা চিরবৈধব্য বিধি করিয়াছিল, তাহারা কি মরণের সঙ্গেও কিছু পরামর্শ করিয়াছিল? যাহাকে মানুষে ঠেলিয়া রাখে তাহাকে কি যমও ডাকিয়া লয় না? যাহাকে মানুষে পরিত্যাগ করে, তাহাকে কি যমও পরিত্যাগ করে? আমোদে আহ্লাদে, কাজে কর্ম্মে বিধবার কোন অধিকার নাই, তবু তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। অন্য মানুষে, অন্য স্ত্রীলোকে যেমন বাঁচিয়া থাকে তেমনি থাকিতে হইবে, কিন্তু আর সব পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্যের শরীরে যেমন সুখ দুঃখ আছে, তাহারও ত তেমনি আছে। কিন্তু মনুষ্য জন্মের কোন সুখ তাহার কপালে ঘটে না। দেখ, সে

ধর্ম্ম কর্ম্ম জানে না, মনের দৃঢ়তা জানে না, তপস্যা সাধনা জানে না, ইন্দ্রিয় দমন করিতে তাহাকে কেহ কখন শিখায় নাই, সংসারের ভোগাভিলাষেই তাহার মন নিরত, এমন সময় তাহার মাথায় বাজ পড়িল। সংসারে থাকিয়া, সংসারের সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্যের মধ্যে থাকিয়া, সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া, তাহাকে সংসারের সব সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। সুশীতল জলে কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত রাখিয়া, মাথায় আগুন জ্বালিয়া পুড়িতে হইবে, জ্বালা নিবৃত্তির জন্য এক ফোঁটা জলের তরে হাত বাড়াইতে পারিবে না। কাল সে যে পানটী খাইত, আজ সেটী খাইতে নাই, কাল সে কালাপেড়ে বুলু দেওয়া যে কাপড়খানি পরিত আজ সেটী পরিতে নাই, কাল সে যেমন হাসিত আজ তেমন হাসিতে নাই, কাল যে গানটী গাহিত, আজ সেটী গাহিতে নাই, কাল যাহার সঙ্গে কথা কহিলে কেহ মন্দ মনে করিত না, আজ তাহার সহিত কথা কহিলে লোকে কাণাকাণি করে। কাল সারাদিন ছাদে বেড়াইয়াছিল, কেহ একবার তাহা লক্ষ্য করিয়াও দেখে নাই, আজ তাহার ছাদে উঠিয়া চুল শুকাইতে নাই। কাল সে যেখানে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল, আজ সেখানে যাইতে নাই। কাল যা ছিল আজ তা কিছু নাই, কিন্তু মানুষ ত সেই। তার মনে যে দুঃখ হইয়াছে, তাহার উপর আবার এত দুঃখ কেন?

কিরণ এক এক সময় ভাবিত লীলা এমন চোক করিয়া তাকায় কেন? তোমরা একবার লীলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ। এক এক সময় যেন তাহার চোকে আলো প্রবেশ করে না, এক এক সময় দৃষ্টি এত শূন্য, এত দুঃখপূর্ণ যে দেখিলে চক্ষের জল রাখা যায় না। লীলা যা দেখে তাই শূন্য, না তাহার প্রাণের ভিতর শূন্য হইয়াছে? বাহিরে ত চারিদিক এত হাসিখুসী, এত লোকে হাসিতেছে, খেলিতেছে, আমোদ আহ্লাদ করিতেছে, বাহিরে ত শূন্য নয়। কিন্তু এক এক সময় লীলা কিছুই দেখিতে পায় না। বাহিরে যাহা কিছু হইতেছে, লীলার চক্ষে যেন তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে না। আকাশের নীল রং যেন মিলাইয়া যায়, যেন উপরে কেবল একটা অন্ধকার প্রকাণ্ড গহ্বরের মত দেখা যায়। চারিদিক খাঁ খাঁ করে; যেন কোথাও কিছু নাই। লীলা মনে করে যে সে না থাকিলে জগতের কি ক্ষতি? তাহার দুঃখে আর কাহারও কি? পৃথিবীর ত চারিদিকে আনন্দ কোলাহল, সে কোথায় এক কোণে আপনার দুঃখ লইয়া পড়িয়া আছে, তাহা কে জানিবে? কেহ না জানুক, লীলা কোথাও কিছু সুখ দেখিতে পায় না। জগত আপনা হইতে আরম্ভ, আপনাতেই শেষ। যাহার চক্ষে জল আসে, সে আর কিছু দেখিতে পায় না, সব যেন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা বোধ হয়। যে দুঃখী সে ভাবে বুঝি সব দুঃখময়। লীলা জানিত যে তাহার দুঃখে আর কাহারও কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু সে আগে যেমন সব সুন্দর দেখিত, এখন আর তেমন

পারিত না। লীলা ভাবিত যে আমার যখন কিছু ভাল লাগে না, তখন আমি বাঁচিয়া আছি কেন? কিন্তু ইচ্ছা হইলেই মরণ আসে না। একটী একটী মানুষ একটী একটী জগৎ। ইহাতে স্বার্থপরতা কিছু মাত্র নাই। আমার কাছে পৃথিবী যে জিনিস, তোমার কাছে কি ঠিক তাই? কাল আমি মরিলে এ পৃথিবীর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক থাকিবে? আজ আমি দুঃখী তুমি সুখী, তোমার কাছে জগৎ আনন্দময়, আমার কাছে দুঃখময়। আমার জগৎ তুমি কেমন করিয়া পাইবে?

লীলা বড় দুঃখী, তোমরা একবার তার মুখের দিকে তাকাও। দেখ, সে একলাটী জগৎসংসারের একটী কোণে দাঁড়াইয়া আছে। তোমরা একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার জন্য এক ফোঁটা চক্ষের জল মুছিয়া ফেল!

সরসী জলে শশী।

কি দেখাও সরসি,
হৃদয়ে ধরেছ তুমি গগণের শশী?
আনন্দ লহরী মেখে
গরবে উঠিছ ফেঁপে
হাসিতেছ টিপি টিপি
সোহাগের হাসি!
ভাবিছ অমন চাঁদ
কার আছে আর,
সুধামুখে হাসি রাশি
করে সুধাধার।
হয়ো না সরসী তুমি
মত্ত অহঙ্কারে,
অই দেখ মাতৃ অঙ্কে
শিশু শোভাধরে।

তব চাঁদ-মুখে মসী
কলঙ্কের দাগ
মোদের চাঁদের মুখে
নব তামরাগ।

তব চাঁদ দিবা রাতি
ভাতি না বিকাশে,
আমাদের অঙ্কে চাঁদ
দিবানিশি হাসে।

শুধু সুধা, সরসী,
তোমার চাঁদে ঝরে,
আমাদের চাঁদে
সুধা হাসি, মধু রাশি
—আধ আধ স্বরে।

খেলিতে তোমার চাঁদ
না জানে সরনী,
নক্ষত্র বালিকা মাঝে
শুধু থাকে বসি।

পঙ্কজ ভগিনী সনে
নাহি করে খেলা,
মন-দুঃখে মুদে থাকে
সুকোমলা বালা।

খেলিতে মোদের চাঁদ
তব চাঁদ সনে,
ক্ষুদ্র দুই খানি কর
আন্দোলি সঘনে—

কচি কচি দন্তগুলি
বিকাশিয়া কুন্তকলি
মনের হরষে ভাসি-
আধো আধো ডাকে—

আয় চাঁদ, "আই আই"
ঘন ঘন দেয় "তাই"
ছিছি কেন গো তোমার
চাঁদ শুধু চেয়ে থাকে।

কবিতাহার রচয়িত্রী প্রণীত।

ন্যাশনল্ ফণ্ড্।

কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে "ন্যাশনল্ ফণ্ড্" নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তাহা অতি সুলিখিত হইলেও, আমার বিবেচনায়, সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমি তাই সে প্রবন্ধের যেহ যুক্তি ভ্রমাত্মক মনে করি তাহাদের ভ্রম দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে, "ন্যাশনল্" কথাটার যে মানে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাই আমার বিবেচনায় ভ্রমাত্মক ও অসম্পূর্ণ। প্রবন্ধ-লেখক বলেন, "ন্যাশনল্ বলিতে আমি ত এই বুঝি, সমস্ত নেশন যাহা করিতেছে, সমস্ত নেশনের ভিতর হইতে যাহা স্বতঃ উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে, যাহা না হইয়া থাকিতে পারে না, যাহাকে জোর করিয়া ন্যাশনল বলিবার আবশ্যকই হয় না; কারণ, তাহা ন্যাশনল নয় বলিয়া কাহার ও মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহ ও হয় না।" আদৌ, "সমস্ত নেশন" কোন দেশে কোন কালে কোন কিছু করে নাই; কখনো করিবে অথবা করিতে পারিবে, আমি বিশ্বাস করি না। "সমস্ত নেশন" বলিতে একটি নেশনের অন্তর্গত ও অন্তর্ভূত প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষকে বুঝায়—একটি 'অবলা'কে ছাড়িলেও সে নেশনের সমস্তকের

হানি হইল। তাই বলি, যদি 'ন্যাশনল' বলিতে কেবল তাহাই বুঝায় "সমস্ত নেশন যাহা করিতেছে, সমস্ত নেশনের ভিতর হইতে যাহা স্বতঃ উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে," তবে উহা ঘোড়ার ডিমের নামান্তর মাত্র, কেননা এ দুনিয়ায় খাওয়া শোওয়া ভিন্ন এমন কিছুই নাই "সমস্ত নেশন যাহা করিতেছে, ইত্যাদি।" প্রবন্ধ-লেখকের মানে বোধ হয় এই, একটি নেশনের অধিকাংশ লোক যাহা করিতেছে, যাহা লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে, অথবা, জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক, যাহার উদ্ভাবন করিতেছে, তাহাই ন্যাশনল। পৃথিবীতে এরূপও কোন কার্য্য আছে কি না যাহা একটি নেশনের অধিকাংশ লোক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কিংবা কৃত হয়, গভীর সন্দেহের বিষয়। কোন কার্য্যই যে কোন একটি নেশনের অধিকাংশ লোক কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয় নাই, অথবা হইবে না, এ কথা ত সাহস করিয়াই বলা যাইতে পারে; কেন না উদ্ভাবনী শক্তি লইয়া যে সে লোক জন্ম গ্রহণ করে না--পৃথিবীর যাঁহারা ক্ষণজন্মা পুরুষ তাঁহারাই সে শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান ও কার্য্য বহু লোক কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইলেও কোন একটি নেশনের অধিকাংশ লোক কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় কি না বলা সুকঠিন—হইলেও অতি কদাচিৎ। ইংলণ্ডের পিযুরিটন রিভোলিয়ুশনকে প্রবন্ধ-লেখকের যুক্তি অনুসারে ন্যাশনল বলা যাইতে পারে না, কেন না তাহা সমস্ত নেশন করে নাই, অথবা সমস্ত নেশনের ভিতর হইতে স্বতঃ উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে নাই। লক্ষ লক্ষ লোক রাজপক্ষে ছিল—রাজশক্তি, রাজশ্রী অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণ পণ করিয়াছিল,—তথাপি আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের যে কেহ ইতিহাস লিখিয়াছেন তিনিই উক্ত বিপ্লবকে ন্যাশনল আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং মানিতে হইবে যে প্রবন্ধ-লেখক ন্যাশনল কথাটার যে মানে করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। "যাহা না হইয়া থাকিতে পারে না" তাহা ন্যাশনল, এ কথাও মানিতে পারি না। যাহা কিছু হয় তাহাই না হইয়া থাকিতে পারে না। আজ কাল যে নব্য ভারত বহু কুবিষয়ে ও ইংরেজের অনুকরণ করেন, তাহাও না হইয়া থাকিতে পারে না – যে শিক্ষা নব্য ভারত পাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে ওরূপ অনুকরণ করিতেই হইবে; তাই কি সে অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে ন্যাশনল বলিবে? আর যদি বল তাহাতেও আমার বিশেষ আপত্তি নাই। আমি কেবল এই বলিতে চাই যে ন্যাশনল বলিতে কেবল সে কার্য্যই বুঝায় না যাহা "সমস্ত নেশন করিতেছে, অথবা যাহা সমস্ত নেশন হইতে স্বতঃ উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে।" ন্যাশনল বলিতে তাহাও বুঝায় যাহা একটি নেশনের বহু সংখ্যক লোক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ন্যাশনল কথাটার মানের একটা প্রধান অঙ্গ এখনও নির্দ্দেশ করা হয় নাই। কোন একটি নেশনের উদ্দেশে যাহা অনুষ্ঠিত বা উদ্ভাবিত হয় তাহাও ন্যাশনল—কোন একটি নেশনের উন্নতি-কল্পে যাহা কৃত হয় তাহাও

ন্যাশনল। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সমস্ত ভারতবাসী কর্ত্তৃক সংগঠিত নয়, তাই বলিয়া কি বলিব উহাকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নাম দেওয়া ভুল হইয়াছে? সমস্ত ভারতবাসীর জন্যে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই উহাকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নাম দেওয়া হইয়াছে, এবং সে নাম দেওয়াটা সে জন্যেই ভুল হয় নাই। ন্যাশনল কথাটার ব্যবহারও এই রকম। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে যদি ন্যাশনল এসোসিয়েশন নাম দেওয়া যাইত তাহা হইলেও ভুল হইত না, কেন না যদিও উক্ত সমিতিতে সমস্ত নেশন নাই, উহা সমস্ত নেশনের উন্নতিকল্পে সংস্থাপিত বলিয়াই ন্যাশনল নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন যে ফণ্ড্ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই কারণেই তাহাকে ন্যাশনল ফণ্ড্ নাম দেওয়াটা একটা বিশেষ অপরাধ হয় নাই। হইতে পারে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন যে যে উদ্দেশ্যে উক্ত ফণ্ড্ প্রয়োগ করিবেন কল্পনা করিয়াছেন, কাহারও কাহারও নিকট সে গুলি ঠিক ন্যাশনল বোধ হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া যতক্ষণ নেশনের উন্নতিকল্পে উক্ত ফণ্ড্ প্রয়োগ করা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সংকল্প ততক্ষণ উহাকে ন্যাশনল্ ফণ্ড্ বলা অযৌক্তিক নয়। এমন কোন উদ্দেশ্যই বোধ হয় হইতে পারে না যে বিষয়ে সমস্ত নেশন একমত হইবে। কেহ বলিবেন, রাজনৈতিক আন্দোলনেই ন্যাশনল ফণ্ডের অর্থ প্রধানতঃ ব্যয়িত হওয়া উচিত। কেহ বলিবেন, "এখনো ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় আসে নাই, শিল্পাদি আর অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে এখন ন্যাশনল ফণ্ডের প্রয়োগ হওয়া কর্ত্তব্য।" আর কেহ বলিবেন, "জনসাধারণ যতদিন শিক্ষিত না হইবে ততদিন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উন্নতি অসম্ভব, সুতরাং জনসাধারণের শিক্ষাকল্পেই ন্যাশনল ফণ্ড প্রযুক্ত হউক।" চতুর্থ এক ব্যক্তি বলিবেন, "নৈতিক উন্নতি ভিন্ন রাজনৈতিক উন্নতি হইতে পারে না—যাহাতে ভারতবাসীরা আত্মদ্রোহ ছাড়িয়া স্বদেশের, স্বজাতির হিতকল্পে আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদান করিতে শেখে, তাহারই জন্যে চেষ্টা করা উচিত, তাহারই উদ্দেশে ন্যাশনল ফণ্ড প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।" পঞ্চম ব্যক্তি বলিবেন, "যে দেশের সামাজিক রীতিনীতি এত দুষ্ট সে দেশে সর্ব্বাগ্রে সমাজ সংস্কার চাই—বাল্যবিবাহ প্রথা উঠাইয়া দাও, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রচলন কর, স্ত্রীজাতিকে বন্ধনমুক্ত কর, জনসাধারণের গৃহদ্বারে অহর্নিশি যে দুর্ভিক্ষ দাঁড়াইয়া তাহাকে বিদূরিত কর, পরে রাজনৈতিক উন্নতির কথা বলিও—সমাজ সংস্কার উদ্দেশে ন্যাশনল ফণ্ড প্রয়োগ কর।" ষষ্ঠ ব্যক্তি বলিবেন, "ধর্ম্মোন্নতি সকল উন্নতির মূল—দেশের লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দাও, তাহারা স্বার্থত্যাগী হইবে, দেশের জন্যে প্রাণপণ করিবে—ভারতের রাজনৈতিক উন্নতি-স্বপ্ন সফল হইবে—ধর্ম্মশিক্ষায় ন্যাশনল ফণ্ডের প্রয়োগ হউক।" প্রবন্ধলেখক ন্যাশনল

কথাটির যে মানে করিয়াছেন তাহা যদি ঠিক হয় তবে ন্যাশনল ফণ্ড নামে একটা পদার্থই হইতে পারে না, তবে ন্যাশনল কথাটাকে ইংরেজী অভিধান হইতে বহিষ্কৃত করিতে হয়, কেন না তাহা হইলে দুনিয়ায় ন্যাশনল বলিয়া একটা চিহ্নই হইতে পারে না। তাই বলি শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনে ফণ্ড প্রয়োগ করিবেন যদি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, তবু উঁহাকে ন্যাশনল ফণ্ড নাম দেওয়া অপরাধ হয় নাই—কেন না সে রাজনৈতিক আন্দোলন নেশনের উন্নতি কল্লেই হইবে।

তার পর প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন, "Political agitation জিনিষটাই ন্যাশনল নয়। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, ও কথাটা বোঝে খুব কম লোক, আবার যে দু চার জন লোক বোঝে তাহাদের মধ্যে সকলের ও কাজটার প্রতি বিশেষ অনুরাগ নাই, কথাটার মানে জানে এই পর্য্যন্ত।" এই কথাগুলির উত্তর উপরেই দেওয়া হইয়াছে। এখানে শুধু এই বলিব, খুব কম লোকে বোঝে বলিয়া Political agitation যদি ন্যাশনল না হইল, তবে অস্ত্রনির্ম্মাণাদি শিক্ষার জন্যে ভারতবাসীদিগকে আমেরিকায় পাঠান ও ন্যাশনল কাজ নয়, কেন-না উহা বোঝে খুব কম লোকে; বেদবেদান্ত ও ন্যাশনল নয়, কেন না উহা ও বোঝে খুব কম লোকে।

ন্যাশনল ফণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ-লেখকের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে উহার ভার যাঁহাদিগের হাতে তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা জানেন না, এবং ইংরেজী ভাষায় বাগ্মিতা প্রদর্শন উদ্দেশেই জীবন ধারণ করিতেছেন। প্রথম কথা, এ দোষারোপটি অন্যায়, কেন না ইহার মূলে বড় একটা সত্য নাই। দ্বিতীয় কথা, এ দোষারোপটি ন্যায়সঙ্গত হইলেও ইহা ন্যাশনল ফণ্ডের বিরুদ্ধে যুক্তিস্বরূপ দাঁড়াইতে পারে না। প্রথমতঃ এই দোষারোপের মূলে যে বড় একটা সত্য নাই তাহাই দেখাইব। কাহার উপর ন্যাশনল ফণ্ডের ভার? ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উপর—অথবা, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই ন্যাশনল ফণ্ড স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ভার কাহার উপর? ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার উপর। ঐ কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ন্যূনাধিক পঞ্চাশ জন সভ্যদ্বারা সংগঠিত—উহাতে কলিকাতার প্রায় সমস্ত সুপরিচিত ব্যক্তিই আছেন—অনেকগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যপ্রিয় ও সুবাঙ্গালালেখকও আছেন—আমি কেবল একটি লোকের নাম করিব, বাবু রাজনারায়ণ বসু—আমার যদ নিতান্ত স্মৃতিবিভ্রম না ঘটিয়া থাকে তবে উক্ত সভার সভ্যগণের নামের তালিকা খুঁজিলে ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মহাশয়ের নামও পাওয়া যাইবে। সুতরাং বাঙ্গালা জানেন না এমন কতগুলি লোকের উপর ন্যাশনল ফণ্ডের ভার, একথা ঠিক সত্যমূলক নহে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একজন প্রধান অধিনায়ক বক্তৃতাদি করিতে ইংরেজীতেই করিয়া থাকেন, এ

কথা আমি মানিয়া লইলাম। একজন না হয় ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলেন—দশজন যে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিতেছেন? প্রবন্ধ-লেখক বলিবেন, 'কৈ, আমি ত কখনো তাঁহাদিগের নাম শুনি নাই।" শুনিবেন কি করিয়া?—তাঁহারা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে, জনসাধারণের সমিতিতে বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতার কথা খবরের কাগজে ওঠে না—সে ত আর টৌনহলে শিক্ষিত সমাজে বক্তৃতা নয়। আমার একটি সুপরিচিত ব্যক্তি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হইয়া একবার আসামে ও ময়মনসিংহে গিয়াছিলেন—বাঙ্গালায় অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কতক টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ সর্ব্বদাই মফস্বলে যাইতেছেন—বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিতেছেন—বোধ হয় কখনো তাঁহারা ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন না। দেখা যাইতেছে এই সব বাঙ্গালা বক্তাদিগের নাম প্রবন্ধ-লেখক জানেন না—তাঁহারা ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলে জানিতেন। ইংরেজীতে যে কাজ না হয় তাহা যে শুধু ইংরেজেরা জানিতে পারেন না এমন নহে, দেশীয় লোকেরা ও অনেকে জানিতে পারেন না—সে কাজটি ও তাহার ইতিহাস তাহার ক্ষেত্রেই বদ্ধ থাকে। সুতরাং আর কোন উদ্দেশ্যে না হউক, কেবল কোন কাজ হইতেছে এই কথাটি দেশময় জানান আবশ্যক হইলে ও সময়ে সময়ে ইংরেজী বক্তৃতাদির দরকার। ন্যাশনল ফণ্ড বিষয়ে লিখিতে গিয়া প্রবন্ধ-লেখক ইংরেজী বক্তৃতার বিরুদ্ধে এতগুলি কথা বলিয়াছেন, তাঁহার ভাবিয়া দেখা উচিত, ইংরেজী বক্তৃতা দু একটা না হইলে তিনি ন্যাশনল ফণ্ডের বিষয় কখনো কিছু শুনিতেনই না। ইংরেজী বক্তৃতার আরও প্রয়োজন আছে। বাঙ্গালা কেবলমাত্র বাঙ্গালীর ভাষা, নেশনের ভাষা নহে। ইংরেজী ও নেশনের ভাষা নয়, সত্য; কিন্তু একটি ন্যাশনল ভাষার অভাবে ইংরেজীই তাহার স্থানে এখন ব্যবহর্ত্তব্য, কেননা সমস্ত নেশন ইংরেজী না বুঝিলেও সমস্ত নেশনের যাঁহারা নেতা, শিক্ষাদাতা বা প্রতিনিধি তাঁহারা ইংরেজী বোঝেন—আর তাঁহাদিগকে নেশন সম্পর্কীয় কোন বিষয় বুঝাইলেই সমস্ত নেশনকে তাহা বুঝাইবার পথ পরিষ্কৃত হইল—অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত নেশনকে বুঝাইবার এক মাত্র যে উপায় আছে তাহা অবলম্বিত হইল। প্রবন্ধ-লেখক বলেন, "গোড়াতে ইহার নামই হইয়াছে National fund, ইংরাজিতেই ইহার উদ্দেশ্য প্রচার হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত ইংরাজিতেই ইহার কাণ্ডকারখানা চলিতেছে।" ন্যাশনল ফণ্ড নাম না রাখিয়া যদি জাতীয় ধনভাণ্ডার নাম রাখা যাইত, আর উহার উদ্দেশ্য যদি ইংরাজিতে না লিখিয়া কেবল বাঙ্গালায় লেখা হইত, তবে কি উহা ন্যাশনল ফণ্ড না হইয়া বাঙ্গালী ফণ্ড হইত না? আমি একদিন লাহোরে সর্দ্দার দয়ালসিংহ মজিথীয়ার হস্তে একখানি ন্যাশনল ফণ্ডের বিজ্ঞাপনী বা উদ্দেশ্য-পত্রিকা দেখিয়াছিলাম—যদি বাঙ্গালা

ভাষায় লিখিত হইত তবে কি কখনো উহা আমি তাঁহার হাতে দেখিতে পাইতাম ? বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী মহারাষ্ট্রী, মান্দ্রাজী, দক্ষিণী, মধ্যভারতী, সকলেরই জন্যে ন্যাশনল ফণ্ড—কেবল বাঙ্গালায় লিখিলে ও বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিলে চলিবে কেন ? প্রথমে ইংরেজীতেই বলিতে ও লিখিতে হইবে—ইংরেজীতে বলিয়া, লিখিয়া যাঁহারা এ বিশাল ভারতে নেশনের নেতা ও শিক্ষাদাতা তাঁহাদিগের সহানুভূতি, সাহচর্য্য ও সহকারিতা লাভ করিতে পারিলেই নেশনের অর্দ্ধেক কাজ হইল ; তাঁহারা পরে আপন আপন প্রদেশে যাহাতে জন সাধারণ ন্যাশনল ফণ্ড বিষয়টা বুঝিতে পারে সে চেষ্টা দেখিবেন—অর্থাৎ পঞ্জাবে যাঁহারা শিক্ষিত ও স্বদেশবৎসল তাঁহারা পঞ্জাবী ভাষায় সে বিষয়ে বলিবেন ও লিখিবেন ; মহারাষ্ট্রে যাঁহারা শিক্ষিত ও স্বদেশবৎসল তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সে বিষয়ে বলিবেন ও লিখিবেন, মান্দ্রাজে যাঁহারা শিক্ষিত ও স্বদেশবৎসল তাঁহারা মান্দ্রাজী ভাষায় সে বিষয়ে বলিবেন ও লিখিবেন, ইত্যাদি। ঠিক ইহাই কি আমরা দেখিতে পাইতেছি না ? সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশনল ফণ্ড বিষয়ে কলিকাতায় ইংরেজীতে গোটা কতক বক্তৃতা করিয়াছেন, আর আনন্দমোহন বসু ইংরেজীতে লিখিত ন্যাশনল ফণ্ডের বিজ্ঞাপনী ভারতময় শিক্ষিত-সমাজে প্রচার করিয়াছেন, আর বাঙ্গালায়, হিন্দুস্থানে, পঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে মান্দ্রাজে, দাক্ষিণাত্যে, মধ্য ভারতে, সর্ব্বত্রই কি স্ব স্ব প্রদেশীয় ভাষায় ন্যাশনল ফণ্ড বিষয়ে স্ব স্ব প্রদেশীয় সংবাদ পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই ও হইতেছে না ? — সে ইংরেজী বক্তৃতা ও ইংরেজী বিজ্ঞাপনী কি এ মহাদেশে সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত আন্দোলনের সৃষ্টি করে নাই ? যদি বা যতটা চাই ততটা আন্দোলনের সৃষ্টি না করিয়া থাকে তাহা ইংরেজী বক্তৃতা অথবা ইংরেজি বিজ্ঞাপনীর দোষ নহে, সে দোষ শিক্ষিত জনসাধারণের। বর্ত্তমান সময়ে দেশময়, নেশনময় কোন আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে হইলে ইংরেজীতেই তাহার সূচনা করিতে হইবে, কেননা বাঙ্গালা কিংবা অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষায় সূচনা করিলে তাহা বাঙ্গালা কিংবা অন্য কোন প্রদেশেই আবদ্ধ থাকিবে। তাই বলিয়া আমি বলিতেছি না, আন্দোলন কেবল ইংরেজীতেই হইবে। না, বরং আমি বুঝি, প্রকৃত ন্যাশনল আন্দোলন ইংরেজীতে হইতেই পারে না। ইংরেজী বৈজাতিক ও বৈদেশিক ভাষা, তাহা দ্বারা ভারতে ন্যাশনল আন্দোলন হইবে কিরূপে ? আন্দোলন ভারতময় বিস্তৃত করিবার জন্যে সূচনা করিতে হইবে ইংরেজিতে, কিন্তু জনসাধারণের আন্দোলন করিতে হইলে তাহাকে প্রদেশীয় ভাষা-পরিচ্ছদ পরাইয়া প্রদেশে প্রদেশে পাঠাইতে হইবে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অনেকটা ইহাই করিতেছেন। কেননা একথা সত্য হইলে প্রবন্ধ-লেখকের কথা যে "আজ পর্য্যন্ত ইংরাজিতেই ইহার (ন্যাশনল ফণ্ডের) কাণ্ডকারখানা চলিতেছে,

ঠিক নহে, কেন না আমি দেখাইয়াছি, যদি ন্যাশনল ফণ্ড বিষয়ে পাঁচ ব্যক্তি ইংরেজিতে বক্তৃতা করিয়া থাকেন, পঁচিশ ব্যক্তি বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়াছেন—যদি ন্যাশনল ফণ্ড বিষয়ে পাঁচটি সভার কার্য্য ইংরেজিতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, পঁচিশটি সভার কার্য্য বাঙ্গালায় নির্ব্বাহিত হইয়াছে। আমার দ্বিতীয় কথা এই যে প্রবন্ধ-লেখকের অভিযোগ যদি সত্য হইত, অর্থাৎ যাঁহাদের উপর ন্যাশনল ফণ্ডের ভার তাঁহারা যদি বাঙ্গালা-অনভিজ্ঞ ও ইংরেজী বক্তৃতাগত-প্রাণ হইতেন, তথাপি ন্যাশনল ফণ্ডটা নিন্দনীয় বিষয় হইত না। ন্যাশনল-ফণ্ড সংস্থাপন উচিতই, উহা সংগ্রহের ভার ওরূপ লোকের হাতে ন্যস্ত থাকা অনুচিত হইতে পারে।

প্রবন্ধ-লেখক বলেন "মুখে বলা হইতেছে, peopleরাই আমাদের সহায়, peopleদের জন্যই আমরা এতটা করিতেছি, people-দের উপরেই আমাদের ভরসা! এসব ভাণ করিবার দরকার কি? * * * তাহাদের (peopleদের) হৃদয়ের সুখদুঃখ কোন খানে, কোন খানে ঘা পড়িলে তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে তাহা কি তোমরা জান, না, জানিতে কেয়ার কর?" ইহাও বেচারী ন্যাশানলফণ্ড-সংগ্রহকারী ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উপর অন্যায় অভিযোগ। খাজানার আইন সম্বন্ধে কি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন peopleদের পক্ষে বহু যত্ন ও চেষ্টা করেন নাই? সে যত্ন ও চেষ্টা করিয়া কি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন দেশীয় জমিদারগণের বিরাগভাজন হন নাই?

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অথবা ন্যাশনল ফণ্ড সংগ্রহ কর্ত্তারা আমাকে তাঁহাদিগের brief দেন নাই। তাঁহাদিগের বহুদোষ থাকিতে পারে, কিন্তু যে বিষয়ে নিরপরাধী সে বিষয়ে তাঁহারা অপরাধী সাব্যস্ত না হন, ইহাই আমি দেখিতে চাই।

এতক্ষণ ত প্রবন্ধ-লেখকের সহিত ঝগড়া করিলাম; কিন্তু সুখের বিষয় এই যে তাঁহার সহিত তাঁহার প্রবন্ধের মুখ্য কথা সম্বন্ধে আমার মতভেদ নাই। Political agitation-এ ন্যাশনল ফণ্ডের অর্থ প্রধানতঃ প্রয়োগ করিলে টাকাগুলি জলে যাইবে, আর দেশের বহু অনিষ্ট হইবে, এ কথা আমিও বলি। প্রবন্ধ-লেখক যথার্থ বলিয়াছেন, "তবে যদি কাজ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় ও অসমর্থ পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া ইহার গৌণ উদ্দেশ্য হয়, তবেই ইহার দ্বারা আমাদের দেশের স্থায়ী উন্নতি হইবে।" অসমর্থ পক্ষে Political agitation করা অর্থাৎ ভিক্ষা চাওয়া উচিত, একথা প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। একেবারে ভিক্ষা ভিন্ন এ সর্ব্বথা দরিদ্র জাতির চলিবে কিরূপে? ভিক্ষালব্ধ শক্তি বা ক্ষমতা দ্বারা যে কোন জাতির উদ্ধার হয় না, একথা ভারতবাসীর জানা কর্ত্তব্য; কিন্তু তবু আমাদিগকে সময়ে সময়ে ভিক্ষা করিতে হইবে, কেন না অন্যথা Gagging Act প্রভৃতি দ্বারা গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে এরূপ রসাতলে ফেলিবেন যে শেষে আমাদিগের তাহা হইতে উঠিবার শক্তি আর একেবারেই

থাকিবে না। মাছেরা যেমন জলগর্ভে আপন আপন কার্য্য করে, কেবল এক এক বার নিশ্বাস লইবার জন্যে উপরে ওঠে, আমাদেরও তেমনি এক একবার গবর্ণমেণ্টের নিকট বাঁচিয়া থাকিবার অনুমতির জন্য উপস্থিত হইতে হইবে, কিন্তু ন্যাশনল জীবনের যে কার্য্য তাহা সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টের অদৃশ্য থাকিয়া নীরবে খাটিতে হইবে। আসল কথা, আজও আমাদের Political agitation-এর সময় আসে নাই—আসিলে প্রবন্ধলেখকও সে কথার অর্থ ভিক্ষাবৃত্তি নির্দ্দেশ করিতেন না, আমিও সে অর্থ মানিয়া লইতাম না। Political agitation-এর জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে আমাদিগকে দীর্ঘকাল নিঃশব্দে কার্য্য করিতে হইবে—আমেরিকা ও য়ুরোপে পাঠাইয়া আমাদিগের যুবকদিগকে শিল্প বাণিজ্য, অস্ত্র শস্ত্র শিখাইতে হইবে; দেশের কাপড় দেশের কলে প্রস্তুত করিতে হইবে; দেশের জাহাজ, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ দেশের লোকদ্বারা চালাইতে হইবে; দেশের কামান বন্দুক তরবারি দেশের লোকদ্বারা নির্ম্মাণ করাইতে হইবে, ইত্যাদি। একাজগুলি যখন আমরা নিজেরা করিতে পারিব, তখন Political agitation-এর সময় আসিবে, তখন Political agitation আর ভিক্ষাবৃত্তি রহিবে না, তখন সহস্র ইংরেজ ও আট আনা ইয়ুর (Eight-anna Eu) জন্যে পঞ্চবিংশতি কোটি ভারতবাসীর স্বত্ব কোন গবর্ণমেণ্টই বলিদান করিতে সাহসী হইবেন না। ব্যাঘ্র যেমন চীৎকার পূর্ব্বক আহার্য্য জন্তুর উপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে নিঃশব্দে শক্তি সংগ্রহ করে, আমাদিগেরও তেমনি Political স্বত্ব বা অধিকারাদির উপর চীৎকার পূর্ব্বক লাফাইয়া পড়িবার আগে শক্তি উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করা আবশ্যক—নহিলে কেবল চীৎকারই সার হইবে, শীকার পলাইয়া যাইবে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কি এই শক্তি উপার্জ্জন ও সঞ্চয় চেষ্টায় ন্যাশনল ফণ্ড প্রয়োগ করিতে পারেন না? আর নাই বা পারিলেন—তাঁহারা না হয় Political agitation বা ভিক্ষা চাওয়ার কাজটাই করুন—প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই ত সময়ে সময়ে আমাদের ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া গবর্ণমেণ্টের দ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে। নূতন যে ইণ্ডিয়ান ইয়ুনিয়ন হইয়াছেন তাঁহারা কেন এই শক্তি উপার্জ্জন ও সঞ্চয় চেষ্টা করুন না। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা যাঁহার সভাপতি সে সভার অর্থাভাব হইতেই পারে না; চিন্তাশীল স্বদেশবৎসল লোকেরও ইণ্ডিয়ান ইয়ুনিয়নে অভাব নাই; ইহাতেও যদি কাজ না হয় ত সে আমাদের দুরদৃষ্ট।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

অন্যান্য গ্রহগণ জীবের নিবাস ভূমি কি না?

অসীম আকাশ তলে কত তারা কত নক্ষত্র; আমরা যাহাদের দেখিতে পাইতেছি আবার যাহাদের দেখিতে পাইতেছি না এমন কত অগণ্য নক্ষত্র তারকায় বিশ্ব পুরিয়া রহিয়াছে। উহারা সকলেই এক একটি সূর্য্য, সকলেই এই সূর্য্যের মত গ্রহ উপগ্রহ বেষ্টিত হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ঐ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, গ্রহগণ কি সকলেই পৃথিবীর মত জীবের নিবাস ভূমি!

বিশ্বের এই অগণ্য তারকাভাণ্ডারে পৃথিবী একটি অণুকনা, অতি সামান্য, অতি ক্ষুদ্র। এক দিকে এই রূপে অতি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হইয়াও পৃথিবী আর এক দিকে অতি মহৎ। পৃথিবী জীবের নিবাস ভূমি, কেবল তাহাই নহে, পৃথিবী মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের নিবাস ভূমি।

ঐ অগণ্য গ্রহ-জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী সকলেই কি পৃথিবীর মত তবে জীব পূর্ণ? সকলেই কি জীব প্রতিপালন করিবার উচ্চ উদ্দেশ্য বক্ষে ধারণ করিয়া সেই উদ্দেশ্যকে পোষণ করিতে করিতে চলিয়াছে? এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করে! এখানে বিজ্ঞান নিরুত্তর। দূর দূরান্তর-স্থিত সূর্য্য মণ্ডলী বেষ্টনকারী গ্রহগণ বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতীত। মানুষের দৃষ্টিগম্য এই সৌর জগতের গ্রহ কয়েকটিই যখন পূর্ণ মাত্রায় বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহে, তখন সেই অদৃশ্য গ্রহদিগকে বিজ্ঞান কি প্রকারে আয়ত্ত করিবে।

সৌর জগতের যে কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহ আছে তাহার মধ্যে চন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিজ্ঞানের আয়ত্ত মধ্যে আসিয়াছে, দূরবীক্ষণ যন্ত্র কতক পরিমাণে চন্দ্রের আভ্যন্তরিক অবস্থা ভেদ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা জানিয়াছেন চন্দ্রে জল নাই, চন্দ্রে বায়ু নাই। ইহা হইতে তাঁহারা বলেন চন্দ্র জীব শূন্য।

বৃহস্পতি শনি ইয়ুরেনস্ ও নেপচুন এত নিবিড় মেঘ ও বাষ্পাবৃত যে তাহা ভেদ করিয়া দূরবীনের দৃষ্টি চলে না।

কিন্তু সেই নিবিড় মেঘ ও বাষ্প সম্ভবতঃ গ্রহগণের আভ্যন্তরিক বিষম উত্তাপের ফল, এবং সেই উত্তাপে মুহু র্মুহুঃ ঘোর ঘন ঘটায় বজ্র বৃষ্টি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া গ্রহ দিগকে বিপ্লবস্থ করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহগণের সেই বিষম অবস্থা পৃথিবীর সাম্য অবস্থা হইতে এত ভিন্ন যে উহারা জীবের নিবাস ভূমি নহে বলিয়াই বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন। বুধ শুক্র ও মঙ্গলের আভ্যন্তরিক অবস্থা যতদূর জানা যায় তাহাতে ইহারা অনেক

বিষয়ে পৃথিবীর বড় কাছাকাছি, বিশেষতঃ মঙ্গলের আভ্যন্তরিক অবস্থার সহিত পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐক্য দেখা যায়। এ সত্বেও বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইয়া থাকেন যে তাহা মনুষ্যের বাসের অনুপযোগী। বুধ ও শুক্র সূর্য্যের অতিরিক্ত নিকট বশতঃ সূর্য্যের নিকট হইতে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে উত্তাপ ও আলোক পাইয়া থাকে সেরূপ প্রচুর উত্তাপালোকে কোনরূপ জীবের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা জানেন না। মঙ্গল গ্রহ এ সম্বন্ধে ভাগ্যবান, সূর্য্যের নিকট পৃথিবী যে পরিমাণে উত্তাপ ও আলোক পাইয়া থাকে মঙ্গলও প্রায় সেই এক পরিমাণে উত্তাপালোক পায়। সুতরাং উত্তাপালোকের প্রাচুর্য্য বশতঃ মঙ্গলগ্রহ জীবদিগের বাসের অনুপযুক্ত নহে। কিন্তু উত্তাপালোক জীবের প্রাণরক্ষার প্রধান কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নহে। গ্রহের নিজের মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি তাহার চতুস্পার্শস্থ অবস্থার উপরেও গ্রহস্থ জীবগণ গৌণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। অনেকেই জানেন পৃথিবীর আকার ও পদার্থ সমষ্টির উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বলের হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে। যদি পৃথিবীর পদার্থ সমষ্টির পরিমাণ ঠিক এখনকার মত থাকিয়া আকারে ইহা এখানকার অর্দ্ধেক হইত তাহা হইলে ইহার আকর্ষণ-বল এখন যেমন আছে তাহার চতুর্গুণ হইত, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক দ্রব্যের ভার এখনকার অপেক্ষা চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইত।

মঙ্গল গ্রহের পদার্থ সমষ্টির পরিমাণ পৃথিবীর অপেক্ষা অল্প, এবং যে পরিমাণে অল্প তাহা হইতে গণনা দ্বারা স্থির করা যায় যে পৃথিবীর যে দ্রব্য এখানে ওজনে ২৭ সের সেই দ্রব্য মঙ্গলে লইয়া গেলে ওজনে ১০ সের মাত্র হইবে। পৃথিবীর আকর্ষণ হঠাৎ মঙ্গল গ্রহের মত কম হইয়া পড়িলে ইহার জীবদিগের পক্ষে তাহা যে কিরূপ হানিজনক তাহা সহজেই বুঝা যায়। হিউএল বলেন পৃথিবীর দ্রব্য সকল তাহা হইলে যেখানে রাখা যাইবে সেই খানেই ঠিক হইয়া বসিয়া থাকিবে না, মানুষ জীব জন্তু দাঁড়াইবার সময় বেড়াইবার সময় ঠিক হইয়া চলিতে পারিবে না, জাহাজ যেমন সমুদ্রে টলমল করে সেইরূপ সর্ব্বদা টলমল করিতে থাকিবে। এই স্বল্পাকর্ষণে বাতাস অত্যন্ত লঘু হইয়া যাইবে। এখন পৃথিবীতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী এক বর্গ ইঞ্চ স্থানের উপর বায়ুর ভার প্রায় সাড়ে সাত সের, কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ মঙ্গলের সমান হইলে, পূর্ব্বোক্ত পরিমিত স্থানের উপর পৃথিবীর বায়ুর ভার প্রায় পৌণে তিন সের মাত্র হইবে। সমুদ্রতীর হইতে ৫মাইল উর্দ্ধে এখন পৃথিবীর এই রূপ লঘু বাতাস দেখা যায়। একরূপ পাখী ছাড়া এ বাতাসে পৃথিবীর অন্য কোন জীব জন্তুর বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।

মঙ্গলের চারিপাশে কত পরিমাণ বায়ু তাহা এখনো জ্যোতির্বিদগণ জানেন না, কিন্তু তাহা পৃথিবীর বায়ুর সমপরিমাণ হউক আর নাই হউক পৃথিবীর জীবদিগের পক্ষে উহা সকল অবস্থাতেই হানিজনক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মঙ্গলের আকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণ

অপেক্ষা অল্প সুতরাং মঙ্গল গ্রহের বায়ুর ঘনত্ব পৃথিবীর বায়ুর ঘনত্বের সমান হইতে গেলে মঙ্গলের বাতাসের পরিমাণ—পৃথিবীর অপেক্ষা অনেক অধিক হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা হইলে আবার মঙ্গলের ন্যায় স্বল্পাকর্ষণ-বিশিষ্ট গ্রহে যখন ঝড় হইবে তখন সেই ঘন বাতাসের বল অত্যন্ত অধিক হইবে। সেই ভীষণ বলে পৃথিবীর মত জীব জন্তু সহজেই উড়াইয়া লইয়া যাইবে। অথচ এদিকে মঙ্গলের বায়ু পৃথিবী অপেক্ষা অধিক ঘন না হইলে মঙ্গলে অত্যন্ত শীতের প্রভাব বৃদ্ধি হইবে কেননা পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল গ্রহ সূর্য্য হইতে অধিক দূরে অবস্থান করিতেছে। মঙ্গলে বায়ুর ঘনাবরণ না থাকিলে আভ্যন্তরিক উত্তাপ সহজেই সে বাহিরে ফেলিয়া দিবে। সুতরাং মঙ্গলের বায়ু পরিমাণ পৃথিবীর সমান হইতে আরম্ভ হইয়া যতই ইহার অধিক হইবে—ততই ঝড়ের প্রভাব বৃদ্ধি হইবে—আর যত কম হইবে—ততই শীতের প্রভাব বৃদ্ধি হইবে—কোন অবস্থাতেই পৃথিবীর জীবগণ জীবন ধারণ করিতে পারে না। তাহার পর মঙ্গল গ্রহের বৎসরের দৈর্ঘ্য পৃথিবীর প্রায় দ্বিগুণ। একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে মঙ্গলের ৬৮৭ দিন লাগে। পৃথিবীর বৎসর মঙ্গলের মত দীর্ঘ হইলে তাহাতে উদ্ভিদ-জগতে বিষম বিপ্লব বাধিবার সম্ভাবনা।

এইরূপে মঙ্গলের চারিদিকের অবস্থা পৃথিবীর অবস্থা সমূহের সহিত মিলাইয়া জ্যোতিষীগণ সিদ্ধান্ত করেন সম্ভবতঃ মঙ্গল গ্রহও জীব শূন্য। এখন দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞান, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সৌরগ্রহগণে জীব আছে কি না সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়াও অন্যরূপে ইহার উত্তর দেন। পৃথিবীর অবস্থা অন্য গ্রহগণের সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা দেখেন যে সে অবস্থায় পৃথিবীর জীব সকল বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। পৃথিবীর উত্তাপ ও আলোক কিছু অধিক হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, পৃথিবীর আকর্ষণের কিছু অধিক ন্যূনাধিক্য হউক অমনি পৃথিবীর প্রলয় উপস্থিত হইবে। তাঁহারা এই জ্ঞান দিয়া অন্য গ্রহগণের অবস্থাও বিচার করিতে চাহেন। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা যখন বলেন সৌর জগতের অন্য গ্রহগণ জীব শূন্য তাহার অর্থ এই, পৃথিবীতে যেরূপ জীব দেখা যায় অন্য গ্রহে সেইরূপ প্রকৃতির জীব বর্ত্তমান নাই। ইহার অধিক আর তাঁহারা কিছু বলিতে পারেন না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদিগের এই কথার যথার্থ অর্থ না বুঝিয়া যাঁহারা নিষ্পত্তি করেন পৃথিবী ছাড়া সকল গ্রহই প্রকৃত পক্ষে বসতিহীন—তাঁহাদের নিষ্পত্তির কোনরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। এই অবস্থায় জীবন সম্ভব আর এই অবস্থায় জীবন অসম্ভব এইরূপ একটি সীমা আজও পর্য্যন্ত বিজ্ঞান দিতে পারে নাই। মেরুদেশবর্ত্তী স্থানে ছয় মাস ধরিয়া সূর্য্য দেখা দেয় না, সেই হিমশৈলাবৃত খণ্ডে যে মানুষ আছে ইহা না জানিলে কি আমরা তাহা মনে করিতে পারিতাম? সেইরূপ দারুণ শীত আমাদের দেশে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে আমাদের উদ্ভিদ

জীব জন্তু সকলেরি প্রাণবিনাশ করিবে সন্দেহ নাই। সেই জন্য যথার্থ চিন্তাশীল যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ কি অবস্থায় জীবন সম্ভব আর কি অবস্থায় জীবন অসম্ভব—ইহা মীমাংসা করা অসম্ভব মনে করেন।

বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে অল্প দিন হইল অতি কঠোর শিক্ষা পাইয়াছে। সুগভীর সাগর তলের অবস্থা বৈজ্ঞানিকগণ যতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে অতি গভীর সাগর তলে কোন প্রাণী থাকিতে পারে না, কেন না অধিক গভীর জলস্তর দ্বারা সিন্ধুতলে যতখানি চাপ পড়িবার কথা ততখানি চাপে আমরা যে সকল জীব জন্তু জানি তাহাদিগের কোনটীই বাঁচিতে পারে না। চাপ সম্বন্ধীয় পরীক্ষা হইতে তাঁহারা প্রতিপন্ন করেন যে সেই ঘোর জল-চাপে কঠিন কুম্ভীর-পৃষ্ঠ কিম্বা গণ্ডার চর্ম্ম কিম্বা কঠিনতম ও ঘনতম কাষ্ঠও চুরমার হইয়া যাইবে।

অথচ এখন জানা গিয়াছে যে সেই অতি গভীর সাগরতলে জীবের বসতি আছে, কেবল তাহাই নহে তাহারা সাগর তলের সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়াও দেখিতে পায়। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে কোন স্থানের চতুস্পার্শ্বস্থ অবস্থা ভেদে সেই অবস্থার অনুযায়ী জীব উৎপন্ন হইতে পারে, জীব জন্মিবার জন্য একটি বা কতকগুলি বিশেষ সার্ব্বভৌমিক উপযোগী অবস্থা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা নহে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন না—যে "এই পর্য্যন্ত ইহার সীমা—ইহার অধিক নহে।"

ইয়োরপের অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা গ্রহগণ যে জীবের নিবাস ভূমি ইহাই কল্পনা করিয়া থাকেন। একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী ছাড়া আর কোটি কোটি-গ্রহ মণ্ডলী যে জীব পালন-রূপ মহৎ উদ্দেশ্য হীন হইয়া অবারিত গতিতে অনন্ত পথে অনন্তকাল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাঁহাদের মতে ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রাশি রাশি অগণ্য যে সূর্য্য রহিয়াছে তাহারা কত উত্তাপালোক বিকিরণ করিতেছে! সে সকলি যে বৃথা ব্যয় হইতেছে এইরূপ কল্পনাই উচ্চতম বৈজ্ঞানিক কল্পনা বলিয়া স্থির হইতে পারে না।

ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য নক্ষত্রের কথা ছাড়িয়া যদি কেবলমাত্র আমাদের সূর্য্যের উত্তাপের কথা ভাবা যায় তাহাতেই দেখা যাইবে যে, যে উত্তাপ পাইয়া পৃথিবী জীবিত আছে তাহা সূর্য্যের বিকিরিত উত্তাপের ২১, ৭০০, ০০, ০০০, ভাগের এক ভাগ মাত্র। সূর্য্যের এই উত্তাপ রাশির অতি সামান্য অংশ পৃথিবীর উপকার সাধন করিয়া অবশিষ্ট সকলি কি বৃথা নষ্ট হইতেছে! তাহা নহে, ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই উদ্দেশ্য হীন নহে, কিছুই বৃথা নষ্ট হয় না। আমাদের এই সীমা বদ্ধ ধারণা-শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব জগতের অভিপ্রায় সীমাবদ্ধ করিতে গেলেই আমরা ভ্রমে পতিত হইব। জ্যোতিষী প্রকটার এ সম্বন্ধে সুন্দর কথা বলিয়াছেন,

"ইহা অতি আশ্চর্য্য, যে আমরা মুখে

বলিবার সময় ঈশ্বরের মঙ্গলময় ভাব তাঁহার সৃষ্ট বস্তু মাত্রেতেই অর্পণ করি এবং তাঁহাকে অসীম জ্ঞানবান অসীম ক্ষমতাবান বলিয়া থাকি, অথচ অন্য লোকে প্রাণী আছে কি না এ বিষয় মীমাংসা করিতে গেলেই তখন সেই অসীম ক্ষমতাশালী ঈশ্বরের ক্ষমতা ও জ্ঞান সীমাবদ্ধ রূপে ধরিয়া লই। অন্য লোকের জীব কল্পনার সময় সেই লোকের স্থানীয়-অবস্থার উপযোগী করিয়া যে তিনি সেখানকার জীবদিগকে সৃষ্টি করিবেন ইহা না ভাবিয়া, যেরূপ জীবগণ আমাদের নিকট পরিচিত, আমরা তখনো সেইরূপ জীবগণের কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন লোকে সেরূপ জীব বাস করিতেই পারে না, আর যদিই বা পারে তবে তাহাদের সেখানে কষ্টের সীমা থাকে না।"

যদি প্রকৃতির মূল নিয়ম সকল বিশ্ব ব্যাপী হয় তবে জীব উৎপাদিনী শক্তি এই পৃথিবীতেই একমাত্র আবদ্ধ এ কথা কেমন করিয়া বলা যায়। ফরাসী জ্যোতিষী ডাক্তার কার্ল্ ডু-প্রেল গ্রহদিগের নিবাসীগণ বলিয়া যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে বলেন অন্য গ্রহে তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ অবস্থার উপযোগী আকার ও শরীর যন্ত্রাদি সম্পন্ন জীব উৎপত্তি (যেরূপ জীবের অস্তিত্ব আমরা জানি না) যে কেবল সম্ভাবনীয় এমন নহে। যদি উহা সৃষ্টির অবশ্য প্রয়োজনীয় নাও হয়—তাহা হইলেও যুক্তি-যুক্ত রূপে যে উহা অবশ্য ঘটনীয় ইহা বলিতেই হইবে। এখন কথা হইতেছে অন্য গ্রহে জীব থাকিতে পারে—কিন্তু পৃথিবীর মানুষের ন্যায় জ্ঞানবান জীব আছে কি না?

যদি অন্য গ্রহে কোন রূপ জীব থাকা সম্ভব হয়—তবে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীব থাকা কেনই বা সম্ভব না হইবে? তবে গ্রহের অবস্থা ভেদে সে জীবদিগের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রাদি পৃথিবীর মানুষ হইতে ভিন্ন হইবে সন্দেহ নাই। জীবগণ যাহাতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে সেই উদ্দেশে চারিদিকের অবস্থা ভেদে তাহাদিগের আকৃতি ও যন্ত্রাদির বিভিন্নতা দেখা যায়; এক লোকে কোন জীবের যে একটি শারীরিক যন্ত্রের আবশ্যক অন্য লোকে তাহারি অনাবশ্যক হইতে পারে। সেই হেতু অন্য লোক নিবাসীদিগের আকৃতি, ভার, বল, ইন্দ্রিয়, জীবনের স্থিতি কাল, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি এই সমুদায়কেই বাস ভূমির চতুস্পার্শ্বস্থ অবস্থার উপযোগী হইতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে কোন গ্রহের নিবাসীদিগের শারীরিক ও মানসিক গঠন, সেই গ্রহের উত্তাপালোক প্রভৃতি চতুস্পার্শ্বস্থ অবস্থার সহস্থায়ী ফল মাত্র। সুতরাং অন্য কোন গ্রহে মানুষের ন্যায় জীব থাকাই অধিক সম্ভব, তবে সে জীব পৃথিবীর মানুষ হইতে অনেক বিষয়ে ভিন্ন হইবে এই মাত্র।

আমরা দেখিতে পাই, উদ্ভবন, ক্রমোন্নতি, ক্রম বিকাশ সৃষ্টির মূল নিয়ম। ভূতত্ত্ববিদেরা আমাদের দেখাইতেছেন ক্রমোন্নতির নিয়মে জড়ের পর উদ্ভিদ, উদ্ভিদের পর ইতর জীব জন্তু, তাহার পর মানুষ এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা হইতে একটু ভা-

বিয়া দেখিলেই আমরা দেখিতে পাইব যখনি সৃষ্ট জগতে কোন বস্তু জড় পদার্থ রূপে ব্যক্ত হইল তখন প্রাণ উৎপাদিনী শক্তি তাহাতে নিহিতরূপে বিদ্যমান রহিল। এই শক্তি যে সে কোন নূতন স্থান হইতে লইয়া আসিল তাহা নহে, যখন সে জড় রূপে ব্যক্ত হয় নাই যখন সে অতি সূক্ষ্মতম ভাবে বিশ্বে বিলীন ছিল—সেই আদি কাল হইতেই সে শক্তি তাহার সঙ্গে ছিল।

বাস্তবিক পক্ষে আমরা যাহাদের অচেতন পদার্থ বলি তাহারা যে প্রকৃত পক্ষে চেতনাহীন তাহা হইতেই পারে না। তুলনায় মাত্র তাহারা এই নামের বাচ্য। বিজ্ঞান বলিতেছে জগতের শক্তি সমষ্টির হ্রাস বৃদ্ধি নাই, বাহির হইতে নূতন কোন শক্তি আনিয়া শক্তি সমষ্টির সংখ্যা বাড়াইতে পারে না রূপান্তর ভাবে মাত্র তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে জড় রাজ্যের বাহির হইতে কি করিয়া হঠাৎ জ্ঞান আসিবে? আমি যে এই দেয়ালে মুষ্ট্যাঘাত করিলাম আঘাত করিবার শক্তি আগে হইতেই অবশ্য আমাতে বিদ্যমান ছিল, তবে সে শক্তি আমাতে লুকাইয়া ছিল মাত্র, এখন তাহাই কার্য্যকরী শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া মুষ্ট্যাঘাত হইয়া দাঁড়াইল। অচেতন জগতও চেতনাময়—সমস্ত জগতেই প্রাণ ও চেতনা অস্ফুট ভাবে শক্তির আকারে বিরাজ করিতেছে। তাহারি ক্রমোন্নতি দ্বারা ক্রমে সে প্রাণ সে জ্ঞান উদ্ভিদ হইতে ইতর জীব জন্তুতে, ইতর জীব জন্তু হইতে মানবে অধিকতর রূপে পরিস্ফুট হইতেছে মাত্র।

ভাবিয়া দেখিতে গেলে জড় ও প্রাণরাজ্যের বস্তুগত প্রভেদ কিছুই নাই—কেবল মাত্র শ্রেণীগত অর্থাৎ সোপানগত বিভেদ। ঐ যে কতকগুলি সোপান রহিয়াছে উহারা একই পদার্থে নির্ম্মিত কেবল উচ্চ নীচতায়, পরস্পর প্রভেদ মাত্র। সেইরূপ জড় পদার্থে ও জীবিত পদার্থে সোপান গত প্রভেদ মাত্র।

জড় ও প্রাণময় জড়ও চেতনাময় কেবল তাহার চেতনা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে সে চেতনা আপনার চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। যাহাকে আমরা জীব বলি তাহাতে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং জড়ের সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চতম জ্ঞান-বিশিষ্ট প্রাণী-উদ্ভবনের সম্ভাব্যতা বর্ত্তমান রহিল।

ক্রমোন্নতির এই নিয়মেই পৃথিবীকে আমরা এখনকার এই অবস্থায় দেখিতেছি। প্রথম হইতেই ইহার এ অবস্থা ছিল না—প্রথমেই পৃথিবীতে মানুষ জন্মে নাই। আদিম সৌরজগৎব্যাপী সূর্য্য নীহারিকা হইতে বিচ্ছিন্ন পৃথিবী-গোলক বাষ্পাবস্থা হইতে তরলাবস্থা তাহা হইতে সংহত-কঠিন অবস্থা ধারণ করিল,তাহার পর পৃথিবী বাসোপযোগী হইলে ইহাতে ইতর জীব উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে মানুষ পর্য্যন্ত আবির্ভাব হইল, এবং এই খানেই যে সেই উন্নতির চরম সীমা তাহাই বা কে বলিবে? বিজ্ঞান দেখাইতেছে যে ক্রমোন্নতির গতি ঘূর্ণ সোপানাবলীর ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে উঠিতেছে। এই গতির সঙ্গে সঙ্গে জড়জগৎ

হইতে প্রাণীজগৎ সকলেরি চলিতে হইতেছে। তবে যাহারা এই গতির সহিত সমান বেগে দৌড়িতে পারে তাহারাই উর্দ্ধ সোপানে উঠে আর যাহারা তাহা না পারে তাহারা নীচে পড়িয়া ক্রমে ক্রমে তখনকার মত লোপ পায়। ডারউইন এই নিমিত্তই বলিয়াছেন সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য জীবেরাই বাঁচিয়া যাইবে। ভূতত্ববিদেরা দেখিতেছেন যে চতুস্পার্শ্বস্থ অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে যে সকল জীব আত্মরক্ষার উপযোগী শরীর যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিতে না পারে সে জাতি ক্রমে ক্রমে একেবারে লোপ পাইয়া যায়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার স্থান শূন্য হইয়া পড়ে না কেন না অন্য উপযোগী জীব উৎপন্ন হইয়া সে স্থান অধিকার করে। অন্য গ্রহগণ জীবের নিবাস ভূমি বলিয়া যদি একবার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে আরো অধিক দূর পর্য্যন্ত উঠিতে হইবে, ঐ পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিতে পারা যাইবে না। যে লোকে জীব আছে ক্রমোন্নতির নিয়মে সেখানে ইতর হইতে ক্রমে উচ্চতর জীবের আবির্ভাব অবশ্যই সম্ভাবনা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে এই আবির্ভাব কোন গ্রহে ঘটিয়া গিয়াছে কোন গ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এরূপ কল্পনা অসঙ্গত নহে।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

এম, বর্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।*

Mr. Bernier, who stand in the first rank of writers on Indian History. (Forster.)

সম্ভবতঃ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস বর্ণিয়ার ফ্রান্সের অন্তঃপাতি এক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া "ডাক্তার" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া বর্ণিয়ার পর্য্যটন ব্রত অবলম্বন করিলেন। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সিরিয়া দর্শন করিয়াছিলেন। তৎপর পর্য্যটক মিসর দেশে গমন করেন। তিনি কাহারা নগরে এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাহার পর সুয়েজে আসিয়া পোতারোহনে লোহিত সাগরে ভ্রমণাভিলাষে বহির্গত হন। কিন্তু মক্কায় আসিয়া তিনি অবগত হইলেন যে রোমান কাথলিক খৃষ্টানদিগের পক্ষে সেই সময়ে গোণ্ডার (ইথোপিয়রাজ্য) দর্শন নি-

* Travels in the mogul Empire, by Francis Bernier. Translated from the French, (in English) by Irving Brock. In Two Volumes.

তান্ত নিরাপদ নহে। অগত্যা পর্যটক পূর্ব্ব অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় একখানা অর্ণবপোতারোহনে বাবেলমোণ্ডব প্রণালী অতিক্রম করিয়া দ্বাবিংশ দিবসে সুরাটনগরে উপনীত হন। বর্ণিয়ার প্রায় দ্বাদশ বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়া ছিলেন। তাঁহার অবস্থান কালের ভারত-ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে তাহার গ্রন্থের প্রথম ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ হয়। কিন্তু সেই অনুবাদ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে বলিয়া আর্বিং ব্রোক তাহার দ্বিতীয় অনুবাদ প্রকাশ করেন। আমরা সেই গ্রন্থ হইতে তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

বর্ণিয়ার বলিতেছেন—"বিখ্যাত মোগল সাম্রাজ্যের অধীন সুরাটে উপনীত হইলাম। সে সময় সাজাহান (বা "জগতপতি") ভারত-রাজাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি জাহাঙ্গিরের (বা জগতবিজয়ীর) পুত্র ও আকবরের (বা মহতের) পৌত্র। আকবরের পিতা হুমাউনের পূর্ব্বে রাজবংশের বংশাবলী অনুসন্ধান দ্বারা অনুমিত হয় যে সাজাহান তাইমোরলেঙ্গ (বা খোড়ারাজা) হইতে দশ পুরুষ অবতীর্ণ। তাইমোর লেঙ্গ নামটী বিকৃত হইয়া "তাইমোরলেন" হইয়াছে।

সাজাহানের বয়ক্রম প্রায় ৭০ বৎসর। তাহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা। কয়েক বৎসর অতীত হইল সম্রাট তাহার চারি পুত্রকে চারিটী প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন। সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম দারা বা দারায়োস; দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা; তৃতীয় পুত্র ঔরংজীব; চতুর্থ পুত্র মুরাদ বক্স্। কন্যা দ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠাকুমারী বেগম সাহেব ও কনিষ্ঠা রুসিনারা বেগম নামে পরিচিত।

জ্যেষ্ঠকুমার দারা বিনয়ী, ভদ্র ও সদাশয় ছিলেন। তাঁহাতে সদগুণ সমূহের অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি আপনাকে আপনি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও গুণবান বিবেচনা করিতেন। পৃথিবীতে তাঁহার অসাধ্য কোন কর্ম্ম আছে বলিয়া তিনি জ্ঞান করিতেন না। অধিকন্তু তাঁহার এরূপ ধারণা ছিল যে তিনি পরামর্শ বা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন এমত মানব জগতে দুর্লভ। দারা প্রকাশ্যে মুসলমান, কিন্তু গোপনে হিন্দুর নিকটে হিন্দু ও খৃষ্টানের নিকট খৃষ্টান বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

দ্বিতীয়কুমার সুলতান সুজা দোষগুণ সম্বন্ধে অধিকাংশই দারার অনুরূপ। কিন্তু তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান উমরা ও সামন্ত-রাজগণকে স্বপক্ষে রাখিবার বিলক্ষণ কৌশল জানিতেন। সুজা প্রকাশ্যরূপে পার্শিয়ানদিগের ধর্ম্ম † গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় রমণী মণ্ডলীর চিত্ত বিনোদনে অতিবাহিত হইত।

তৃতীয়কুমার ঔরংজীব ধীরপ্রকৃতি বুদ্ধিমান। তিনি বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ লোক অ-

† আবেস্তা গ্রন্থের ধর্ম্ম নহে। পারস্যবাসী মুসলমানদিগের ধর্ম্ম।

ক্লেশে স্থির করিতে পারিতেন। যে সকল লোকের সাহায্য কোন দিন তাঁহার আবশ্যক হইতে পারে তাহাদিগকে তিনি উপহার প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন। কেহ তাঁহার অন্তরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। যে সময়ে তিনি দক্ষিণাপথের রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হন, সে সময়েও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে পিতা যদি আমাকে রাজদণ্ড প্রদান না করিয়া ফকীর হইতে অনুমতি করিতেন তাহা হইলে আমি অধিক সুখী হইতাম। তিনি দিবারাত্রের অধিকাংশ সময় ঈশ্বরোপাসনা (বা নেমাজে) অতিবাহিত করিতেন এজন্য লোকে তাহাকে "নেমাজী" বলিত। সাজাহান তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে ঔরংজীবের সমধিক প্রশংসা করিতেন। দারার হৃদয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে নেমাজীর নাম, ভয় ও হিংসার সহিত প্রতিধ্বনিত হইত।

চতুর্থকুমার মুরাদ বক্স যেমন বয়সে তেমনি আবার গুণেও সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি কোন বিষয় গোপন রাখিতে জানিতেন না। তিনি কেবল স্বীয় বাহুবলের উপরই নির্ভর করিতেন। তাঁহার অসাধারণ সাহস ছিল। যদি উপযুক্ত উপদেশ ও বিবেচনার সহিত তাঁহার সাহস ও বাহুবল পরিচালিত হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ভারত বর্ষের রাজাসন অধিকার করিতে পারিতেন।

জ্যেষ্ঠা কুমারী বেগম সাহেব, মনমোহিনী সুন্দরী ছিলেন। সাজাহান তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সাজাহান সম্বন্ধে ইতিহাস লেখক এমন একটি ঘৃণিত জন প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার সত্যতার প্রতি ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হয়—এবং তাহা লেখনীতে প্রকাশ করিবারও অযোগ্য। উৎকল ইতিহাস জনৈক উৎকলেশ্বরকে যে কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়াছে, ফরাসী পরিব্রাজক বর্ণিয়ার সাজাহানকে সেই কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়াছেন। বেগম সাহেব সর্ব্বদা পিতার আহারাদির ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিতেন। যে কোন খাদ্য তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত না হইত, তাহা সাজাহানের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিত না। রাজদরবারে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। এই রাজকুমারী স্বীয় ক্ষমতার গুণে অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার মাসিক "মাসহরা" যেরূপ সর্ব্বাধিক ছিল, সেইরূপ চতুর্দ্দিক হইতে সর্ব্বদাই বহুমূল্য উপঢৌকন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। এইরূপ অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াও তিনি স্বামী লাভের অধিকারিণী হন নাই। সাজাহানের নিকট বারংবার বেগম সাহেবের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইলেও তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। রাজকুমারীদিগকে বিবাহ দেওয়া বোধ হয় মোগল সম্রাটদিগের কুষ্ঠিতে লেখা ছিল না। দুইবার দুইটী যুবককে বেগম সাহেবের প্রিয় পাত্র বলিয়া সাজাহান চক্রান্ত করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। বেগম সাহেব প্রকাশ্যে দারার পক্ষ সমর্থন করিতেন। দারা সিংহাসন আরোহণ করিলে

িনি বেগম সাহেবকে মনোমত স্বামী গ্রহণে অনুমতি দিবেন, এই প্রলোভন দেখাইয়াই বোধ হয় দারা বেগম সাহেবকে স্বীয় পক্ষে আনিয়াছিলেন।

কনিষ্ঠা কুমারী রুসিনারা বেগম ; ইনি বেগম সাহেবের ন্যায় তত সুন্দরী ছিলেন না। রাজদরবারেও তাঁহার তত দূর প্রতিপত্তি ছিল না, তিনি প্রকাশ্যরূপে ঔরংজীবের পক্ষ সমর্থন করিতেন। সুতরাং দারা ও বেগম সাহেবের সহিত তাহার কিছু মাত্র সদ্ভাব ছিল না। বোধ হয় এ জন্যই তিনি বিশেষ ধন সঞ্চয় করিতে পারেন নাই।

চরমাবস্থায় সাজাহান কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রগণকে শাসন করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। কুমারগণের মধ্যে হিংসা দ্বেষ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। রাজদরবারের লোকগণ চারিভাগে-বিভক্ত হইল। বেগতিক দেখিয়া সম্রাট কনিষ্ঠ পুত্রত্রয়কে দূর দেশে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। সুলতান সুজাকে বাঙ্গালার রাজাসনে অভিষিক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঔরংজীব দক্ষিণাপথে ও মুরাদ বক্স গুজরাটে প্রেরিত হইলেন। দৌলতাবাদ (প্রাচীন দেবগিরি) ঔরংজীবের রাজধানী হইয়া দারা কাবুল ও মুলতানের শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়াতে তিনি ভারত রাজাসনের ভাবী অধিকারী বলিয়া তাঁহাকে রাজদরবারে থাকিতে হইল। সাজাহানের বিখ্যাত ময়ূরাসনের পার্শ্বে তাঁহার জন্য আর একখানি সিংহাসন স্থাপিত হইল। বেগম সাহেবের যত্নে যদিও সাজাহান দারাকে প্রকাশ্যে যুবরাজের ন্যায় ব্যবহার করিতেন তত্রাচ তাঁহার বিলক্ষণ ধারণা ছিল যে উত্তর কালে ঔরংজীবের বুদ্ধি-বলে দারার রাজাসন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এ জন্যই তিনি গোপনে ঔরংজীবের প্রতি স্নেহ ও সদ্ভাব দেখাইতেন।

কনিষ্ঠ রাজপুত্র ত্রয় স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশ স্বাধীন রাজ্যের ন্যায় শাসন করিতে লাগিলেন। কাহাকেও সম্রাট সমক্ষে কোন প্রকার রাজস্ব প্রেরণ করিতে হইত না, সুতরাং তাঁহারা সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য রাজকুমারদিগের কার্য্য কলাপ বর্ণন করিবার পূর্ব্বে, আমরা ভারতের ভাবী সম্রাট ঔরংজীবের সৌভাগ্য সূচনার বিবরণ পাঠকগণকে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গোলকণ্ডার অধিপতির একজন বুদ্ধিমান, সুচতুর ও কর্ম্মঠ মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। পারস্যের রাজধানী ইস্পাহানের নিকটবর্ত্তী অর্দ্দিস্থান নামক পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। তিনি অনেক কষ্টে কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া জনৈক হীরক বিক্রেতার অধীনে মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত হন। সেই কার্য্যোপলক্ষে তিনি গোলকণ্ডায় গমনাগমন করিতেন।

কিয়ৎকাল মধ্যে তিনি দাসবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে গোলকণ্ডায় হীরকের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। সৌভাগ্য লক্ষী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন। ক্রমে সেই প্রদেশে তিনি একজন বিশেষ ধনবান বলিয়া খ্যাত হইলেন। তৈলঙ্গ ও গোলকণ্ডার রাজা কুতুবের দরবারে তাঁহার একটী সামান্য কর্ম্ম হইল। অসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে সেই সামান্য পদ হইতে ক্রমে প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতির পদে উন্নীত করিল। তিনিই ভারত বিখ্যাত আমির জিম্লা প্রকাশ্য মির জুম্লা। তিনি তৈলঙ্গ রাজের সৈন্যগণের নায়কত্ব করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিলেন না। হীরকের ব্যবসা দ্বারা তাহার প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। সেই প্রদেশের প্রধান রাজপুরুষ হইয়াও তিনি হীরকের ব্যবসা পরিত্যাগ করেন নাই। জগতের নানা স্থানে তাঁহার ব্যবসা চলিতেছিল। ব্যবসায় দ্বারা অর্জ্জিত অতুল সম্পত্তির কিয়দংশ ব্যয় করিয়া তিনি বৃহৎ এক দল (অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ) সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। ক্রমে এই সংবাদ কুতুবের কর্ণগোচর হইলে তাঁহার অন্তঃকরণে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি জুম্লাকে রাজসিংহাসন অধিকার লোলুপ বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু তখনও তিনি তাঁহার হৃদয়ের গুপ্ত ভাব প্রকাশ করেন নাই। এসময়ে এমন একটী ঘৃণিত সংবাদ * রাজার কর্ণগোচর হইল, যে তৎশ্রবণে তিনি আর ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিলেন না, প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন।

আমির জুম্লা এসময়ে রাজ কার্য্যোপলক্ষে কর্ণাটে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু রাজসভা তাঁহার অনুগত ও আত্মীয় বর্গ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তাহাদের দ্বারা শীঘ্র জুম্লা স্বীয় দুর্ভাগ্যের সংবাদ অবগত হইলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র মহম্মদ আমির খাঁ এসময় রাজ দরবারে উপস্থিত ছিলেন। জুম্লা তাহাকে কোন কার্য্যের ছল করিয়া রাজ দরবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ণাটে উপস্থিত হইতে লিখিলেন। কিন্তু কুতুবের সতর্কতায় আমির খাঁ রাজধানী পরিত্যাগ করিতে অপারক হইলেন।

যাহার সহায়ে ঔরংজীব হিমালয় হইতে কুমারিক, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত অখণ্ড আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন সেই জুম্লা এক্ষণে সেই ঔরংজীবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জুম্লা ঔরংজীবকে লিখিলেন:—

"জগৎ ইহা অবগত আছে যে আমি গোলকণ্ডা রাজের কার্য্য কিরূপে সম্পাদন করিয়াছি। রাজা কুতুব আমার নিকট গুরু কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিয়াও আমার ও আমার পরিবার বর্গের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ জন্য আমি আপ-

* The improper intimacy subsisting between Emir—Jemla and the queen-mother, whe still retained much beauty.

Vol 1 page 19.

নার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করিতেছি যে আমার পরামর্শ মতে কাজ করিলে আপনি অক্লেশে রাজা ও তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিতে পারিবেন। কেবল চারি পাঁচ সহস্র উপযুক্ত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আপনি গোলকণ্ডায় যাত্রা করুন। গোলকণ্ডায় উপনীত হইতে আপনার ১৬ দিবস লাগিবে। এরূপ প্রচার করিবেন যে আপনি সম্রাট সাজাহানের দূত রূপে গোলকণ্ডা রাজের নিকট যাইতেছেন।

"দবির" যে ব্যক্তি রাজা কুতুবকে সর্ব্ব প্রথম এই সংবাদ অবগত করাইবেন, তিনি আমার পরমাত্মীয়। সুতরাং আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে আপনি নির্ব্বিঘ্নে ও নিঃসংশয়ে বাগনগরের (রাজধানী) দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে পারিবেন। তৎপর যখন গোলকণ্ডা রাজ আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইবেন তৎকালে আপনি অক্লেশে রাজাকে আবদ্ধ করিয়া রাজ্য অধিকার করিতে সক্ষম হইবেন। অধিকন্তু আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি যে এই যুদ্ধযাত্রার সমস্ত ব্যয় আমি বহন করিব, আরও যতদিবস আপনি এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, আপনার দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রতি দিবস ৫০০০০ সহস্র টাকা প্রদান করিব।"

যে উপকরণে জুম্লা নির্ম্মিত বিধাতা সেই উপকরণে ঔরংজীবকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জুম্লার কূটবুদ্ধি জনিত পরামর্শ ঔরং জীব সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই সুযোগ পরিত্যাগ করা তাঁহার নিকট কোন মতেই সঙ্গত বোধ হইল না। তিনি অবিলম্বে গোলকণ্ডারাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। জুম্লার কৌশলে ঔরং জীব নির্ব্বিঘ্নে বাগনগরের দ্বারদেশে যথা সময়ে উপস্থিত হইলেন। রাজা কুতুব কয়েকজন সামান্য অনুচরের সহিত সম্রাট-দূতকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ঔরংজীবের নিকটবর্ত্তী হইলে জনেক ওমরা কুতুবকে বলিলেন—"জাহাপনা শীঘ্র পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করুন। এ দূত অন্য কেহ নহে স্বয়ং ঔরংজীব।"

রাজা কুতুব এই সংবাদ শ্রবণমাত্র পলায়ন করিয়া বাগনগরের নিকটবর্ত্তী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঔরংজীব সেই দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন।

ক্রমে দুই মাস অতিবাহিত হইল। ঔরংজীব সাজাহানের সাক্ষরিত এক আদেশ লিপি প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে "ঔরংজীব অবিলম্বে গোলকণ্ডা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার রাজধানী দৌলতাবাদে গমন করেন।" আদেশ পত্র পাঠ করিয়াই ঔরংজীব বুঝিতে পারিলেন যে দারা ও বেগম সাহেবের চক্রান্তে বাধ্য হইয়া সম্রাট এই আজ্ঞাপত্রে সাক্ষর করিয়াছেন।

প্রকৃত পক্ষেও ঔরংজীবকে ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে না দেওয়াই দারা ও বেগম সাহেবের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু অদৃষ্ট যাহার সহায় তাহার আর কে কি করিতে পারে। ঔরংজীব এমন কৌশলের সহিত পিতৃ

আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, যে তদ্দ্বারা তাঁহার স্বীয় ও সম্রাটের যথেষ্ট লাভ হইয়াছিল। গোলকণ্ডা পতি ঔরং-জীবের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন। যে—প্রথম, গোলকণ্ডা রাজ্যের মুদ্রায় সম্রাট সাজাহানের নাম অঙ্কিত হইবে। দ্বিতীয়, আমির জুম্লা তাঁহার ধন সম্পত্তি, পরিবার ও অনুচরবর্গ সহ যথা ইচ্ছা যাইতে পারিবেন। তৃতীয়, ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদ, কুতুবের জ্যেষ্ঠ কন্যা বিবাহ করিবেন, এবং তিনিই কুতুবের মৃত্যুর পর গোলকণ্ডার রাজাসন অধিকার করিবেন। তদতিরিক্ত যুদ্ধের ব্যয় ও উপঢৌকন স্বরূপ কুতুব ঔরং-জীবকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। কুমার মহম্মদ, কুতুবকন্যার পাণিগ্রহণকালে রাম-গড় দুর্গ ও তদন্তর্গত প্রদেশ যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

আমির জুম্লা মুক্তিলাভ করিয়া ঔরং-জীবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঔরং-জীবের উন্নতির প্রকৃত সূচনা হইল। ঔরং জীব জুম্লার সহিত মিলিত হইয়া বিদর্ভ (বিদার) আক্রমণ করিলেন। সেই স্থান বিজয় ও লুণ্ঠন দ্বারা তাঁহারা যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করত দৌলতাবাদে গমন করিলেন।

জুম্লা কিছুকাল দৌলতাবাদ বাস করিয়া ছিলেন। তৎপর সাজাহান তাঁহাকে আ-হ্বান করিলেন। জুম্লা আগ্রায় উপস্থিত হইয়া সম্রাটকে মণি মাণিক্য প্রভৃতি বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিলেন। এই সময়ে জগদ্বিখ্যাত কোহিনুর জুম্লা সম্রাটকে অর্পণ করেন। বীরকেশরী রঞ্জিতসিংহ যে রত্নের মূল্য "পাঁচজুতী" স্থির করিয়াছিলেন, অদ্য সেই রত্ন একব্যক্তি বিনা মূল্যে উপহার স্বরূপ ভারত সম্রাটকে প্রদান করিল। জুম্লা অমূল্য হীরকের প্রলোভন দেখাইয়া সম্রাটকে গোলকণ্ডা ও বিজয়পুর রাজ্য আক্রমণ করিতে মন্ত্রণা দিলেন।

হীরকের প্রলোভনে পড়িয়াই হউক বা অন্য কারণেই হউক সাজাহান কন্যা কুমারী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড জয় করিতে মনস্থ করিলেন। আমির জুম্লার অধীনে বৃহৎ একদল সৈন্য প্রস্তুত করা হইল। এই সৈন্য দল প্রস্তুত কালে সাজাহান ও দারার অভিপ্রায় যাহাই হউক না কেন, তদ্দ্বারা ঔরংজীবের ভাবী উন্নতির পথ পরি-ষ্কার হইতে লাগিল।

এই সময়ে দারার চক্রান্তে সাজাহানের প্রধান মন্ত্রী উজির সাদুল্যাখাঁর গুপ্ত হত্যা সম্পাদিত হয়। সম্রাট দারার প্রতি অস-ন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

তৎপর এত অধিক সৈন্য দক্ষিণাপথে প্রেরণ করিয়া ঔরংজীবের বল বৃদ্ধি করিয়া দিতে দারা কোনমতেই সম্মত হইলেন না। কিন্তু তৎসম্বন্ধে সাজাহান দারার কোন আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না, কেবল এই মাত্র স্থির হইল যে, ঔরংজীবের সহিত এই সৈন্যদলের কোন সম্পর্ক থাকিবেক না, আমির জুম্লা স্বাধীনভাবে ইহার নায়কত্ব করিবেন এবং তাঁহার সদাচারের জামিন স্বরূপ জুম্লার পরিবার বর্গ আগ্রায় উপস্থিত থাকিবে।

জুম্লা সেই বৃহৎ সেনাদল লইয়া দক্ষিণা-

পথে উপস্থিত হইলেন। বিজয়পুর রাজ্যস্থিত কল্যাণনগরীই তিনি প্রথম অবরোধ করিলেন।

এই সময়ে সম্রাট সাজাহান বাতরোগে আক্রান্ত হন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর। সুতরাং সকলেই সম্রাটের জীবনাশায় নিরাশ হইলেন। সমস্ত ভারতবর্ষে এই সংবাদ ঘোষিত হইল। দারা সৈন্যবল বৃদ্ধি করিয়া আগ্রা ও দিল্লীর সেনানিবাস পূর্ণ করিলেন। বাঙ্গালায় সুজা, দক্ষিণাপথে ঔরংজীব ও গুজরাটে মুরাদ বক্স যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

গোলাপ।

বর্ষাকালেই টক্‌টকে গোলাপী রংএর গোলাপের বড় আমদানী। যে কোন বাগানে গোলাপের গাছ আছে, সেখানেই পবনভরে সতেজ-ডালের উপর ফুটন্ত গোলাপ হিল্লোলিত হইতেছে দেখা যায়। সুরভি ও সুষমাবিশিষ্ট পুষ্পরাজীর মধ্যে গোলাপ যে এক অতি রমণীয় মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য ও গন্ধবিশিষ্ট ফুল, তাহা কেবল মেরু সন্নিহিত অধিবাসীদিগকেই বলিয়া দিতে হয়। ফুটন্ত বড় গোছের গোলাপের সকলেই পক্ষপাতী। শাখার উপর একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ দেখিলেই ছেলে বুড়ো-আদি সকলে অমনি হাত বাড়াইয়া ফুলটি ছিঁড়িবার জন্য ব্যস্ত; কিন্তু অমন ফুল কি ছিঁড়িতে আছে? ডালের মাথার উপর থাকিয়া সগর্ব্বে দুলিতে দুলিতে ফুলটি যে তোমার আমার পাঁচ জনের হৃদয়ে কত রকমের ভাব আনিয়া দিবে, কত পোকা-মাকড়কে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগকে উপাদেয় খাদ্যে পরিতোষ করিবে, কত ভৃঙ্গ, প্রজাপতি ও মৌমাছি মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া নানা নৃত্যভঙ্গে উড়িতে উড়িতে গোলাপের নিকট সমাগত হইবে এবং গোলাপ ইহাদিগের দ্বারা পরোক্ষভাবে নিজ বংশ বর্দ্ধনের উপায় করিয়া লইবে, ও ফুল কি ছিঁড়িতে আছে?

আমাদের পাঠকদের অনেকের স্মরণ থাকিলেও থাকিতে পারে, "পুষ্প-তত্ত্ব" পাঠে আমরা জানিয়াছিলাম যে, কোন ফুল মানুষের মন ভুলাইবার জন্য বা তাহার প্রাণে ক্ষণিক সুখের সঞ্চার করিবার নিমিত্ত শাখাগ্রে মুকুলিত বা প্রস্ফুটিত হয় না। ফুল

গাছে ফুটে, কেবল তাহার নিজের জন্য। আমরা আজ এই সম্মুখস্থ গোলাপটি তুলিয়া লই। গন্ধ আঘ্রাণ করিবার জন্য নয়, বুকের উপর রাখিবার জন্যও নয়, বাবুগিরির গিল্টি পরিবার জন্যও নয়। তবে কি? না, গোলাপ ফুলটি কি তাহাই জানিবার জন্য, গোলাপের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য। আমার হাতের এই গোলাপটি অসাধারণ গোলাপ জাতীয় নহে। একটি সাধারণ, যা সচরাচর পাওয়া যায় সেই গোলাপের গোলাপ। সর্ব্বাগ্রেই জানিতে পারা যাইতেছে গোলাপ সবৃন্তক। কেন না লম্বা ডাঁটার উপরে পাবড়িগুলি ফুটিয়া রহিয়াছে। বৃন্তটি সকণ্টক। গোলাপ গাছ যেমন কণ্টকী, ফুলের ডাঁটার গায়েও কাঁটার মত সরু সরু রোঁয়া রহিয়াছে। কাঁটাযুক্ত গাছেরি যে সকণ্টক বৃন্তবিশিষ্ট ফুল হইতে হয় এমত নহে। অসহায় গাছ পালা ফুলগুলি আত্ম রক্ষার্থ ও তদ্দারা স্ব স্ব বংশ রক্ষার জন্য কাঁটা প্রভৃতি আত্মরক্ষণোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করে। আমাদের গোলাপ অনেকটা 'সাজোয়া পরা' ও 'পাঁচি হাতিয়ার ধরা' শ্রেণীয়। বৃন্তটি খানিক উঠিয়া একটু স্থূল আয়তন হইয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একটি অফুটন্ত ফুল দেখিলে দেখা যায় যে এই পাঁচটি হরিৎ অংশ আদত পাবড়িগুলিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বাস্তবিকই কোরক সময়ে এই হরিৎ পাবড়িগুলি বরফ জল হিম পোকা প্রভৃতি অনিষ্টকর কারণ হইতে পুষ্পকে রক্ষা করে। ইহারাই গোলাপের Sepals('বৃতি'); সমুদয় গুলিকে এক সঙ্গে Calyx (কুণ্ড') বলে। কুণ্ডাবর্ত্তের উপরেই রঞ্জিতাবর্ত্ত বা আদত পাবড়ি। কুণ্ডাবর্ত্ত, রঞ্জিতাবর্ত্ত (বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'স্রক্' Corolla) এবং পুংকেসরের সংখ্যার অতি চমৎকার সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। সচরাচর অনেক পুষ্পের বৃতির সংখ্যা তিন হইতে চার বা পাঁচ। রঞ্জিত পাবড়ি বা স্রকের সংখ্যাও প্রায় অনেক সময়ে বৃতির সমান অথবা উহার দুই কি তিন অথবা ততোধিক গুণ। পুংকেসরও সংখ্যা সম্বন্ধে কখন বা বৃতির ও স্রগের সম সংখ্যাবাচক হয়, অথবা উহাদের দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ অথবা অধিকতর গুণনীয় হয়। একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ উবুড় করিয়া ধরিলে পাঁচটি বড় বড় সমায়তনবিশিষ্ট পাবড়ি (petals) লক্ষিত হয়। কিন্তু এই পাঁচটি ভিন্ন গোলাপের আরো অনেক পাবড়ি আছে। যদি পাঠকেরা একটু শ্রম স্বীকার করিয়া আস্তে আস্তে একটি একটি পাবড়ি খসাইয়া লইয়া, সব পাবড়িগুলি বাহির করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, পাবড়ি গুলি পাঁচের কোন-না-কোন গুণনীয়। যে ফুলটি আমার হাতে রহিয়াছে ইহাতে পঁইত্রিশটি পাবড়ি আছে; অধোদেশ হইতে উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত পাবড়ি গুলির আয়তন ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া আসিয়াছে। কেসর সন্নিহিত পাবড়ি গুলি সাধারণ পাবড়ি হইতে এত স্বতন্ত্র যে সে গুলিকে পাবড়ি বলা যাইবে কি কেসর বলা যাইবে ইহাই মীমাংসা স্থলীয়। বস্তুতঃ একটু অনুসন্ধান

করিলেই দেখা যাইবে কেসর সন্নিহিত আকুঞ্চমান, শীর্ণ, অপূর্ণ পাবড়ির মধ্যে কতকগুলি পরাগ কোষ সংযুক্ত। গোলাপের এই দুই চারিটি-পরাগ-কোষ সমন্বিত অসাধারণ পাবড়ি হইতে আমরা একটি চমৎকার তত্ত্ব শিক্ষা করি। উদ্ভিদ্‌বিদেরা বলেন কাণ্ড ও শাখা সংলগ্ন বৃক্ষের যাবতীয় অঙ্গ হয় পত্র আর না হয় পত্রের রূপান্তর মাত্র। পাতার এক প্রকার রূপান্তরিত অবস্থাই ফুল। ফুলের সমুদয় অঙ্গ গুলি ইত্যাদি 'বৃতি' পাবড়ি, পুংকেসর, স্ত্রী কেসর ইত্যাদি—পত্রের রূপভেদ মাত্র। এই জন্য ইহাঁরা পত্রকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর নাম Foliage leaves সবুজপত্র, অন্যটির নাম Flower leaves পুষ্প পত্র। সবুজপত্রও যা আর সাধারণতঃ গাছের পাতাও তাই। পুষ্পের সমুদয় বিভিন্ন অঙ্গগুলির সাধারণ একটি নাম পুষ্প-পত্র। পত্র মাত্রেরই দুই প্রকার কার্য্য—nutrition (পরিপোষকতা) ও Reproduction (উৎপাদকতা)। কিন্তু তরুলতার আহার সংগ্রহ করা এবং তাহাদিগের পুষ্টি সাধন করাই সবুজ-পত্রের প্রধানতম কার্য্য আর পুষ্প পত্র গুলির মিলিত কার্য্য বংশোৎপাদনের সহায়তা করা। পোষণক্রিয়া অপেক্ষা উৎপাদন-কার্য্য অধিকতর জটিল। এবং সেই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্যই পুষ্প-পত্র সবুজ-পত্র অপেক্ষা নানা প্রকার অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পাতা হইতেই যে বৃতি,পাবড়ি পুংকেসর স্ত্রীকেসর উদ্ভূত হইয়াছে তাহার প্রমাণ গোলাপের এই পরাগ-কোষ বিশিষ্ট পাবড়ি গুলি হইতেই পাওয়া যায়। পাবড়ি হইতে কেসর কি কেসর হইতে পাবড়ি উৎপন্ন হয় এ বিষয়ে যদিও এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই তথাপি গোলাপের এই পাবড়িগুলি দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, প্রকৃতি মধ্যে পাবড়ি হইতে কেসর অথবা কেসর হইতে পাবড়ি এইরূপ এক কার্য্য অবিরাম চলিতেছে। আমরা গোলাপের এই উদাহরণ হইতে আর অন্যান্য কতকগুলি ঘটনা হইতে ইহাও অনুমান করিতে পারি যে বৃতি হইতে পাবড়ি কিম্বা পাবড়ি হইতে বৃতি উৎপন্ন হয়। গোলাপের উল্লিখিত পাবড়িগুলি একটি মধ্য অবস্থা। যদি পাবড়ি হইতে কেসর হয়, কালে এগুলি কেসরই হইবে। আর যদি উহার বিপরীত হয়, তবে এই বলা যাইবে যে, এগুলি পূর্ব্বে কেসর ছিল ক্রমে ক্রমে পাবড়ির মতন হইয়া আসিতেছে, সময়ে প্রকৃত পাবড়িই হইবে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আরও এমন অনেক ফুল পাওয়া যায় যাহারা এইরূপ একটি আধটি মধ্যপথবর্ত্তী অঙ্গ উদ্ভাবন করিয়াছে। এক রকম গাছ আছে সেগুলি দেখিতে হলুদ গাছের মতন। তবে হলুদ গাছ অপেক্ষা বড়। সচরাচর যেখানে সেখানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজদের প্রাঙ্গণ সংলগ্ন ক্ষুদ্র উদ্যানের মধ্যে সেগুলি যত্নে রাখিতে দেখা যায়। ইডেন গার্ডেনে প্রচুর আছে। গার্ডেনে বেড়াইতে আসিলে পাঠকেরা প্রায় যেখানে সেখানে হলুদ গাছের পাতার মতন চওড়া

চওড়া লম্বা লম্বা পাতাযুক্ত এই গাছ দেখিতে পাইবেন। গোলাপের যেমন নানা রকমের ফুল হয় এদেরও হরিদ্রা-লাল পিঙ্গল, গোলাপী-লাল প্রভৃতি নানা বর্ণের ফুল হয়। এই ফুলগুলির কোনটিরই প্রকৃত পুংকেসর নাই। মধ্যস্থলের একটি সরু গোছের পাবড়ির একপার্শ্বে পুষ্প-রেণু কোষ-মধ্যে অবস্থান করে। ফলতঃ এই পাবড়ি-টিই এই ফুলের সম্বন্ধে পুংকেসরের কার্য্য করে। কিন্তু কেসরের কোন অংশই তেমন পরিষ্কাররূপে লক্ষিত হয় না।

স্ত্রী কেসরটিও একটি পাবড়ি। তবে এই পাবড়িটি অপরগুলি অপেক্ষা পুরু, সরু এবং মসৃণ। এবং ইহারি শিরোভাগে স্ত্রী কেসর সুলভ সেই বিশেষ নিদর্শনটি—'চটচটে অংশ'—দেখিয়া স্ত্রী-কেসর বলিয়া ঠাওরাইয়া লইতে হয়।

গোলাপের পাবড়ি প্রস্ফুটিত হইলে পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খসিয়া যায়। এইরূপ অল্পকাল স্থায়ী পাবড়িদিগকে diciduous (অস্থায়ী) বলে। যে গাছটি হইতে এই ফুলটি তুলিয়া লইয়াছি সেই গাছের অপর একটি ডালে দেখি পাবড়ি খসিয়া গিয়াছে অথচ বৃতিগুলি রহিয়াছে এমন একটি গোলাপের ফল পরিপুষ্ট হইতেছে। পাবড়ি পরিচ্যুত পুষ্টমান ফলটির বৃতিগুলির সবুজ বর্ণের কিঞ্চিমাত্র বিকৃতি হয় নাই। দেখা যায় যে, ফলের পরিপক্ক, শুষ্ক ও বৃন্তচ্যুত হওন পর্য্যন্ত বৃতিগুলি অবিকৃতাকারে সংলগ্ন থাকে। এইরূপ বৃতিকে persistent বৃতি বলে। আবার অনেক ফুলের পাবড়িগুলি ফুটিতে না ফুটিতেই বৃতিগুলি আপনাদের কাজ করিয়া পড়িয়া যায়। যেমন পোস্তফুল। সাধারণতঃ ফুলের বৃতিগুলি দুই প্রকারের হয়—'সংলিপ্ত' অসংলিপ্ত। গোলাপের বৃতিগুলি দেখিলেই বোধ হয় যেন শেষোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ অসংলিপ্ত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। একটি ফুলকে লম্বালম্বি কাটিয়া ফেলিলেই দেখা যাইবে, স্বতন্ত্র বৃতিগুলি কুণ্ড-নলের (calyx tube) উপরে বসান রহিয়াছে মাত্র। বিভক্ত অংশগুলিকে পণ্ডিতেরা কুণ্ড-নলের 'অঙ্গ' বলিয়া থাকেন। সরীষা ফুলের বৃতি সম্পূর্ণরূপে অসংলিপ্ত। উদ্ভিদবেত্তারা বৃতি ও পাবড়ির অবস্থান ও আয়তন ভেদে আরও নানা প্রকারের নাম দিয়া থাকেন। কেসর ও বীজাধারের সম্বন্ধেও সেইরূপ। কিন্তু আমরা এ সব অপেক্ষাকৃত জটিল, সুতরাং নীরস, শব্দ লইয়া আর যেয়াদা মাথা বকাইব না।

অপরাপর অনেক ফুলের মত গোলাপ Hermaphrodite অর্থাৎ ইহার একটি ফুলেই পুরুষ ও স্ত্রী ইন্দ্রিয় পরিজ্ঞাপক অঙ্গ লক্ষিত হয়। পুংকেসর মণ্ডলের মধ্যে স্ত্রী কেসরগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। পুংকেসরগুলি কুণ্ডনলের উপরিদেশে সংস্থাপিত, স্ত্রীকেসরগুলি কুণ্ড-নলের অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইয়া, স্ব স্ব 'চিহ্নকে' সমুন্নত রাখিয়া কুণ্ডনলের গলদেশ ছাড়াইয়া পুষ্পের কেন্দ্রস্থানকে পরিশোভিত করিতেছে। পাঠক, যদি ফুটন্ত ফুলের উপর মৌমাছির উপদ্রব দেখিতে চাও, তবে ঐ অর্দ্ধ বিক-

সিত গোলাপটির পানে দেখ। দুটি মৌমাছিতে পড়িয়া কিরূপে গোলাপের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে। মৌমাছিরা মধুপানে যেন মত্ত হইয়া গোলাপের উপর মত্ততার নৃত্য নাচিতেছে। অস্থির—সম্পূর্ণরূপে অস্থির। কখন কতকগুলা পুষ্প-রেণু গায়ে মাখিতেছে, কতকগুলা বা খাইতেছে, কতক বা সংগ্রহ করিতেছে। আবার দেখ পুষ্পরেণু মাখা অঙ্গে উহারা স্ত্রী কেসরদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আপনাদিগকে উহাদের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। আমার এই হাতের ফুলটিতে দেখি, চিহ্ন গুলির উপরে কতক পুষ্পরেণু লাগিয়া রহিয়াছে। নিশ্চয়ই আমরা এখন বলিতে পারি, ইহার মধুভাণ্ড লুণ্ঠন করিবার সময় মৌমাছিরা এইরূপে ইহাকেও নিষেকিত করিয়াছে। এটি যদি আমরা ছিঁড়িয়া না লইতাম [তাহা হইলে সপ্তাহের মধ্যে একটি ফনেলের 'মুখ চওড়া ও নীচে সরু চোঙ্গার) আকারের মতন ফল হইত।

আমরা পূর্ব্বে গোলাপের 'ফল' একটি পরিপুষ্ট হইতেছে এরূপ উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। গোলাপের আবার ফল, আবার তাহা হইতে গোলাপ গাছ হয়ত অনেকের কাণে ইহা কেমন এক রকম লাগিতে পারে। কিন্তু কাণের সন্তোষের জন্য প্রাকৃতিক সত্যের ত অপলোপ করা উচিত নয়। ফুটন্ত গোলাপটি হাতে লইয়াই আমরা দেখিয়াছি বৃন্তটি কিয়দ্দূর উঠিয়া একটু স্থূলাকার হইয়া ক্রমে পাবড়ির আধার হইয়াছে। এই স্থূলায়তনটিই গোলাপের বীজাধার। গোলাপের বিচিগুলি এই বীজাধারের অভ্যন্তরে থাকিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। ঐ পুষ্টমান ফলটিকে তুলিয়া লই এবং ছুরিকা দ্বারা লম্বালম্বি চিরিয়া ফেলি। পাঠক, দেখিতেছ কত রোমশ বীজ। তুলার মতন সংলিপ্ত আবরণগুলি ছাড়াইয়া লও ভিতরে গোলাপের দানা দেখিতে পাইবে। আতার কিম্বা জামের শাঁস টুকু খাইয়া যে বিচিটি ফেলিয়া দাও সেই প্রকারের বিচিই এই রোমশ কোষের মধ্যে রহিয়াছে। বস্তুতঃ, আতা কিম্বা জামের সঙ্গে গোলাপের বিভিন্নতা অত্যন্ত অল্প। মূলগত ভেদ নাই বলিলেই হয়। কেবল সময় এবং ভিন্ন অবস্থা আমাদের এই গোলাপকে ঈদৃশ অভুক্ত ফলরূপে পরিণত করিয়াছে আর আতা এরূপ সরল সুমিষ্ট উপাদেয় ফল হইয়াছে। গোলাপ এবং আতা কিম্বা জাম এক শ্রেণীর হইয়াও কেন ঈদৃশ অবস্থান্তর হইল তৎ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

আজ কাল কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা অনেক তরু লতা উৎপাদন করিতেছি। কিন্তু সেই অতি আদিম কালে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই তরু লতার বংশ রক্ষার একমাত্র হেতু ছিল। মধু-লোভী ভৃঙ্গ, প্রজাপতি, মৌমাছি, অথবা সুমিষ্ট ফল প্রিয় পক্ষীপতঙ্গমের রসনা পরিতৃপ্ত করিতে না-পারিলে দীর্ঘকাল বংশ রক্ষা করা উহাদিগের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব হইত না। যে উদ্ভিদ যত অধিক পরিমাণে

পোকা মাকড়দের মন যোগাইতে পারিয়াছে, সেই অপরাপর তরুলতা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক-কাল ধরিয়া দূরতম অতীত হইতে নিকটতম বর্ত্তমানে আপনার বংশকে উত্তর জীবী করিতে পারিয়াছে। বস্তুতঃ সমুদয় রসাল সুমিষ্ট ও স্বাদু ফল—যাহা আমরা কত আদর ও তৃপ্তির সহিত আহার করি, কত যত্নে বাগানে রোপণ করি, কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া উন্নত জ্ঞান-বলে কলম কাটিয়া নানা কৌশলে এক জল হাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত গাছকে (অনেক স্থলে কেবল উপভোগ ও বিলাসের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য) বিজাতীয় জল হাওয়ার মধ্যে জন্মাইতেছি, এই সমুদয় সরস ও সুমিষ্ট ফল এককালে স্ব স্ব বংশ রক্ষার জন্যই স্বাদু ফল লোভী পক্ষী পতঙ্গের প্রিয় হইবার নিমিত্ত মিষ্টতা সরসতা স্বাদুতা উৎপাদন করিয়াছে! ফুলের সুগন্ধ সুষমা যেরূপ ক্ষুদ্রতর কীটদের জন্য,ফলের স্বাদুতা ও মিষ্টতা আবার সেইরূপ সেই আদিম কালের পক্ষী পতঙ্গের জন্য।

মনেকর খুব আদিম কালে গোলাপ জাতীয় কোন বৃক্ষ সমজাতীয় অপরাপর বৃক্ষ অপেক্ষা অধিকতর শাঁসল ফল উৎপাদন করিল। পাখীরা নীরস ফল ছাড়িয়া অগ্রে এই শাঁসল ফলই খাইবে এবং উদরে ফলের বীজ ধারণ করিয়া নানা স্থানে চলিয়া যাইবে। ফলের আঁটি কঠিনতম পদার্থ, সহজে হজম হইবার নহে, আর সেই আঁটির অভ্যন্তরেই ভাবী বৃক্ষের সমুদয় উপকরণ নিহিত থাকে। এইরূপে দেশ দেশান্তরে সেই অপেক্ষাকৃত সমধিক শাঁসল ফলবান গোলাপ জাতীয় বৃক্ষের অংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। পক্ষীদের দ্বারা এইরূপ উপকৃত হইবে এই নিমিত্ত বৃক্ষেরা (জানিয়া শুনিয়া না হইতে পারে, কিন্তু কেমন স্বভাবতঃ) আরও সরস ও মিষ্ট ফলোৎপাদনের জন্য যত্ন করে। আর যাহারা অধিকতর রসাল শাঁসল ফল প্রসব করে তাহারাই পক্ষীদের অনুগ্রহে উত্তর জীবীতা লাভ করে। এই জন্যই বিলাতী বেরী (Strauberry Rapsberry ইত্যাদি) ইহারা সকলে গোলাপ জাতীয় হইলেও, পোটেন্টিলা অপেক্ষা কতদূর দূরদেশ ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। পোটেন্টিলারা গোলাপ জাতীয় তাবৎ বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে অত্যন্ত প্রাচীনতম ও আদিমতম ধরণের, পোটেন্টিলারও ফল হয় কিন্তু সে ফল শাঁসল নয়, মিষ্ট নয়। এই জন্য কেহই সে ফল খায় না। গাছের ফল গাছেই শুকাইয়া যায়। তবে দেখ বেরী শাঁসল রসাল সুমিষ্ট ফল উৎপাদন করিতে পারিয়াছে বলিয়াই আজ উদ্ভিদ জগতে নানা দেশ ব্যাপিয়া এমন করিয়া রাজত্ব করিতেছে। আমাদের সুগন্ধ গোলাপ রসাল ফলোৎপাদন করিতে পারে নাই বটে কিন্তু এমন সুগন্ধ বিস্তার করিতে কেহ জানিত না। গোলাপ তাহার চিত্তমোহন কারী সদ্গন্ধের জন্যই উত্তরজীবিত্ব লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন মনুষ্যেরা এত বিলাসীছিল না, যখন আতরের বা গোলাপ জলের ব্যবহার মনুষ্যে অবিদিত ছিল, তখন গোলাপ স্বীয় রূপের ছটায়, সদ্গন্ধে ও মধুর মিষ্টতায় ভৃঙ্গ, প্রজা-

পতি মৌমাছি প্রভৃতিকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। তার পর যখন বিলাসী মনুষ্য গোলাপকে আপনাদের বিলাসের ক্রীড়াবস্তু বলিয়া মনে করিয়া লইল, তখন গোলাপ সঙ্কীর্ণ স্থান ছাড়িয়া, বিলাসিতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানা স্থানে, উষ্ণ কি শীত প্রধান, দেশ-নির্ব্বিশেষে ছড়াইয়া পড়িল। এখন আমরা কলম করিয়া গোলাপ গাছ জন্মাইতে শিখিয়াছি। গোলাপের বিচির অপেক্ষা করি না। তাই গোলাপের বিচি ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া আসিতেছে। আমরা এই যে রোমশ বিচিগুলি এমন অপূর্ণাবস্থায় দেখিতেছি প্রাচীনকালে বায়ু সঞ্চালনে অথবা অপর কোন গতিমান বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে ইহারাই পরিপক্কাবস্থায় স্থান বিশেষে দেশ বিশেষে নিক্ষিপ্ত হইয়া গোলাপ গাছ হইয়াছে। কৃত্রিম নির্ব্বাচনের সঙ্গে অনেক প্রকার প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অন্যতর আবিষ্কর্ত্তা ওয়ালেস বলিয়াছিলেন যে আমরা অনুমান করিতে পারি এমন সময় আসিবে যখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে তরু লতা জীব জন্তুদের মধ্যে কেবল কৃত্রিম নির্ব্বাচন প্রথাই শাসন করিবে। দ্রব্যাদিগের গুণাগুণ ও আবশ্যকীয়তা-নাবশ্যকীয়তা, সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম নির্ব্বাচন প্রথা এত বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে ও হইয়া পড়িতেছে যে কালে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন উদ্ভিদ ও জীবরাজ্যের মধ্যে ভূপৃষ্ঠে কার্য্য করিতে নিরস্ত হইবে। এবং (যেমন ওয়ালেস আরও বলিয়াছেন) সমুদ্রগর্ভই একমাত্র স্থান থাকিবে যেখানে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অনাগত কাল ব্যাপিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে।

বিলাতে ছাত্রজীবন।

আমাদিগের দেশের কেহ কেহ তাঁহাদিগের বিলাত সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে, মাসিক পত্রিকায়, ও সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বিলাতের অবস্থা, বিলাতের লোকের আচার ব্যবহার, বিলাতে শয়ন ভোজন উপবেশনাদির ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়ার এদেশে যে কৌতূহল আছে কিয়ৎপরিমাণে তাহার তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন আবার অনেকে পত্রে লিখিয়া কিম্বা মুখে গল্প করিয়া তাঁহাদিগের বন্ধুবান্ধবদিগকে বিলাত সম্বন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত করা-

হইয়াছেন, আবার এই সকল ব্যক্তিরা বিলাত সম্বন্ধে যাহা যাহা পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন তাঁহারা তাহা তাহা তাঁহাদিগের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিকে, এমন কি হয়ত পথের আলাপীদিগকেও, বলিয়াছেন। এই রূপে হয়ত রামকৃষ্ণ ধোপাও শুনিয়াছে যে বিলাতের বড় সহর লণ্ডনে কখনও কখনও এত ধোঁয়া ও কুয়াশা হয় যে সেখানে সে সকল সময় দিনের বেলাতেও রাস্তা, ঘাট, বাট, মাঠ প্রভৃতি সকল স্থানেই আলোক জ্বালাইতে হয়; এখানে একটু বর্ণনার ভুল হইল, পাঠক পাঠিকাগণ স্ব স্ব গুণে তাহা ক্ষমা করিবেন, ভুলটী এই যে লণ্ডনে ঘাট প্রায়ই নাই, লণ্ডনের লোকেরা সাধারণতঃ আমাদিগের দেশের লোকের ন্যায় নদী, হ্রদ, সরোবর,পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা ইত্যাদি জলাশয়ে অবগাহন করিতে যান না, তাঁহারা স্ব স্ব আলয়ে শয়নাগারে কলের জল আনাইয়া অথবা স্নানাগারে কল হইতে জল লইয়া স্নান কার্য্য সমাধা করেন। এইরূপে আবার হয়ত পল্লীগ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হরেকৃষ্ণ রায় বাহাদুর মহাশয়ও শুনিয়াছেন যে বিলাতে একটী প্রধান সভা আছে, তাহার নাম পার্লেমেন্টো, সেখানে বড় বড় লোকে বড় বড় বক্তৃতা দেয়, সেখানে সকল রকম আইন তোয়ের করা হয়, সে সভার এত গৌরব যে আমাদিগের দেশের 'হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা' ছোট লাট বাহাদুরেরাও স্বদেশে ফিরিয়া যাইয়া সেখানকার সভ্য হওয়ার নিমিত্ত লালায়িত হয়েন। কিন্তু বিলাত সম্বন্ধে আমাদিগের দেশে অনেকের অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও এদেশে সাধারণ ভদ্র ও ইতর লোকদিগের সে দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান এত অল্প যে সময় সময় এই সকল লোকের নিকট বিলাতী দুই একটী এমন গল্পও শুনিতে পাওয়া যায় যে তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে মনে প্রচুর সন্দেহ উপস্থিত হয়। সুতরাং বিলাত সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকৃত ও জানিবার যোগ্য বিষয় বর্ণনা করা যাউক না কেন, তাহা বৃথায় বলা হইবে না। এদেশে এখনও বিলাতী গল্প শুনিতে লোকের ঐকান্তিক ইচ্ছা দেখা যায়, এখনও বিলাত হইতে প্রত্যাগত কোন লোক দেখিলে এদেশে অনেকে তাঁহাকে বিলাত সম্বন্ধে নানা রূপ কথা জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপ কৌতূহল স্বাভাবিক, কিন্তু কৌতূহলের দুই প্রকার উদ্দেশ্য হইতে পারে এক এই যে একটী নূতন গল্প শুনিয়া তৎক্ষণের নিমিত্ত আমোদ লাভ করা আর এক এই যে একটী বিষয়ের বর্ণনা শুনিয়া তাহা হইতে আমরা কি জ্ঞান ও উপদেশ লাভ করিতে পারি তাহা বিবেচনা করিয়া পরে সেই জ্ঞান ও উপদেশের সাহায্যে জীবনের গতি বিধি নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করা। আমরা দ্বিতীয় প্রকার উদ্দেশ্যবিশিষ্ট কৌতূহল নিবারণ করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান প্রবন্ধটী লিখিতেছি; ইহা পাঠ করিয়া যদি এ দেশীয় ছাত্রদিগের ও ছাত্রদিগের অভিভাবকদিগের যৎকিঞ্চিৎ উপকারও হয়, তাহা হইলে এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক দিন আমাদিগের জাহাজ লণ্ডনে পৌঁছিছিল; এক মাসেরও অধিক সমুদ্রের উপর থাকিয়া সমুদ্রের প্রতি আমার এক রকম বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল; এই সময়ের মধ্যে কেবল এক দিন স্থলে বেড়াইতে পাইয়াছিলাম, তাহাও আবার রাত্রে। এখন জাহাজ লণ্ডনে পৌঁছিলে পুনরায় আবার শক্ত মাটীর উপর পা দিতে পারিয়া মনে মনে আহ্লাদ হইল। জাহাজে যাত্রীগণের জিনিষ পত্র পৌঁছাইয়া দেওয়ার কাজ পাওয়ার অভিপ্রায়ে জাহাজে এক জন লোক আসিয়াছিলেন; আমার জিনিষ পত্র পৌঁছাইয়া দেওয়ার ভার এই ব্যক্তি লইলেন আর ইহা ভিন্ন আরও একটী ভার তিনি লইলেন। আমি যেখানে যাব, এই ব্যক্তি সেখানে আমায় পৌঁছাইয়া দিতে সম্মত হইলেন; আমি বিকালবেলা তাঁহার সঙ্গে চলিলাম, কোথায় কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইল তাহা এখন আমার দুই এক স্থানের একটু একটু আভাষ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে নাই। বিলাতের বড় বড় সার্সিওয়ালা, সুন্দর সুন্দর, বড় বড় দোকানগুলি দেখিতে বোধ হয় আমার ভালই লাগিয়াছিল, আর বিলাতের রাস্তায় জনতা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। সময় ক্রমে আমার যেখানে যাওয়ার কথা, সেখানে উপস্থিত হইলাম, সেখানে আমাদিগের দেশীয় একজনের সহিত দেখা হইল, তাঁহার সহিত আমার পূর্ব্বে আলাপ ছিল না কিন্তু আমি যাইতেছি এ সংবাদ তিনি পূর্ব্বে পাইয়াছিলেন আর আমার জন্য থাকিবার স্থান খুঁজিয়া দেওয়া, কোথায় কিরূপে চলিতে হইবে তাহা বলিয়া দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তিনি আমায় সাহায্য করেন তাঁহাকে এই অনুরোধ করা হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, এত দিন পরে একজন স্বদেশীয় লোকের মুখ দেখিতে পাইয়া, এত দিন পরে আমাদিগের নিজ ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিবার একজন লোক পাইয়া আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। ইঁহার সঙ্গে আমার বিকালে দেখা হয়, সন্ধ্যার সময় ইনি আমাকে আর একটী বাড়ীতে লইয়া গেলেন; এখানে আমার নিমিত্ত ঘর ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই বাড়ীতে যখন আসি, তখন দেখি বাড়ীর কাছে রাস্তায় একটা বাজ্না বাজাইতেছে; আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম ও কিসের বাজ্না, তিনি বলিলেন রাস্তায় অমনি করিয়া বাজ্না বাজায় আর লোকে তাহা শুনিয়া কিছু কিছু পয়সা দেয়। তখন বোধ হয় ও বাজ্না মন্দ লাগে নাই, কিন্তু তাহার পর অনেক সময় ঘরে বসিয়া পড়িতেছি আর রাস্তায় ঢং ঢং করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে ইহাতে বিরক্তি বোধ হইয়াছে। বাজনার যন্ত্রটা দেখিতে একটা বাক্সের মত, সাধারণতঃ এক একটা বাজনার সঙ্গে দুইজন করিয়া লোক থাকে, একজন বাজ্না বাজায় আর একজন পয়সা লইয়া বেড়ায়, কখনও কখনও বা একজন লোকই একটা ছোট যন্ত্র লইয়া বাজাইতে আইসে। এই সকল বাজ্না

ওয়ালারা অনেকে ইটালী দেশীয়, কিন্তু জার্ম্মাণি দেশীয় ও বোধ হয় ইংলণ্ড দেশীয়ও অনেক ওরূপ বাজানাওয়ালা ভিক্ষুক লণ্ডনে আছে। জার্ম্মাণি দেশীয় বাজ্‌না-ওয়ালারা দল বাঁধিয়া আইসে, তাহারা কয়েক রকম বাজ্‌না সঙ্গে লইয়া আইসে, রাস্তার একজায়গায় বাজাইয়া সেই রাস্তার দুই ধারে নিকটস্থ সমুদয় বাড়ীতে দুয়ারে ঘা মারিয়া বা ঘণ্টা বাজাইয়া পয়সা চাহিয়া বেড়ায়। দুয়ারে ঘা মারা বা ঘণ্টা বাজান এই কথা দুটীর অর্থ বোধ হয় এ দেশের কেহ কেহ না বুঝিতে পারেন; আমাদিগের দেশে যেমন খোলা দরওয়াজায় দরওয়ান বসিয়া থাকে, বিলাতে গৃহস্থ লোকের বাড়ীতে সে রূপ নহে। বিলাতে গৃহস্থ লোকের বাহিরের দ্বার সাধারণতঃ বন্ধ থাকে; দুয়ারে ঘা মারিয়া শব্দ করিবার নিমিত্ত তাহাতে দুইখান লৌহ খণ্ড লাগান থাকে, কেহ আসিলে দুই খণ্ড লৌহের এক খণ্ড দ্বারা অপর খণ্ড আঘাত করে; দুয়ারে আবার বাড়ীর মধ্যে ঘণ্টা বাজানর সুবিধাও আছে। ✕

যাহারা দল বাঁধিয়া বাজ্‌না বাজাইতে আইসে, তাহারা এই রূপে রাস্তার উপর বাড়ী গুলির লোককে ডাকিয়া পয়সা লয় আর উপরে যে একটা বাজনার সঙ্গে দুজন কি একজন লোক থাকে বলা হইয়াছে, সে সকল লোকেরা বাড়ীতে ওরকম শব্দ করিয়া ডাকিয়া লোকের নিকট পয়সা লয় না, আপনা হইতে কেহ পয়সা দিতে আসিলে লয়। তাহারা অনেকে বাড়ীর নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, হয়ত জানালার নিকট কাহাকে দেখিতে পাইলে তাহাকে একরকম সেলাম করে, এইরূপ করিয়া যদি তাহারা পয়সা আদায় করিতে পারে ভালই, যদি না পারে, তবে হয় অন্য কোন বাড়ীতে যায় আর না হয় তাহাদিগের এক মহাস্ত্র আছে তাহা ব্যবহার করিতে পারে। মহাস্ত্রটী এই, বাড়ীর নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজান; এরূপ অবস্থায় হয়ত বাজ্‌না-আক্রান্ত গৃহের অধিবাসীরা বাদ্যধ্বনি সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বাজ্‌নাওয়ালাকে কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দেয়। ভিখারী বাজ্‌নাওয়ালাদিগকে লণ্ডনে লোকে সাধারণতঃ এক পেনি কি আধ পেনি দেয়, এক পেনি দেখিতে আমাদিগের দেশের একটা ডবল্‌ পয়সার মত। এই এক আধ পেনি লোকে অনেক সময় ঘর হইতে রাস্তায় ফেলিয়া দেয়, বাজ্‌নাওয়ালারা যেখানে থাকে সেখানে ফেলিয়া দেয়, আর তাহারা উহা কুড়াইয়া লয়। যাহা হউক আমি এখানে এরকম বিষয়ে অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া লণ্ডনে আমার প্রথম দিনটার সম্বন্ধে আর কয়েকটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয়ে উপস্থিত হইতেছি। আমার বন্ধু আমাকে যে বাড়ীতে লইয়া গেলেন সেবাড়ীতে একতালায় আমি দুইটী ঘর পাইলাম, একটী বসিবার ঘর আর একটী শুইবার ঘর। বসিবার ঘরে খাওয়া, পড়া, বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করা ইত্যাদি কাজ করা হয়, আর শুইবার ঘরে স্নান করা, হাত মুখ ধোওয়া, আর শোওয়া এই সব রকম কাজ

করা হয়। যে সকল বাড়ীতে আলাহিদা স্নানের ঘর আছে, সে সকল বাড়ীতে হয়ত শোওয়ার ঘরে স্নান করা আবশ্যক না হইলেও পারে। তবে লণ্ডনের সাধারণ গৃহস্থ লোকদিগের বাড়ীতে স্নানের ঘর আলাহিদা প্রায়ইত দেখা যায় না; তবে যাহাদিগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল তাহাদিগের বাড়ীতে, বিশেষতঃ এই সকল ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত আজ কাল যে সকল নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে সে সকল বাড়ীতে, স্নানের ঘর আলাহিদা থাকিতে পারে। সে যাহা হউক, আমি বসিবার ঘরে বসিলাম, ঘরের চেয়ার, টেবিল্, কৌচ্ প্রভৃতি দেখিয়া, ঘরের সজ্জা দেখিয়া সন্তুষ্টই হইলাম। লণ্ডনে সাধারণ মধ্যবিৎ অবস্থার লোকদিগের বাড়ীগুলিও সুন্দর রূপে সাজান, ঘরগুলির মেজিয়ায় কার্পেট পাতা, আর দেওয়ালে চিত্রকরা রঙ্গিন কাগজ আঁটা; ঘরগুলির মধ্যে ছাদে কড়িকাঠ দেখা যায় না। সাধারণতঃ ঘরের মাঝখানে টেবিল পাতা থাকে আর টেবিলের উপর একখানা পশমি (অথবা সুতার রঙ্গিন) কাপড় দেওয়া থাকে। ছাদ হইতে টেবিলের কিছু উপরে গ্যাসের আলোক জ্বালাইবার একটী ঝাড়ের মত ধাতুনির্ম্মিত জিনিষ ঝুলিয়া থাকে, গ্যাসের আলোক জ্বালাইবার জন্য ঐ জিনিষের উপর কয়েকটা গোলাকার কাচের পাত্র আছে; লোকে সচরাচর এইরূপ দুটী পাত্রে আলোক জ্বালাইলেই যথেষ্ট মনে করে। টেবিল ছাড়া বসিবার ঘরে আর এই কয়েকটী সরঞ্জাম দেখা যায়, কয়েক খান্ সাধারণ চেয়ার, একখান আরামের চেয়ার, একখান কৌচ্, আর হয়ত একটা ছোট আল্‌মারি, ইহা ভিন্ন আরও অনেক জিনিষ থাকিতে পারে। আরামের চেয়ারের পায়া গুলি ছোট, তাহাতে নরম উচ্চ গদি দেওয়া আর তাহাতে হেলান দিয়া, হাত পা মেলাইয়া বসিবার সুবিধা করা আছে; সাধারণ চেয়ার গুলিতেও একরকম গদি দেওয়া থাকে। বসিবার ঘরে যে স্থানে আগুণ জ্বালানর বন্দোবস্ত, সে স্থানে মেজিয়ার কতক অংশ দশ, বার অঙ্গুলি উচ্চ লৌহের জিনিষ দিয়া ঘেরা, আর সে স্থানে মেজিয়া হইতে আড়াই হাত কি তিন হাত উপরে দেওয়ালের গায়ে একটা মার্ব্বল্ কি অন্য কোন জিনিষের এক খান তক্তা মত লাগান থাকে; এই তক্তার উপরে দেওয়ালে এক খানা প্রকাণ্ড আয়না বসান থাকে; তক্তা খানির উপর ঘড়ি, ছোট রকমের কাচের বা মাটীর পাত্র, পুতুল ইত্যাদি অনেক রকম সামগ্রী সুন্দর রূপে সাজান থাকে; মাটীর পাত্রগুলিতে রং দেওয়া, কাচের পাত্র গুলি রঙ্গিনও হইতে পারে, সাদাও হইতে পারে। আমি আমার বসিবার ঘরেও এই রকম সরঞ্জাম দেখিলাম; তখনও বরফ পড়িতে আরম্ভ হয় নাই, সুতরাং আগুণ জ্বালাইবার উননটী তখনও ঢাকা রহিয়াছে। বাড়ীর গৃহিনী আসিয়া আমার সহিত কথা কহিলেন, কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা আমার এখন কিছুই ভাল মনে নাই। সে বাড়ীতে একজন আমাদিগের দেশীয় লোক থাকিতেন, তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না,

রাত্রে তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইল। তিনি ও আমার উল্লিখিত বন্ধুটী এই দুই জনে কয়েক দিনের মধ্যে আমার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; আমি কলেজে যাইতে আরম্ভ করিলাম। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কলেজে আমি প্রবিষ্ট হইলাম, সেখানে কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে ছাত্রেরাই বা কি রকমে চলে এই প্রবন্ধে এই দুই বিষয়ের বর্ণনা করা হইতেছে। এই কলেজে কাব্য ও আইন, বিজ্ঞান ও এঞ্জিনীয়ারিং, আর চিকিৎসা বিদ্যা এই কয়টী বিভাগ। কাব্য বিভাগে গ্রীক, লাটিন, ইতালী, ফরাসি, জার্মান ও ইংরেজী এই কয়টী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়; ইহা ভিন্ন সংস্কৃত, আরবী, পারসী ও চীন দেশীয় ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে, আর গত বৎসর আমি দেখিয়া আসিয়াছিলাম যে বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি আমাদিগের দেশের কতকগুলি প্রচলিত ভাষাও শিক্ষা দেওয়ার উদ্‌যোগ হইতেছে। কাব্য বিভাগে সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান ও দর্শন, বার্ত্তাশাস্ত্র, অঙ্ক ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়; কলেজে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত একটী বিভাগ আছে, সেটী কাব্য-বিভাগের অঙ্গ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান বিভাগে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্‌ভিদ-বিজ্ঞান, জন্তু বিজ্ঞান, জীব-প্রক্রিয়া-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান এই কয়টি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। বিজ্ঞানের অনেক ছাত্র অঙ্ক, আর বিজ্ঞানের কোন কোন ছাত্র মনোবিজ্ঞান ও দর্শন, আর বার্ত্তাশাস্ত্র এই কয়টী বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে। চিকিৎসাবিদ্যা বিভাগে দেহবিজ্ঞান, জীব-প্রক্রিয়া-বিজ্ঞান, ঔষধচিকিৎসা, অস্ত্র-চিকিৎসা ইত্যাদি অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। রসায়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, জন্তু-বিজ্ঞান, জীব-প্রক্রিয়া বিজ্ঞান এই কয়টী বিষয়ের শ্রেণীগুলি বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যা এইদুই বিভাগেরই অন্তর্গত; চিকিৎসা-বিদ্যা বিভাগের অনেক ছাত্র পদার্থ বিজ্ঞানের উপদেশ বক্তৃতা শুনিতে আইসে। চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত ও রোগীদিগের চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত এই কলেজের সংস্রবে একটী হস্‌পিট্যাল্ আছে। এঞ্জিনীয়ারিং বিজ্ঞান বিভাগের অন্তর্গত, ইহাতে নানারকম কলের ও অন্যান্য কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়; বিজ্ঞান বিভাগের আর একটী শাখা আছে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প কার্য্যে যে যে বিশেষ রাসায়নিক জ্ঞান আবশ্যক করে সে সমুদয়ের উপদেশ দেওয়া হয়। এই কলেজের অন্তর্গত একটী স্কুল আছে, সেখানে অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়; কত বয়স পর্যন্ত এই স্কুলে লোকে পড়িতে পারে তাহা আমি এখন ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় উনিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লোকে এই স্কুলের ছাত্র হইতে পারে। কলেজে ছাত্রেরা যে বয়স ইচ্ছা সেই বয়সেই প্রবিষ্ট হইতে পারে, কলেজে চিকিৎসা বিদ্যা বিভাগ ভিন্ন অন্য সমুদয় বিভাগেই বোধ হয় স্ত্রীলোকেরা ছাত্রী হইতে পারেন। এই কলেজের হস্‌পিট্যালে

স্ত্রীলোকেরা ছাত্রী হইতে পারেন কিনা তাহা আমি নিশ্চয় জানি না। ছাত্রদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত কলেজের সংস্রবে একটী বাস-স্থান আছে, কলেজের একজন অধ্যাপক তাহার তত্ত্বাবধান করেন; কলেজের ছাত্র-দিগের মধ্যে যাহাদিগের ইচ্ছা হয়, তাহারা এই স্থানে বাস করিতে পারে, কিন্তু কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই প্রায় নিজ নিজ ইচ্ছামত বাড়ীতে বাস করে। এই সকল ছাত্রদিগের লণ্ডনে নিজের বাড়ী থাকে ভালই, আর তাহা না হইলে তাহারা কোন বাড়ীতে দুইটী কি একটী ঘর লইয়া থাকে। কলেজের সংস্রবে ছাত্রদিগের যেমন একটী বাস স্থান আছে, ছাত্রী-দিগের নিমিত্তও সেইরূপ একটী বাসস্থান হইতেছে ইহা আমি গত বৎসর শুনিয়া আসিয়াছিলাম। কলেজে ছাত্রদিগের শীত ও গ্রীষ্মকালের গায়ের বড় কোট ছাতা ব্যাগ ইত্যাদি জিনিষ রাখিবার ঘর আছে, হাত মুখ ধুইবার ঘর আছে, তামাক খাইবার ঘর আছে, খাওয়ার ঘর আছে, পড়িবার জন্য একটা বড় সাধারণ লাইব্রেরী আর একটা ছোট চিকিৎসাবিদ্যার লাইব্রেরী আছে। এইরূপে কলেজে উপদেশ-বক্তৃতার ঘরে, খাওয়ার ঘরে পড়িবার ঘরে ইত্যাদি নানা-স্থানে এক সঙ্গে থাকিতে পাইয়া ছাত্র-দিগের মধ্যে পরস্পর বন্ধুতা সংস্থাপন করিবার বিলক্ষণ সুবিধা আছে।

এখন এই কলেজের শিক্ষা প্রণালী বর্ণনা করা যাইতেছে। আমরা এখানে কেবল বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষা প্রণালী বর্ণনা করিতেছি; যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে, সে বিষয়ে তাহার অধ্যাপক উপ-দেশ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই উপ-দেশ বক্তৃতা সাধারণতঃ সপ্তাহের মধ্যে সোম হইতে শুক্রবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া দেওয়া হয়, যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় সে বিষয়ের প্রায় সকল অংশেই বক্তৃতা দেওয়া হয়। কোন কোন অধ্যা-পক উচ্চতর ছাত্রদিগের নিমিত্ত একটী শ্রেণী খোলেন আর যে সকল ছাত্র নূতন শিক্ষা আরম্ভ করিতেছে তাহাদিগের নিমিত্ত আর একটী শ্রেণী খোলেন, আর কোন কোন অধ্যাপক সকল প্রকার ছাত্রদিগের নিমিত্তই একটী শ্রেণী খোলেন। অধ্যাপকেরা তাঁহা-দিগের স্ব স্ব বিষয়ে তাঁহারা আপনারা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা যাহা যাহা আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করিয়াছেন সে সমুদয়ের মধ্য হইতে পছন্দ করিয়া ছাত্রদিগের যে সকল বিষয় তাঁহারা জ্ঞাতব্য মনে করেন সে সকল বিষয় তাহাদিগকে সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেন। কোন্ বিষয়ে কি কি পুস্তক বা পত্রিকা হইবে তাহা তাঁহারা প্রায়ই নিজ হইতেই পড়িতে বলিয়া দেন, আর না হয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া দেন। যাহারা কোন বিষয় ভাল করিয়া শিখিতে চায়, তাহারা সে বিষ-য়ের অধ্যাপকের বক্তৃতায় যাহা শুনিতে পায় তাহা নোট করিয়া লয় অর্থাৎ স্মরণ রাখিবার নিমিত্ত লিখিয়া লয় আর ইহা ছাড়া অধ্যাপকের পরামর্শানুসারে তাহাকে যে সমুদায় প্রধান প্রধান ভাল ভাল পুস্তক লেখা হইয়াছে সে-সকল পুস্তকের

সমুদয় কিম্বা বিশেষ বিশেষ অংশ আর সে বিষয়ের পত্রিকাগুলির ভাল ভাল প্রবন্ধ সমূহ, তাহাদিগের পড়িতে হয়। কোন কোন বিষয়ে অধ্যাপক স্বয়ং অথবা তাঁহার সহকারী উপদেশ বক্তৃতার শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে একটী প্রশ্নোত্তরের শ্রেণী খোলেন; উপদেশ বক্তৃতার শ্রেণীতে ছাত্রেরা সাধারণতঃ অধ্যাপক যাহা বলেন তাহা শোনে ও নোট করে, ছাত্রেরা বক্তৃতার যদি কোন অংশ বুঝিতে না পারে, তবে বক্তৃতার শেষে অধ্যাপকের নিকট হইতে সে অংশ বুঝাইয়া লইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ছাত্রদিগের অনেক বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে; এই সকল সন্দেহ দূর করিয়া শিক্ষণীয় বিষয়টী ছাত্রদিগের মনে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রশ্নোত্তর শ্রেণী খোলা হয়। অধ্যাপকেরা উপদেশ বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে অনেক দ্রব্য ছাত্রদিগকে দেখান আর পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক রকম পরীক্ষা করিয়া দেখান।

ক্রমশঃ।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

পারমাণবিক সিদ্ধান্ত।

...কে গ্যাস বলে;
...িয়াছে যে পৃথিবীতে
...তর জমাট ও ত
...আবার ভিন্ন
...আমাদের
...কে যে বায়ু রা... ই, নিশ্বাস
যে বায়ু শরীরে গ্রহণ করিয়া আমরা
ধারণ করি, সেই বায়ুতে প্রধানতঃ দুই
প্রকার গ্যাস আছে। আমরা যদি কতক
শুষ্ক বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখি, তবে দে-
খিতে পাই যে তাহার ঘন আয়তনের পাঁচ
ভাগের প্রায় এক ভাগ অক্সিজেন্ নামক
একপ্রকার গ্যাস আর প্রায় চার ভাগ নাই-
ট্রোজেন নামক এক প্রকার গ্যাস। কোন
জ্বলন্তবস্তু অক্সিজেন্ গ্যাসে ধরিলে উহা
আরও জ্বলিয়া উঠে, কোন জ্বলন্ত বস্তু নাই-
ট্রোজেন্ গ্যাসে ধরিলে উহা শীঘ্রই নিবিয়া
যায়। আবার জল পরীক্ষা করিয়া দেখা
গিয়াছে যে উহাতে দুই প্রকার গ্যাস
আছে; দুই ঘন আয়তন হাইড্রোজেন্
গ্যাস আর এক ঘন আয়তন অক্সিজেন্
গ্যাস যোগে দুই ঘন আয়তন জলীয় বাষ্প
উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে
জ্বলন্ত বস্তু ধরিলে উহা নিবিয়া যায়;
কিন্তু যদি একটা বোতলে হাইড্রোজেন
বায়ুর মধ্যে উহা খুলিয়া উহার

মুখের নিকট অগ্নি শিখা ধরা হয়
...ড্রোজেন গ্যাস আস্তে আস্তে
...কে। এই রূপে অনেক বস্তু
করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবী
ভিন্ন প্রকারের গ্যাস আছে; এ...
গ্যাস পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ...
দের কতকগুলির মধ্যে দুই কি
অধিক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গ্যাস
আর কতকগুলির মধ্যে কেবল একই
...ের গ্যাস আছে। যে সকল গ্যাসে
কেবল একই প্রকার গ্যাস দেখা যায়
দিগকে মৌলিক গ্যাস বলা যাইতে
কারণ এই সকল গ্যাসই অন্যান্য
মূল অর্থাৎ এই সকল গ্যাসের দুই ...
হার অধিকের যোগে অন্যান্য গ্যাস
হয়। যে সকল গ্যাস দুই কি তাহার
সংখ্যক গ্যাসের যোগে উৎপন্ন তাহা
যৌগিক গ্যাস বলা যাইতে পারে।
কতকগুলি গ্যাস আছে, তাহাদের
দুই কি তাহার অধিক সংখ্যক মৌলি...
আছে বটে; কিন্তু তাহারা যৌগিক
নহে, তাহারা মৌলিক গ্যাসের
মাত্র। মিশ্র গ্যাসের মধ্যে যে যে ...
গ্যাস থাকে, তাহাদের গুণের পরি...
দেখা যায় না; কিন্তু যৌগিক গ...
মধ্যে যে যে মৌলিক গ্যাস থাকে,

ুদয় … প্রায় পরি-
বায়ু মিশ্র গ্যাস, ইহার
ও নাইট্রোজেন এই দুই
াছে, অক্সিজেনের যে
জ্বলন্ত বস্তুকে অধিক-
। আর নাইট্রোজেনের
জ্বলন্ত বস্তুকে নির্বা-
মধ্যেও এই দুই গ্যাসের
যায়। জলীয় বাষ্প এ
ইহার মধ্যে অক্সিজেন
ভার ভিন্ন মৌলিক অব-
গুলি দেখা যায় না;
ধ্যে জ্বলন্ত বস্তু ধরিলে
বিয়া যাইতে পারে
র মুখের নিকট আগুণ
না। আমরা এক্ষণে
যে গ্যাস সমুদয় তিন
, (২) যৌগিক ও (৩)
য়মে মৌলিক গ্যাসের
তাহা এই প্রবন্ধে আ-
ছে।

মন দুইটী বোতল লই
র ঘন আয়তন সমান
একটীর মধ্যে অক্-
অন্যটীর মধ্যে হাই-
রি, তবে দেখা যায়
ইটী বোতলের মধ্যে
পেক্ষা প্রথমটীর গ্যা-
অধিক, অর্থাৎ ঘন
ন অক্সিজেন গ্যাস
ন ষোলগুণ অধিক

ভারী, এরূপ অবস্থা
এক হইলে, অক্সিজে
ইবে। এই রূপে অ
ঘন আয়তন সমান
গ্যাস হাইড্রোজেন
অধিক ভারী, ক্লোরি
৩৫.৫ গুণ অধিক
ধি করা হইয়াছে
ল হাইড্রোজে
মৌলিক গ্যা
য় অধিক …; হাইড্রোজেনে…
…এক ধরিলে, অক্সিজেনের ওজন ১৬, নাইট্রোজেনের ওজন ১৪, ক্লোরিণের ওজন ৩৫.৫, ব্রোমিনের ওজন ৮০, আইওডিনের ওজন ১২৭, সল্ফরের ওজন ৩২, ইত্যাদি। বিশুদ্ধ গ্যাস লইয়া যখনই পরীক্ষা করা যাইবে, তখনই ওজনের অনুপাত এই রূপ দেখা যাইবে। মৌলিক গ্যাসের যোগে যখন যৌগিক গ্যাস উৎপন্ন হয়, তখন দেখা যায় মৌলিক গ্যাসের ঘন আয়তন যে মাত্রায় যে কয় সংখ্যাই হউক না কেন যৌগিক গ্যাসের ঘন আয়তন সেই মাত্রার দুই সংখ্যা হইবে। দুই ঘন আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাস আর এক ঘন আয়তন অক্সিজেন গ্যাসে দুই ঘন আয়তন জলীয় বাষ্প হয়; দুই ঘন ইঞ্চ হাইড্রোজেন আর এক ঘন ইঞ্চ অক্সিজেন্ গ্যাসে দুই ঘন ইঞ্চ জলীয় বাষ্প হয়; দুই ঘন ফুট হাইড্রোজেন আর এক ঘন ফুট অক্সিজেন গ্যাসে দুই ঘন ফুট জলীয় বাষ্প হয়, দুই ঘন হাত হাইড্রোজে

সে আপনি সুন্দর হইয়া অন্যকে রে।

সৌন্দর্য্য বিশ্বপ্রেম।

বিশ্ব সুন্দর, কেবল যে তা মধ্যে সামঞ্জস্য আছে তাহা ন র্য্যের সামঞ্জস্য সমস্ত জগতের ন্দর্য্য জগতের অনুকূল। কদর্য নের দলভুক্ত। সে বিদ্রোহ টিকিয়া থাকে সে কেবল জোরে। তাও সে থাকিত কতটুকুই বা তাহার গায়ের প্রকৃতি তাহা হইতেও বুঝি ব্যক্ত করিবেন।

মনের মিল

জগতের সাধারণের সহিত সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য ঐক্য আছে। জগতের সর্ব্বত্রই তাহার তুলনা তাহার দোসর মেলে। এই জন্য সৌন্দর্য্যকে সকলের ভাল লাগে। সৌন্দর্য্য যদি একেবারেই নূতন হইত, খাপছাড়া হইত, হঠাৎ-বাবুর মত একটা কিম্ভূত পদার্থ হইত, তাহা হইলে কি তাহাকে আর কাহারো ভাল লাগিত?

আমাদের মনের মধ্যেই এমন একটা জিনিষ আছে, সৌন্দর্য্যের সহিত যাহার অত্যন্ত ঐক্য হয়। এই জন্য সৌন্দর্য্যকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমার মিত্র" বলিয়া মনে হয়। জগতে আমরা "সদৃশকে" খুঁজিয়া বেড়াই। যথার্থ সদৃশকে দেখিলেই

মধ্যে যেমন আমাদের সাদৃশ্য পাই, এমন আর কোথায়? খিলেই তাকন? সোদের মলে, ল হয় ই যা না। হা দি ইলে

যাগি উপ তা। অভ্যা গরী য়া বিশ পরম্পরায় সেই তীত প্রতীতি প্রবা পুষ্ট হইতে থাকে—এরূপ কথা বলিয়া থাকেন। তাহা যদি তাহা হইলে, লোকে অবসর পা বাগানে বেড়াইতে না গিয়া কানে বেড়াইতে যাইত, ঘরে লুচি টাঙ্গাইয়া রাখিত ও ফুলদানের বর্ত্তে সন্দেশের হাঁড়ি টেবিলের করিত।

আমরা সুন্দর।

প্রকৃত কথা এই যে আ যেমনই হই না কেন, আমরা সুন্দর, সেই জন্য সৌন্দর্য্যের মাদের যথার্থ ঐক্য দেখিতে সৌন্দর্য্য-চেতনা সকলের কিছু

...কারণ ...

...করিতেছি : কেন পরস্পরকে ... পাইতেছি না?

সুন্দর ঐক্য।

...র্য্যের ঐক্য দেখিয়াই বিক্টর হ্যুগো ...ছেন।

। মহিমার আগেয় কুসুম
...য় নভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
এক ভিত্তি পরে ফুল শুভ্রবাস,
কে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
আলোকময় তপনের পানে;
মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে,
...ণা-কিরণ-ছটা আমারো ত আছে!"
...ভরে হর্ষশ্চ জলেষু পদ্মঃ" ইহাদের
...ক্য!

...ুষকে
...করিয়া, এবং ... প্রেমেই শারীরিক সৌন্দর্য্যও
যেমন দীপ্তি পায় এমন আর কিছুতে
... মানুষের মিলনে যেমন প্রেম আছে,
...র মিলনে তেমন প্রেম নাই, এই
বোধ করি, পশুদের অপেক্ষা মানু-
... সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটতর। যে মানুষ
। জাতি পাশব, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, সে
...যের ও সে জাতির মুখশ্রী সুন্দর হইতে
...র না। দেখা যাইতেছে, দয়ায় সুন্দর
..., প্রেমে সুন্দর করে, হিংসায় ঘৃণায়
...রতায় সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়।
জগতের অনুকূলতাচরণ করিলে সুন্দর হইয়া
উঠি ও প্রতিকূলতা করিলে জগৎ আমাদের
গালে কদর্য্যতার চুনকালী মাখাইয়া তা
হার রাজপথে ছাড়িয়া দেয়, আমাদিগকে
কেহ সমাদর করিয়া আশ্রয় দেয় না।

শাস্তি।

এ শাস্তি বড় সামান্য নহে। আমা-দের নিজের মধ্যে সৌন্দর্য্যের ন্যূনতা থাকিলে, আমরা জগতের সৌন্দর্য্য-রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাই না, ধরণীর ধুলা-কাদার মধ্যে লুটাইতে থাকি। শব্দ শুনি গান শুনি না, চলাফিরা দেখিতে পাই নৃত্য দেখিতে পাই না, আহার করিয়া পেট ভরাই কিন্তু সুস্বাদ কাহাকে বলে জানি না। জগ-তের যে অংশে কারাগার সেই খানে সর্ব্ব...

এই ...

আমরা সূর্য্যালোকে আসিতে চাই। কে আনিবে? সৌন্দর্য্য স্বয়ং। কারণ, অশরীরী প্রেম সৌন্দর্য্যে শরীর ধারণ করিয়াছে। প্রেম যেখানে ভাব সৌন্দর্য্য সেখানে তাহার অক্ষর, প্রেম যেখানে হৃদয় সৌন্দর্য্য সেখানে গান, প্রেম সেখানে প্রাণ সৌন্দর্য্য সেখানে শরীর, এই জন্য সৌন্দর্য্যে প্রেম জাগায়, এবং প্রেমে সৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলে।

কবির কাজ।

কবিদের কি কাজ, এইবার দেখা যাইতেছে। সে আর কিছু নয়, আমাদের মনে সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া। উপদেশ দিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিয়া প্রকৃতিকে মৃতদেহের মত কাটাকুটি করিয়া এ উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। সুন্দরই সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিতে পারে। বৈষয়িকেরা বলেন ইহাতে লাভটা কি? কেবলমাত্র একটি সুন্দর ছবি পাইয়া, বা সুন্দর কথা শুনিয়া উপকার কি হইল? কি জানিলাম? কি শিক্ষালাভ করিলাম? সঞ্চয়ের খাতায় কোন্ নতুন কড়িটা জমা করিলাম? কিছুক্ষণের

পাইলাম, সে ত ...
। ততক্ষণ যদি পা...
আজকেকার তারি...
ণ হইবে সে খবরট...

...িকেরা যাহাই বলুন ...নে উদ্দেশ্যের আবশ্যক ...ন্দর্য্য উদ্রেক করাই ম...

...তার ইহা অপেক্ষা মহত্ত্ব আর থাকিতে পারে না। সৌ... করার অর্থ আর কিছু নয়, ... অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক... স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করি... সে কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী, তাঁহ... একটি মররার তুলনা ঠিক খাটে...

অতএব কবিদিগকে আর ... হইবে না, তাহারা কেবল সৌন্দ... থাকুন—যেখানে যত সৌন্দর্য্য ... হাদের হৃদয়ের আলোকে ... উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখে ... কুক, তবেই আমাদের প্রেম জা... প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে...

কবিতা ও তত্ত্ব।

কবিরা যদি একটি তত্ত্বকি... খাড়া করিয়া তাহারই গায়ের ছোট করিয়া কবিতার সেরূপ... জামা বানাইতে থাকেন, ও ... সুসজ্জিত করিয়া তত্ত্বকে স... দেন, তবে সে তত্ত্বগুলিকে ... বাবুর মত দেখায় ও সে ...

ক হয় না। এ
ৰ করিতে দোষ
য়স্ক তত্ত্বেরা যদি
সের সময়ে তাঁহা
ইরূপ পোষাক পরি
স্থিত হন, তাহাতে
না। কিন্তু এই যা
কবিতাটি দেখিলেই যা
াহার খোলা ও শাঁস ও
। তাহা হইতে তত্ত্বের আঁটি
ই প্রধান কর্ত্তব্য বিবেচনা
হইলে নিশ্চয়ই ক্রমে এমন
হইতে আরম্ভ হইবে, যাহার
মস্ত, এবং যে সকল ফলের
বাহুল্য থাকিবে না শাঁস এবং
অধিক তাহারা নিজের আঁঠি-
ও মাধুর্য্য রসের আধিক্য
ন্ত লজ্জা অনুভব করিবে।
দরা গরবিণীকে দেখিয়া ভুবন-
মীরাও ঈর্ষাদগ্ধ হইবে।

তত্ত্বের বার্দ্ধক্য।

িৎ জ্ঞান পুরাতন হইয়া যায়,
ায়, মিথ্যা হইয়া যায়। আজ
নানা উপায়ে প্রচার করিবার
থাকে, কাল আর থাকে না,
সাধারণের সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে,
পুনশ্চ সে কথা উত্থাপন করিতে
লোকে তোমাকে মারিতে আসে,
মি কি জাহাজ হইতে নামিয়া
না আমি কাল জন্মগ্রহণ করি-

লন। তখন এ কথাটা প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে হইত। কিন্তু হৃদয়ের কথা চিরকাল পুরাতন এবং চিরকাল নূতন। বাল্মীকির সময়ে যে সকল তত্ত্ব সত্য বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহাদের অনেকগুলি এখন মিথ্যা বলিয়া স্থির হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীন ঋষি-কবি হৃদয়ের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহার কোনটাই এখনও অপ্রচলিত হয় নাই।

অতএব জ্ঞান কবিতার বিষয় নহে। কবিতা চিরযৌবনা। তাহাকে এই বুড়ার সহিত বিবাহ দিয়া অল্পবয়সে বিধবা ও অনুমৃতা করা উচিত হয় না।

সৌন্দর্য্যের কাজ।

প্রকৃতির উদ্দেশ্য, জানান' নহে অনুভব করান'। চারিদিক হইতে কেবল নানা উপায়ে হৃদয় আকর্ষণের চেষ্টা হইতেছে। যে জড়হৃদয়, তাহাকেও মুগ্ধ করিতে হইবে, দিবানিশি তাহার কেবল এই যত্ন। তাহার প্রধান ইচ্ছা এই যে, সকলের সকল ভাল লাগে, এত ভাল লাগে যে আপনাকে বা অপরকে কেহ যেন বিনাশ না করে, এত ভাল লাগে যে সক-

... ইচ্ছার
... অস্তিত্ব
... শাস-
... সাধিত
... তোমার
... খিলে

... ধক। এই ...
আছে, তেমনি সৌন্দর্য্যও আ...
অভিপ্রায় এই, যাহাতে শাসন ... য়া
সৌন্দর্য্যের বিস্তার হয়। শাসনের রাজদণ্ড
কাড়িয়া লইয়া সৌন্দর্য্যের মাথায় রাজছত্র
ধরাই প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য। প্রকৃতি
যদি নিষ্ঠুর শাসনপ্রিয় হইত, তাহা হইলে
সৌন্দর্য্যের আবশ্যকই থাকিত না। তাহা
হইলে প্রভাত মধুর হইত না, ফুল মধুর
হইত না, মানুষের মুখশ্রী মধুর হইত না।
এই সকল মাধুর্য্যের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া
আমরা ক্রমশঃ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত
হইতেছি। আমরা ভালবাসিব বলিয়া
জগতের হিত সাধন করিব। তখন ভয়
কোথায় থাকিবে! তখন সৌন্দর্য্য জগ-
তের চতুর্দ্দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।
অর্থাৎ আমাদের হৃদয়-কমল-শায়ী সুপ্ত
সৌন্দর্য্য জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি
জাগিয়াই আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ শাসনের সি-
পাই গুলোর নাম কাটিয়া দিয়াছেন জগতের
চারিদিকে তাঁহার জয়জয়কার উঠিয়াছে।

স্বাধীনতার পথ প্রদর্শক।

কবিরা সেই সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহারা
সেই স্বাধীনতার গান গাহিতেছেন, তাঁহারা
সজীব মন্ত্রবলে হৃদয়ের বন্ধন মোচন করি-
তেছেন। তাঁহারা সেই শাসনহীন স্বাধীন-
তার জন্য আমাদের হৃদয়ে সিংহাসন নির্ম্মা-
... সেই মহারাজা কর্ত্তৃক [illegible]
... জন্য প্রতীক্ষা করিয়া
... বিরা তাঁহারই সেনা।
... তে আসেন নাই, পরা-
... ই, বিজ্ঞতা শিখাইতে
... । তবু সজীবতা ও সৌন্দর্য্য
লাভ করিবার জন্য কখন কখন তাঁহাদের
দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হও, তাঁহারা
তবুও কাহাকে কখন উমেদারী করিতে
দেন না। কবিরা অমর, কেন না তাঁহা-
দের বিষয় অমর, অমরতাকে আশ্রয় করি-
য়াই তাঁহারা গান গাহিয়াছেন। ফুল চির-
কাল ফুটিবে, সমীরণ চিরকাল বহিবে, পাখী
চিরকাল ডাকিবে, এবং এই ফুলের মধ্যে
কবির স্মৃতি বিকশিত, এই সমীরণের মধ্যে
কবির স্মৃতি প্রবাহিত, এই পাখীর গানে
কবির গান বাজিয়া উঠে। কবির নাম
নির্জ্জীব পাথরের মধ্যে খোদিত নহে, কবির
নাম প্রভাতের নব নব বিকশিত বিচিত্র-
বর্ণ ফুলের অক্ষরে প্রত্যহ নূতন করিয়া
লিখিত হয়। কবি প্রিয়, কারণ, তিনি
যাহাদিগকে ভাল বাসিয়া কবি হইয়াছেন,
তাহারা চিরকাল প্রিয়, কোনকালে তা-
হারা অপ্রিয় ছিল না, কোনকালে তাহারা
অপ্রিয় হইবে না।

পুরাতন কথা।

যাঁহারা বলেন সকল কবিরা ঐ এক কথাই বলিয়া আসিতেছেন, নূতন কি বলিতেছেন? তাঁহাদের কথার আর উত্তর দিবার কি আবশ্যক আছে? এক কথায় তাঁহাদের উত্তর দেওয়া যায়। পুরাতন কথা বলেন বলিয়াই কবিরা [illegible] নূতন কথা বলেন না। [illegible] করে কে? নূতনকে অন[illegible] অন্তঃপুরের মধ্যে কে ডা[illegible] পারে? তাহার বংশা[illegible] কে? কবিরা এমন পুরাতন কথা [illegible] যাহা আমার পক্ষেও খাটে তোমার পক্ষেও খাটে; যাহা আজও আছে, কালও ছিল, আগামী কালও থাকিবে। যাহা শুনিবা-মাত্র সুদূর অতীত হইতে সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিতে পারে, ঠিক কথা! যাহা শুনিয়া আমরা সকলেই আনন্দে বলিতে পারি, পরের হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য যোগ, অতীত কালের হৃদয়ের সহিত বর্ত্তমান কালের হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য ঐক্য! হৃদয়ের ব্যাপ্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে বাড়িয়া যায়।

জ্ঞান ও প্রেম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জ্ঞানে প্রেমে অনেক প্রভেদ। জ্ঞানে আমাদের ক্ষমতা বাড়ে, প্রেমে আমাদের অধিকার বাড়ে। জ্ঞান শরীরের মত, প্রেম মনের মত। জ্ঞান যুক্তি করিয়া বশী হয়, প্রেম সৌন্দর্য্যের দ্বারা বশী হয়। জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় মাত্র, প্রে[illegible] তেই বু[illegible] জিয়াইয়া [illegible] উপরে [illegible] যাহার উ[illegible] আত্ম [illegible] [illegible] নিকটে এবং [illegible] পারস্য কবিতার চমৎকার ব্যাখ্যা [illegible] শুনিয়াছিলাম, তাহার মর্ম্ম লিখিয়া দিতেছি।

পারস্য কবি এইরূপ একটি ছবি দিতেছেন যে, বৃদ্ধ পক্ককেশ জ্ঞান তাহার লোহার সিন্দুকে চাবি লাগাইয়া বসিয়া আছে; হৃদয় "নগদ কড়ি দাও" "নগদ কড়ি দাও" বলিয়া তাহারই কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রেম এক পাশে বসিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিতেছে "মুস্কিল!"

অর্থাৎ জ্ঞান নগদ কড়ি কোথায় পাইবে! সে ত কতকগুলো নোট দিতে পারে মাত্র, কিন্তু সেই নোট ভাঙ্গাইয়া দিবে এমন পোদ্দার কোথায়! জ্ঞানে ত কেবল কতকগুলো চিহ্ন দিতে পারে মাত্র, কিন্তু সেই চিহ্নের অর্থ বলিয়া দিবে কে? জগতের সকল যায়গায় নোটই দেখিতেছি, চিহ্নই দেখিতেছি, হৃদয় ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে, নগদ কড়ি পাইব কোথায়? প্রেমের কাছে পাইবে।

।

আয়ত্ত

হ্যবস্থার

তাহার

এই সম্বন্ধে

...র উদ্ধৃত করি-

এই যে, যদি অংশ

জগতের রক্ষা হয় বটে শরীরের দ্বারা পাইবে

কিছুই নাই, তাহ... পাইবে না যদি সমস্ত

অ... বা প্রেমের দ্বারা পাইবে।

Inclusions

Oh, wilt thou have my hand dear,
to lie along in thine ?
... little stone in a running stream,
...ns to lie and pine.
...le hand, dear,
...o ply with thine.

Oh wilt tho have my cheek dear,
drawn closer to thine own ?
My cheek is white, my ... is
worn, ... tear ran down.
Now leave a little space, dear, lest it
should wet thine own.

Oh must thou have my soul, Dear,
commingled with thy soul ?
Red grows the cheek, and warm the
hand, the part is in the whole.

Nor hands nor cheeks keep separate,
when soul is joined to soul.

Mrs Browning

সত্যং শিবং সুন্দরং।

সত্য কেবল মাত্র হওয়া, শিব থাকা, সুন্দর ভাল-করিয়া থাকা। সত্য শিব না না হইলে থাকিতে পারে না, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অসত্য হইয়া যায়। শিব আপনার শিবত্বের প্রভাবে অবশেষে সুন্দর হইয়া উঠে। সত্য আমাদিগকে জন্ম দেয়, শিব আমাদিগকে বলপূর্ব্বক বাঁচাইয়া রাখে, সুন্দর আমাদিগকে আনন্দ দিয়া আমাদের স্বেচ্ছার সহিত বাঁচাইয়া রাখে। মনুষ্য-জীবন সত্য, কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান শিব, প্রেম সুন্দর। বিজ্ঞান সত্য, দর্শন শিব, কাব্য সুন্দর।

লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী, তুমি শ্রী. তুমি সৌন্দর্য্য, আইস, তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাসনে অধিষ্ঠান কর। তুমি যাহার [illegible] তাহ[illegible] সকলই তাহার ঐশ্বর্য্য। [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible]

তুমি বিষ্ণুর গেহিনী। [illegible]তের সর্ব্বত্র তোমার মাতৃস্নেহ। তুমি এই ...গতের শীর্ণ

কঠিন কঙ্কাল প্রফুল্ল কোমল সৌন্দর্য্যের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছ। তোমার মধুর করুণ বাণীর দ্বারা জগৎ পরিবারের বিরোধ বিদ্বেষ দূর করিতেছ। তুমি জননী কি না, তাই তুমি শাসন হিংসা ঈর্ষা দেখিতে পার না। তুমি বিশ্ব চরাচরকে তোমার বিকশিত কমল দলের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া অনুপম সুগন্ধে মগ্ন করিয়া রাখিতে চাও। সেই সুগন্ধ এখনি পাইতেছি; অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিতেছি, "কোথায় গো! সেই রাঙা চরণ দুখানি আমার হৃদয়ের মধ্যে

এক...
কোমল...
ঠিনতা...
সুগন্ধে...
পুষ্পও...
দান ক...

এই যে, ...
হইতে জগতে আ...
চর উন্মত্ত হইয়া মধুকরে...
গুন্ গুন্ গান করিতে...
কাশে চারিদিক হইতে উড়িয়...

শ্রী রবীন্দ্র...

যুদ্ধ ধর্ম্ম।

প্রাচীন ভারতের সকল কার্য্যেই ধর্ম্ম সংযোগ ছিল। আহার করিবে, তাহাতেও ধর্ম্ম, ব্যবহার করিবে তাহাতেও ধর্ম্ম, বিহার করিবে, তাহাতেও ধর্ম্ম, যুদ্ধ করিবে তাহাতেও ধর্ম্ম। কোন কার্য্যই অধর্ম্ম পূর্ব্বক করা বিধেয় নহে; সকল কার্য্যই ধর্ম্ম পূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য, এইরূপ দৃঢ়তর জ্ঞান পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যুদ্ধ যে এত নৃশংসের কার্য্য, পূর্ব্বকালে তাহাও ধর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ ছিল। মানুষ মারিব, কিন্তু ধর্ম্ম বা নিয়ম পূর্ব্বক মারিব,—এরূপ ইচ্ছা এরূপ নি..., এরূপ অভিসন্ধি, এরূপ সতর্কতা—ভাবিয়া দেখিলে ... বীরসমাজের ভূষণ বলিয়া প্রতীতি হয়।

কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বান্তকর যুদ্ধ উপস্থিত হইল, কুরু পাণ্ডব-সৈন্য পূর্ণ উৎসাহে পরস্পর পরস্পরের যথার্থ উদ্যোগ করিল—কিন্তু সর্ব্বাগ্রে একটী ধর্ম্ম নিয়ম প্রচার করা হইল। উভয়পক্ষ হইতেই জানিত হইল যে আমরা অধর্ম্ম বা অন্যায় পূর্ব্বক যুদ্ধ করিব না। আরব্ধ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে পুনরায় আমাদের প্রীতি সংস্থাপিত হইবে। দিন দিন সৈনিক যুদ্ধের অবসানে রাত্রিকালে অন্যান্যের শত্রুতা বিদূরিত থাকিবে। তুল্যযোগ্য ব্যতিক্রম,

...হইবে
...ঢ়ের
...এবং
...সাহ,
...রিবে।
...বন্ধক হইবে
...। অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাৎ প্রহার ...হইবে। বিশ্বস্ত ও ভয় বিহ্বল ব্যক্তিকে ...হার করা হইবে না। নিরস্ত্র হইলে বর্ম্ম-রহিত হইলে কদাচ তাহাকে প্রহার করা হইবে না। সারথি, ভারবাহী, শস্ত্রনেতা-দাস ও বাদ্যকর প্রভৃতিকে বধকরা হইবে না, ভারত যুদ্ধে ইত্যাদি প্রকার অদ্ভুত ধর্ম্ম নিয়ম প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল।

যুদ্ধে কি প্রকার কার্য্য করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয়, তাহা মনুসংহিতা, নীতি ময়ুখ, কামন্দকীয়, নীতিসার, বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর, নীতি প্রকাশিকা ও শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত আছে। যথা—

নচহন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলীং।
ন মুক্তকেশ মাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনম্॥
ন স্নুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
না যুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্॥
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্ম মনুস্মরণ॥
(নীতি ময়ূখধৃত মনুবচন।)

যে ব্যক্তি যান হইতে অবতরণ করিয়াছে স্থলারূঢ় হইয়াছে, তাহাকে আঘাত করা বিধেয় নহে। ক্লীবকে আঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। যে অঞ্জলী বদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়, তাহাকে প্রহার করা কর্ত্তব্য নহে। মুক্ত-কেশ ব্যক্তিকে, উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং যে ব্যক্তি "আমি তোমার শরণাগত হইলাম" বলে তাহাকে বধ করিতে নাই। নিদ্রিত ব্যক্তিকে, বর্ম্মাদি পরিচ্ছদ রহিত ব্যক্তিকে, নগ্ন ব্যক্তিকে, ও নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না। যে যুদ্ধ করিতেছে না, যে যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছে, যে অপরের সহিত সংগ্রাম করিতেছে, যে ভয় বিহ্বল হইয়াছে, যে পলাইবার উদ্যোগ করিয়াছে, যে পশ্চা-মুখ হইয়াছে, সাধুদিগের ধর্ম্ম মনে করিয়া এই সকল ব্যক্তিকেও আঘাত করা কর্ত্তব্য নহে।

"বৃদ্ধ বালো ন হন্তব্যো নৈব স্ত্রী নৈবচ দ্বিজ।
তৃণপূর্ণ মুখশ্চৈব তবাস্মীতি চ যো বদেৎ॥"

বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, এবং যে তৃণ মুখে করিয়া "আমি তোমার" এইরূপ কথা বলে, তাহাকে কোনক্রমেই বিনাশ করিবে না।

মহর্ষি বৈশম্পায়নও স্বকৃত নীতিপ্রকাশিকা গ্রন্থে উক্ত প্রকার উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

"ন কূটৈ রা যুধৈ র্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে-রিপুন।
দিগ্ধৈ রত্যু নৈর্যন্ত্রৈস্তন্ত্রৈশ্চৈব পৃথক্বিধৈঃ।
ন হন্যা দ্ভূম্যারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্ত কেশং নাসীনং ন তথাস্মীতি বাদিনম্।
ন প্রসুপ্তং ন প্রণতং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
ন যুদ্ধমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্।
আয়ুধ ব্যসনং প্রাপ্তং নার্ত্তং নাতি পরিক্ষতম্।

ন হীনং ন পরাবৃত্তং ন চ বল্টীক মাশ্রিতম্।
ন মুখে তৃণিনং হন্যাৎ ন স্ত্রীয়ো বেশধারনম্॥
এতানুশান্ ভটের্বাপি ঘাতয়ন্ কিল্বিষী ভবেৎ॥"

নীতি প্রকাশিকায় এই সকল বচন অতি সরল শব্দে গ্রথিত আছে। বিশেষতঃ এ গুলির অর্থপ্রায় পূর্ব্বোক্ত বচনাবলীর দ্বারায় ব্যক্ত হইয়াছে। ফল, প্রথমোক্ত কূটাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে হইলে শতঘ্নী প্রভৃতি আগ্নেয় অস্ত্রগুলিকেই প্রধান কল্পে গণ্য করিতে হয়। এক্ষণকার কামান্-যুদ্ধ অত্যন্ত কূট। কামানের ন্যায় কূটাস্ত্র আর কিছুই নাই ও ছিল না।

আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, পূর্ব্বকালে কামানের ন্যায় অথবা অন্য-এক আকারের কামান ছিল কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন না। কামানের দ্বারা যুদ্ধ করায় অধর্ম্ম হয় এবং উহাতে কিছুমাত্র পৌরুষ নাই এইরূপ বোধ থাকাতেই তৎকালের ক্ষত্রবীরেরা কামান কি কোনরূপ যন্ত্রাদির দ্বারা মনুষ্য বধ করিতে উৎসাহী হইতেন না। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে,—

"আবদ্ধে পীড়য়েচ্চ শত্রোঃ প্রকৃতয়ঃ স্যয়ম্।
বশে যাতে পুনস্তাসু শিতৃ চ বৃত্তিমাচরেৎ॥"

শত্রু যতকাল না বশীভূত হয়, ততকাল তাহার অনুগত প্রজা ও অমাত্যদিগকে পীড়িত করিবেক এবং তাহার ধনও লুণ্ঠন করিবেক; পরন্তু সে যখন বশীভূত হইবেক, তখন আর তাহার প্রতি কোন প্রকার অ-

করি
ধর্ম্ময
"সমে
ন নি
"আহ

যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্য পরাঙ্মুখাঃ

প্রজা পালনকারী রাজা সমান, ম ও উত্তম ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংগ্রামে আহূত হইলে ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করতঃ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। পরস্পর পরস্পরের বধেচ্ছু রাজগণ সমধিক শক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা পরাঙ্মুখ না হন, তাঁহারা স্বর্গ গমন করিয়া থাকেন।

উৎসাহ বাক্য।

যুদ্ধকালে রাজার সেনা নায়ক উৎসাহ বর্দ্ধক বাক্যের দ্বারা যোধগণকে উত্তেজিত করিবেন। ওজো-বাক্য বা উৎসাহ বাক্য কিরূপ তাহা মহাভারতাদি গ্রন্থে অধিক পরিমাণে আছে। নীতি প্রকাশিকা প্রভৃতি নীতিগ্রন্থেও আছে। মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রায় সকল পাঠকেরই জানা আছে, এজন্য আমরা নীতিগ্রন্থের উদাহৃত কতিপয় ওজো বাক্য আহরণ করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম। যথা—

"দ্বৈপায়নেন মুনিনা মনুনাচ ধর্ম্মা
যুদ্ধেষু যে নিগদিতা বিদিতাস্ত তে চঃ।

...তাঃ সবিস্নাঃ।
...সব মাত্রেণ মহাফলোহয়ং
ঋজুশ্চ পন্থাঃ সময়ে বা স্বৰ্গম্ ॥"

৩

"সংরক্ষ্যমানা মপি নাশ মুপৈস্ত্ব বশ্যং
এতচ্ছরীর মপহায় সুদ্ধৎ সুতার্থান্।
তৎকিং বরং প্রলপতাং সুদৃশাং সমক্ষম্
কিং নিঘ্নতঃ পরবলং ভ্রূকুটী মুখস্য ॥"

৪

"হাতাত মাতেতি চ বেদনার্ত্তঃ
কিরণ শকৃন্মূত্র কফাস্থ লিপ্তঃ।
বরং মৃতঃ কিং ভবনে কি মাজৌ
সন্তুষ্ট দন্তচ্ছদ ভীম বক্ত্রঃ ॥"

৫

"যস্য তপো ন জনাঃ কথয়ন্তিনোমরণং
সময়ে বিজয়ং বা।
ন শ্রুতদান মহাধনতা বা তস্যভয়ঃ কৃমিকীট
সমানঃ ॥"

৬

"লোকেয়শুভ স্তিষ্ঠতু তাবদন্যঃ
পরাঙ্মুখানাং সময়েষু পুংসাম্।
পত্ন্যোঽপি তেষাং ন হ্রিয়া মুখানি
পুরুঃ সখিনা মচ লোকয়ন্তি ॥

৭

সৈন্যমচদার্য্য বর্ত্ততাং
স্ত কথয়া মিতাদৃশম্।
স্ব যশোসাপ পল্লবান্
...দনবর্ণ পূরকান ॥"

৮

"নিপতন্তি শিরসি দ্বিপস্য সিংহঃ
স্বতনু শতাধিকমাংস রাশি মূর্ত্তিঃ।
পিবতি চ তদসৃঙ্ নদেষ্ট গন্ধং
বদন গতাংশ্চ শনৈঃ প্রসৃজ্য মুক্তান ॥"

৯

"চিত্রং কিমস্মিন্ বদ সাহসং বা
যৎ স্বামিনোঽর্থে গণয়ন্তি নাসূন্।
যুদ্ধাৎ প্রনষ্টো বিদিতোঽরি মধ্যে
যত্রানিশস্তিষ্ঠতি সাহসং তৎ ॥"

১০

"যদি সময় মাপাস্য নাস্তি মৃত্যো
র্ভয়মিতি যুক্ত মতোন্যতঃ প্রয়াতুম্।
অথমরণমবশ্যমেব জন্তোঃ
কিমিতি মুধা মলিনং যশঃ কুরুধ্বম্ ॥

১। যোদ্ধাগণ! তোমরা ব্যাসের ও মনুর কথিত যুদ্ধধর্ম্ম জ্ঞাত আছ। প্রভুর জন্য, গোজাতির রক্ষণাবেক্ষণ জন্য ও ব্রাহ্মণের জন্য যাহারা যুদ্ধে শরীর পরিত্যাগ করে, তাহাদের সর্গলোক সুলভ ও বিপুল যশোলাভ হয়।

২। তপস্বিগণ যাহা দীর্ঘকালে পরে প্রাপ্ত হন, যাজ্ঞিকেরা যাহা যত্নসাধ্য যজ্ঞের দ্বারা লাভ করেন, প্রশস্তচেতা বীরগণ যুদ্ধরূপ অশ্বমেধের পশু হইয়া তাহা ক্ষণকাল মধ্যে লাভ করিয়া থাকেন।

৫। ঋষিগণ স্বর্গগমনের বহুবি…
উপদেশ করিয়াছেন, পরন্তু সে সকল
অতিশয় কষ্টগম্য কুটিল ও বিঘ্ন পরিপূ…
যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগরূপ পথটী ঋজু …
ফলদায়ক। আরও সুগমতা এই …
পথের পথিক এক নিমেষের মধ্যেই স্বর্গ-
গমন করেন।

৬। এই ভৌতিক শরীর যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিলেও ইহা রক্ষিত হইবে না। অবশ্যই ইহার পতন বা বিনাশ হইবে। অবশ্যই ইহা বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র ও ধন,— এই সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া ভূমিসাৎ হইবে। এতস্থলে বল দেখি, ইহা রোরুদ্যমান বন্ধুগণের চক্ষের উপর পতন হওয়া ভাল কি শত্রুবলবিনাশকারী ভ্রূকুটী-যুক্ত মুখ বীরপুরুষের সমক্ষে পতন হওয়া ভাল?

৭। হা পিতঃ! হা মাতঃ! ইত্যাদি বিলাপ ও আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মূত্র, বিষ্ঠা ও শ্লেষ্মাক্ত কলেবর হইয়া গৃহে মরা ভাল কি যুদ্ধে দষ্টৌষ্ঠ হইয়া শত্রুগণের ভয়প্রদ হইয়া মরণ লাভ করা ভাল? (ইহাও বিচার করিয়া দেখ)

৮। মানুষে যাহার তপস্যা যুদ্ধজয় কিংবা যুদ্ধ মরণের উল্লেখ না করে, অথবা যাহার বিদ্যা (বেদাধ্যয়ণ), দান ও মহাধনের যশঃ কীর্ত্তন না করে, তাহার জন্ম কৃমি ও কীটের তুল্য।

৯। যে পুরুষ সমরে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার স্বর্গলোক গমন দূরে থাকুক, তাহার পত্নীগণও তাহার নিকট লজ্জায় মুখ দেখা-

অধিক …
তিত হয় এবং …
করে।

১০। বীরপুরুষেরা যে প্রভুর জন্য সাহসী কার্য্য করে, এবং প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। যে মূর্খেরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন পূর্ব্বক শত্রু কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াও জীবিত থাকে, তাহাই আশ্চর্য্য এবং তাহাই তাহাদের আশ্চর্য্য সাহস।

১১। যুদ্ধ না করিলে যদি লোকের মৃত্যুভয় নিবারিত হইত তাহা হইলে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করায় ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যখন যুদ্ধ না করিলেও মরণ হইবে, তখন আর যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কুযশঃ উপার্জ্জন করিবার প্রয়োজন কি?

ইন্দ্র অম্বরীষ রাজাকে বলিতেছেন

"ভর্ত্তুরর্থস্তু যঃ শূরো বিক্রমেদ্বাহিনী মুখে।
ভয়ান্ন বিনিবর্ত্তেত তস্য লোকা যথা মম॥
১
"যশ্চ নাপেক্ষ্যতে কঞ্চিৎ সহায়ং বিজয়েস্থিতঃ।
জীবগ্রাহং প্রগৃহ্নাতি তস্য লোকা যথা মম॥"
২
"আহবে নিহতঃ শূরৈ র্ন শোচেত কদাচন।
অশোচ্যাহিহতঃ শূরঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥"

।

॥”

১। যে বীর স্বামীর জন্য শত্রু সৈন্যে বিক্রম প্রকাশ করে ভয় প্রযুক্ত নিবৃত্ত হয় না, তাহার লোক আমার সমান অর্থাৎ সে ব্যক্তি ও ইন্দ্র লোকের প্রভু হয়।

২। যে বীর বিজয়ে অবস্থান করতঃ সহায় মুখ প্রতীক্ষা না করে এবং শত্রুর জীবন গ্রহণ করে, সে ব্যক্তিও যমলোক প্রাপ্ত হয়।

৩। যুদ্ধে শূলাহত হইয়াও যে ব্যক্তি শোক করে না, কাতরও হয় না, শোক

। অর্থাৎ অকাতরে যে ব্যক্তি মৃত
ার নিশ্চয়ই আমার নিকট আসিয়া
প্ত হয়।

চর-জীবেরা অচর-জীবের অন্ন
ভোগ্য হয়। অদন্ত জীবেরা দন্তুর
ভোগ্য হয়। হস্ত স্বর্জিত জীব
ক্ত জীবের অন্ন হয় আর কাতর ব্যক্তি-
শূর পুরুষের অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য হইয়া
...ক।

৫। ভীরু ব্যক্তিরা পৃষ্ঠ, উদর, হস্ত ও পদ থাকিতেও শূর পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে (ভয়ে তাহার অনুগত হয়)। ভয়ে কাতর হইয়া তাহারা বার বার প্রণাম করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া শূরের উপাসনায় নিযুক্ত থাকে। (কি আশ্চর্য্য। ইহাদেরও হস্ত পদাদি আছে, অথচ তাহারা হস্ত পদাদির কার্য্য বিষয়ে অক্ষম)।

এইরূপ অনেক উত্তেজক বাক্য আছে, তৎসমুদায় একত্রিত করিতে গেলে একখানি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা এই স্থানেই প্রস্তাব শেষ করিলাম।

শ্রীরামদাস সেন।

বিদ্যাশিক্ষা ও ভারতের সাধারণ ভাষা।

কার্য্যমাত্রেরই যেমন কারণ আছে তেমনি সকল কার্য্যেরি ফল আছে, একটি কার্য্যের যে কেবল একটি ফল জন্মে এরূপ সর্ব্বস্থানে দেখা যায় না। কার্য্য, বিশেষ

এক এক কার্য্যের বহুবিধ ফল জ
শিক্ষাও সেইরূপ বহুবিধ ফলদায়
কার্য্য। কোন একটি ভাষা শি
যে বিদ্যা শিক্ষা করা তাহা নহে
ভাষা শিক্ষাই এখন তাহার প্রথম ে
স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি মু
কি পুস্তকে ভাষা দ্বারাই একজনের
ভাব মতামত, তাঁহার উপার্জ্জিত
সকল—তাহার সমকালীন এবং ভবিষ্য-জাত কোটি কোটি লোকের মধ্যে প্রচারিত হয়। লিখিত ভাষার সাহায্যেই আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগের, আর্য্য ঋষিগণের উপার্জ্জিত দুর্লভ ধনের অধিকারী হইতে পারিতেছি, এবং চীন আরব্য গ্রীশ ইয়োরোপ আমেরিকা প্রভৃতি অতি দূর দূর দেশের প্রাচীন এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের বিদ্যা চর্চ্চার ফল ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছি এবং অন্য দেশের লোকেরাও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়ে ভারতের প্রাচীন গৌরবের পরিচয় পাইতেছেন।

বাল্যকালে চানক্য শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত দেশ বিদেশের কত পণ্ডিতের উক্তিতে, বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিদ্যাশিক্ষার শুভ ফল সম্বন্ধে কত কথাই যে শুনিয়াছি তাহা সহজে গণনা করা যায় না। আজ কাল এই ভারত ভূমির ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে শত শত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, শতসহস্র ছাত্রগণ ঐ সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে—দিন দিন আমার ঐ রূপ বিদ্যালয়ের এবং ছাত্রের

দের যথ
থাকি, ত
বিদ্যার উন্না
হই, তখন তাহাদের
ফল লাভের কথা আমাদের মনে প্রথমেই উদয় হয়? তাহা ভাবিয়া দেখিলেই অন্য ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য আমরা অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারি।

প্রকৃত ধনশালী লোকের সংখ্যা দেশে অতি অল্প এবং তাঁহাদের কথা এখানে উল্লেখ করা বৃথা। ইহারা ছাড়া প্রায় সকলেই আপন আপন পুত্র পৌত্র ভ্রাতা ভ্রাতষ্পুত্র প্রভৃতি কৃতবিদ্য আত্মীয় যুবকদিগকে হাইকোর্টের জজ, সিভিলসার্ভেন্ট, মাজিষ্ট্রেট মুন্সেফ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের বড় বড় চাকরী হইতে সামান্য কেরাণী পদে নিযুক্ত হইতে দেখিতে ইচ্ছা ও আশা করেন। যিনি যেমন পদবীর লোক—সেই অনুসারে তাঁহার আশার তারতম্য হইয়া থাকে। দাসত্ব বৃত্তিতে রুচির অভাব হেতু আবার কেহ কেহ ইচ্ছা করেন যে তাঁহাদের বাড়ীর ছেলেরা উকীল কৌন্সিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কোন না কোন বিদ্যাব্যব-

... অধিক
না। তাহা
...াটি এত তুলা এত
...পর দেশে যাইতেছে
...করা তাহার মূল্য স্বল্প। যে
তাহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি
...তবে কেন আমাদের ধন বৃদ্ধি
তাহা দিন দিন হ্রাস হই-
...রূপ হওয়ার অনেকগুলি কারণ
...দেশের ধন হ্রাসের কারণ কিছু
...ার পূর্ব্বে উপর উক্ত শস্যাদি
...র দৃশ্যতঃ লাভ স... দেশে
...না তাহা দেখা য... কল
...ময়ে ভিন্ন দে... হইতে যে অর্থ
তাহা ...তে ঐ সকল দ্রব্য
...াদে অবশিষ্ট যাহা
...র লাভ; সে লাভের
...রা ঐ সকল দ্রব্য উৎপন্ন
...য এবং অপর অংশ যাহারা
লইয়া গিয়া বিক্রয় করে
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই
...ক্তিগণ এ দেশের লোক
...াহাদের লাভের ভাগ
...ভক্ত হয় না এবং তাঁহারাই
...ভের অধিক অংশ পাইয়া
...াং দেশে দিন দিন বাণিজ্যের
...ছে বলিয়া আজ কাল চারি
... সুমিষ্ট কথা শুনা যায় সে
...া ব্যতীত তাহাতে আমাদের
নাই। কাকের পক্ষে যেমন
...শের এই বাণিজ্য উন্নতিও

...ক-
...হইতে দ্রব্য সকল সে দেশে আনিয়া বিক্রয় করা তেমনি বাণিজ্যের আর এক দিক্ আছে এবং ঐ উভয় প্রকার বাণিজ্যের তারতম্যে এক দেশের যথার্থ লাভ লোকসান্ দেখা যায়। কোন দেশের ব্যবহার্য্য দ্রব্য গুলি সুলভ পদ্ধতিতে যেদেশে যত উৎপন্ন হয় অপর দেশ হইতে তাহা যতই কম আনিতে হয়—ততই সেদেশের মঙ্গল, কারণ ঐ দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিবার সময় অনেক গুলি শ্রমজীবি ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হয়, আর ঐ দ্রব্যগুলি বি... ...তে আনাইতে হইলে যে খরচ পড়ে—... ...া প্রস্তুত করিতে পারিলে তত খরচ পড়ে না; পড়িলেও দেশের লোকের মধ্যেই সে খরচ থাকিয়া যায়। মোট কথা, যে পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য আমরা অপর দেশের লোকদের দিতে পারি তাহার কম পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য যদি অপর দেশ হইতে আমাদের গ্রহণ করিতে হয় তবেই আমাদের দেশের লাভ হয় এবং পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক দিতে হইলে দেশের ক্ষতি হয়—কিন্তু আমাদের দুর্দ্দশা বশতঃ আমাদের এখন এমন অবস্থা হই-

* ইংলণ্ডের নাইন্‌টিন্থ্ সেনচুরি পত্রিকাতে জে সাইমুর কি প্রণীত ভারত লুণ্ঠন নামক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহাতে সহৃদয় লেখক বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতের দুর্দ্দশা অতি জলন্ত রূপে দেখাইয়াছেন।

য়াছে যে অপর দেশ হইতেই আমাদের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। এখানে আমি সৌখিন দ্রব্য, যেমন ভাল কাগজ ভাল কলম, ভাল কাপড়, ঝাড় লণ্ঠন প্রভৃতি কাঁচের দ্রব্য সাবান ইত্যাদি জিনিষের কথাই উল্লেখ করিতেছি না, নিত্য প্রয়োজনীয় সামান্য দ্রব্যের নিমিত্তও এখন আমাদের অপর দেশের উপর নির্ভর না করিলে চলে না। বাঙ্গালার একজন মৃত কবি একটী গানের মধ্যে একবার আপেক্ষ করিয়া বলিয়া ছিলেন যে "বিলাতি দেশালাই নইলে দেশে প্রদীপ জলে না" এ কথা যে কতদূর সত্য তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। ইহার অপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশা আমাদের আর কি হইতে পারে। কেন আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইল ? শিল্প কার্য্যের চর্চ্চা কি আমাদের এদেশে ছিল না—না এ দেশে তাহার উন্নতি হয় নাই ? এখনও কি দেশে তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না ? যে ইয়োরোপীয়গণের শিল্প নৈপুণ্যের নিমিত্ত এত গৌরব বাড়িয়াছে, যাঁহারা এজন্য আত্ম শ্লাঘা করেন—তাঁহারা কি বারাণসীর বস্ত্রের ন্যায়, কাশ্মীরের শালের ন্যায়, কটকের এবং ঢাকার সোনা রূপার তারের জিনিষের ন্যায়, ঢাকার অদ্বিতীয় মসলিন কাপড়ের ন্যায় কোন সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন ? অল্প দিন হইল কলিকাতায় যে প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে সেই প্রদর্শনীতে ভারতের এই চারু শিল্প-নৈপুণ্যের চাক্ষস প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ; দেশে যখন এখনও এত শিল্প-দক্ষতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সুচতুর কারিকর রহিয়াছে সে কালে শিল্প কর্ম্মের অভাবে কেন দেশের এত দুর্দ্দশা ? নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিমিত্ত কেন আমরা এত পরাধীন ?

কালের গতিক্রমে মানুষের রীতি-নীতি, রুচি, পরণ, পরিচ্ছদাদির পরিবর্ত্তন সহকারে ব্যবহার্য্য নুতন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল যোগাইবার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের যেরূপ পরিবর্ত্তন, বিচিত্রতা ও উন্নতি আবশ্যক তাহা আমাদের দেশে হয় নাই। এবং সে নিমিত্ত রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল বিদ্যার বিশেষ সাহায্য আবশ্যক সে সব বিদ্যারও এখন আমাদের কোন চর্চ্চা নাই। শিল্পদ্রব্য সাধারণব্যবহারউপযোগী করিবার প্রধান উপায় তাহার মূল্য সুলভ করা—কিন্তু তাহা করিবার আমাদের উপায় কিম্বা চেষ্টা নাই। অল্প মূল্যে কোন দ্রব্য পাইলে অধিক মূল্য দিয়া সেরূপ জিনিষ লইতে আমাদের ইচ্ছা হয় না—সেই জন্য দেশী তাঁতির ব্যবসা প্রায় লোপ হইয়া আসিয়াছে ; যেরূপ সুতার যেরূপ একখানি বস্ত্র এদেশে প্রস্তুত হইলে তাহা তিন টাকার কম দামে পাওয়া যায় না—ঠিক সেই রকম একখানি বিলাতি কাপড় কিনিতে বোধ হয় দুই টাকার বেশি দিতে হইবে না। এখান হইতে অনেক কম খরচে বিলাতে বস্ত্র প্রস্তুত হয় বলিয়াই তাহা ওরূপ অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের একজন লোকের দিন মজুরি যত পড়ে, বিলাতের

একজন লোকের দিন মজুরি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী, তবে কি প্রকারে এ দেশ অপেক্ষা অত কম খরচে সে দেশে কাপড় প্রস্তুত হয়? হস্তবল অপেক্ষা যন্ত্র বলে মানুষের পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয়, অল্প কথায় পরিশ্রম সুলভ হয়। হস্তের অনেক কার্য্যই এখন ইয়োরোপ এবং আমেরিকা দেশে যন্ত্রের দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে। ছুঁচ সুতার দ্বারা সেলাই করা যে যন্ত্রের দ্বারা হইতে পারে ইহা বোধ হয় পূর্ব্বে আমরা কেহ মনেও করিতে পারিতাম না আর এখন তাহা পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কালি কলম দিয়া কাগজে লেখার কাজ কলের দ্বারা নির্ব্বাহ হইবার উপযোগী যন্ত্রও পুরাতন হইতে চলিল, আবার হরণ পূরণের কল নির্ম্মাণ দ্বারা গণিত বিদ্যা চর্চ্চার কত না সুগম হইয়াছে। ধূম কলের সাহায্যে আবার বহুবিধ যন্ত্রের ক্ষমতার সহস্র প্রভাব হইয়া পড়িয়াছে। ডাঙ্গায় গাড়ি, জলে নৌকা, ঘরে তাঁত, মাঠে লাঙ্গল এ সকলই এখন ধূম কলের দ্বারা চালিত হইতেছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যখন নানা দিকে এত উন্নতি হইয়াছে এবং দিন দিন অধিকতর উন্নতি হইতেছে তখন আমাদের দেশে তাহার অভাব কেন? ইহার জন্য অনেক কারণ আছে সত্য তবে বিজ্ঞান চর্চ্চার অভাবই ইহার মূল ও প্রধান কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সকল প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা বিশেষ তাহার সোপান স্বরূপ ভাষা শিক্ষা পর্য্যন্ত যেদেশে লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল সে দেশে কি রূপে বিজ্ঞানের চর্চ্চা থাকিতে পারে? অথচ এই ভারত ভূমিই বিজ্ঞানের জন্ম ভূমি। গণিত রসায়ণ চিকিৎসা জ্যোতিষ, ভৌতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যা সকল এই দেশ হইতেই ক্রমে আরবা মিসর গ্রীশ হইয়া ইয়োরপে প্রবেশ করে—সেই ইয়োরপে আজ এ সকল বিজ্ঞানের কত উন্নতি আর উহাদের জন্ম ভূমিতে উহাদের কি দুর্দ্দশা! এ দেশে যদি ঐ সকল বিদ্যার সূত্রপাত হইয়াই থাকিত পরে চর্চ্চা কিম্বা উন্নতি না হইত তবে বুঝিতাম ভারত ভূমি উহার উন্নতির স্থান নহে, ও সকল বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া ভারত সন্তানের ক্ষমতাতীত। কিন্তু বাস্তবিক অবস্থায় তাহা নহে এককালে যখন পৃথিবীর অন্য সকল খণ্ডের লোকেরাই প্রায় পশুবৎ অসভ্য ছিল সেই পুরাকালে ঐ সকল বিদ্যার এদেশে এত উন্নতি হইয়াছিল যে এখন পর্য্যন্তও ইয়োরোপে কোন কোন স্থলে তত দূর উন্নতি হয় নাই; আবার কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এ দেশের লোক যাহা বহুকাল পূর্ব্বে জানিয়াছিলেন ইয়োরোপে তাহা অল্প কাল হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে; যেমন পৃথিবীর সূর্য্য প্রদক্ষিণ গতি। সেই সমস্ত বিদ্যার উন্নতির পরিবর্ত্তে অজ্ঞতার উন্নতির এখন আমাদের এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে কি কি বিদ্যার তখন চর্চ্চা ছিল, কোন বিদ্যার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল তাহা জানেন এরকম লোকের সংখ্যাও দেশে এখন অতি বিরল; সেই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকটেই আমাদের ঐ

সকল সম্বাদ জানিতে হয়, তাহা নহিলে বোধ হয় আমরা ও সকল জানিতেও পারিতাম না। ইহা হইতে মনুষ্যের দুরবস্থা—উন্নতির অধঃপতন আর কি হইতে পারে?

এ দুরবস্থা মোচন করিতে ইচ্ছা করিলে ইহার মুখ্য গৌণ বৃহৎ ক্ষুদ্র সমস্ত কারণ আলোচনা করিয়া সেই সকল কারণ বিদূরিত করিবার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। কিন্তু সেই সমুদায় কারণ ও তাহা দূর করিবার সমস্ত উপায় নির্দ্দেশ করিবার স্থান এ প্রবন্ধ নহে। তবে প্রকৃত বিদ্যা চর্চ্চার অভাবই যে ইহার মূল কারণ পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, কাজেই দেশকে যদি আবার উঠাইতে হয়, যদি ভারতবর্ষীয় জাতির নাম বাঁচাইতে হয়—তবে অন্ততঃ দেশের কতকগুলি লোককে গভীর বিদ্যা চর্চ্চায় মগ্ন হইতে হইবে; আর এক কথা এই, দেশের মধ্যে তাহা হইলে একটি সাধারণ ভাষা চলিত করিতে হইবে।

দেশে সাধারণ লোকের প্রকৃত বিদ্যা চর্চ্চা করিবার পক্ষে যেরূপ বিঘ্ন দেখা যায়—দেশের সর্ব্বসাধারণ একটি ভাষা হইবার পক্ষে সেরূপ বিঘ্ন দেখা যায় না।

গভীর বিদ্যা চর্চ্চায় সক্ষম নাই হৌন দেশের ভদ্রলোক মাত্রেই এখন বিদ্যার গৌরব বুঝিয়াছেন, এই দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য পড়িয়াছে কতক পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষা এখন ইহাঁদের করিতেই হয়, এজন্য ভাষা শিক্ষা না করিলে চলে না। এরূপ স্থলে এমন একটি ভাষা যদি স্থির করা যায়—যাহা সমস্ত ভারতবাসীদের পক্ষেই সকল বিষয়ে উপযোগী তবে ভারতবর্ষের একটি সাধারণ ভাষা সহজেই হইতে পারে। আর বিদ্যা চর্চ্চা সম্বন্ধেও যতরূপই অসুবিধা থাক, যে অসুবিধা যে কেবল সাধারণ লোক সম্বন্ধে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু দেশের কতকগুলি লোকও যে অর্থ কিম্বা অন্য চিন্তা বিরহিত হইয়া বিদ্যা চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন না দেশ যে একেবারে এরূপ ধন হীন তাহাও হইতে পারে না। যদি কতক গুলি লোকেও অন্ততঃ সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ছাড়িয়া উচ্চতর উদ্দেশ্য সম্মুখে ধরিয়া বিদ্যা চর্চ্চায় জীবন দান করেন ত তাহা হইলেই দূর ভবিষ্যতে দেশের সুদিন ফিরিবে আশা করা যাইতে পারে।

অনেকেই বলেন যে অর্থ এবং ধন সম্পত্তির সহিত বিদ্যা শিক্ষার অতি দূর সম্পর্ক বাস্তবিক কি তাহা সত্য। প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে, মনুষ্য জাতির সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? কোন দেশে বিজ্ঞান কি সুকুমার বিদ্যাদির উন্নতি করিবার জন্য তাহার চর্চ্চায় সে দেশের কতকগুলি লোকের বিশেষরূপে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। যাহাদের অন্নের চিন্তা থাকে কিম্বা অন্য কোন রকম সাংসারিক অভাবথাকে তাহারা সে সব চিন্তা ছাড়িয়া কোন রূপ বিদ্যা চর্চ্চায় নিমগ্ন হইতে পারে না। সুতরাং কোন দেশে বিজ্ঞান ও শিল্পাদির প্রকৃত চর্চ্চা হওয়ার পূর্ব্বে সে দেশের ধন সম্পত্তি কতক পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়া আব-

পায়। যে দেশের কতকগুলি লোকের আপনার আপনার ভরণ পোষণের উপায় জন্য সময় ব্যয় করিতে কিম্বা চিন্তা করিতে না হইলেই তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন শিল্প প্রভৃতি বিদ্যার চর্চ্চায় সময় নিয়োগ করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থাতেই তখন সেই দেশের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি সহকারে সভ্যতা বৃদ্ধির সোপান হয়। এখানে আমরা বিদ্যার সহিত ধন সম্পত্তির অতি নিকট সম্বন্ধ দেখিতে পাই এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতীতে পরস্পর ভগিনী সম্পর্কের কারণ বুঝিতে পারি।

বিষয় চিন্তা কিম্বা সাংসারিক অভাব মোচনের নিমিত্ত যাহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত তাহারা প্রকৃত বিদ্যা চর্চ্চা করিতে পারে না—বিজ্ঞানের গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে পারে না—এই জন্যই ধন সম্পত্তির সহিত বিদ্যার দূর সম্পর্ক, লক্ষ্মী সরস্বতী দুই জনের সহিত ভগিনী সম্পর্ক থাকিয়াও ইহারা আবার এই জন্য উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই জন্যই পুরাকালে যে ব্রাহ্মণগণ নিষ্কাম ভাবে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাতে চিরজীবন কাটাইতেন তাঁহারাই সর্ব্বত্র পূজিত হইতেন। বিদ্যা তাঁহারা দান করিতেন অর্থ মূল্য লইয়া বিক্রয় করিতেন না। অধ্যাপকদের বাটীতেই ছাত্রগণ আহারাদি করিতে পাইত। এক এক জন অধ্যাপকের নিকট অনেক ছাত্রগণ এইরূপে একত্র থাকিয়া সুশিক্ষিত এবং লালিত পালিত হইত ঐ সকল সৎব্যয় নির্ব্বাহ জন্য রাজা প্রভৃতি ধনশালী লোকে বৃহৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান কালে এবং নিয়মিত রূপে সময়ে সময়ে সেই অধ্যাপকগণকে সাহায্য করিতেন এবং সেই প্রথা অনুসারেই এখন সঙ্গতিপন্ন লোকে ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে অধ্যাপকগণকে আহ্বান ও তাহাদিগকে অর্থদান করিয়া থাকেন। অর্থ সাহায্য ব্যতীত বিদ্যার উন্নতি হয় না; কিন্তু সর্ব্ব মতান্ত গর্হিতম এখানেও দেখা যায়। অর্থ হইতেই যেমন বিদ্যার উন্নতি তেমনি আবার অর্থের আতিশয্য হইতেই বিদ্যা নাশ ঘটে, অধিক অর্থ ভোগে লোকে অধিক বিলাসী বৃথা আমোদ প্রিয় হইয়া বিদ্যা চর্চ্চার নিমিত্ত যেরূপ আয়াস ও যত্ন স্বীকার করা অতি প্রয়োজন তাহাতে অক্ষম হইয়া পড়ে, এবং এইরূপে অতিরিক্ত ভোগী হইয়া অনেক স্থলে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভাব সকল মন হইতে দূরে চলিয়া যাইতে থাকে।

লক্ষ্মীর অভাবেই এখন দেশে সরস্বতী নাই কিন্তু মূল দেখিতে গেলে—উল্লিখিত প্রকারে সরস্বতীকে ছাড়াতেই লক্ষ্মী দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। ভোগস্পৃহা হইতেই আধ্যাত্মিক দুর্গতি এবং দুর্নীতি উৎপন্ন হইয়া আমাদিগকে অলস, এবং স্বার্থপর করিয়া তুলিল। এক দেশের লোকদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইলে তাহার যে কি মন্দ ফল হয় প্রাচীন রোম ও আধুনিক ফরাসী দেশ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। দুর্নীতি—এবং আলস্যপরবশ ও স্বার্থপর হইয়াই আমরা ক্ষুদ্রাশয় এবং ক্রমে পরাধীন হইলাম-দেশে যবনরাজ্য স্থাপিত

হইল, ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ দৃঢ় হইল, বিদ্যা চর্চ্চার কথা দূরে থাক ক্রমে ভাষা শিক্ষা পর্য্যন্ত রহিত হইল; যে সংস্কৃত ভাষার ন্যায় উন্নত ভাষা অদ্যাপি পৃথিবীর অন্য কোন দেশে কোন স্থানে সৃষ্টি হয় নাই ইয়োরোপে যার এখন এত আদর এত প্রশংসা সেই সংস্কৃত ভাষা পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়া গেলাম। সংস্কৃতই ভারতবাসী আর্য্যগণের ভাষা, সমুদয় শাস্ত্রই এই ভাষাতে লিখিত। ভাষা পর্য্যন্ত যখন আমরা ভুলিয়া গেলাম তখন আর কি প্রকারে শাস্ত্র পড়িব? এবং না পড়িয়া কিরূপে তাহার মর্ম্ম জানিব? দেশের আসল ভাষা এইরূপে লুপ্ত-প্রায় হইলে, বিষয় কর্ম্মের অনুরোধে হিসাব পত্র রাখা ইত্যাদির নিমিত্ত কোন না কোন একটা ভাষার প্রয়োজন হওয়াতে লোকেরা সংস্কৃতের অপভ্রংশ, অশিক্ষিত লোকের, ইতর লোকের কথিত ভাষাকে লিখিত ভাষা করিয়া লইল, এই প্রকারে দেশ কাল এবং পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জঙ্গলা ভাষার সৃষ্টি হইয়া পড়িল— সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালাই ঐসব ভাষার বর্ণমালা হইয়া পড়িল। অনেক সংস্কৃত কথাও তাহাতে প্রয়োগ হইল। কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত ঐ সব মিশ্র ভাষার সম্পর্ক প্রায় রহিত হইল। এই প্রকারেই প্রথমে বাঙ্গালা, হিন্দী, পঞ্জাবী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী, কেনারী প্রভৃতি ভাষার জন্ম হইল। যবন অধিপতিগণের প্রবর্ত্তক লোকে কার্য্য গতিকে আরবী পারসীও শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ভারতের বিভিন্ন খণ্ডের ভাষা বিভিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে অন্য অনেক অনর্থের কারণ উৎপত্তি হইতে লাগিল। এক সংস্কৃত ভাষা হইতে যেমন বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইল তেমনি আবার এক আর্য্য সন্তানগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, গুজরাটী, পঞ্জাবী মাদ্রাজী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সেই বিভিন্নতা এতদূর বাড়িয়াছে যে কেবল উপর উপর দেখিলে মনে হয় ভারতের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডবাসী আর্য্যগণ এখন যেন এক একটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কারণ দেশ ভেদে যেমন জাতি (nation) ভেদ হয় ভাষা ভেদেও অনেক পরিমাণে সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। সমগ্র ভারতবাসী আর্য্য সন্তানগণের সাধারণ ভাষা যেমন এক সংস্কৃত ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে অপর কোন একটি ভাষা যদি পরে তাঁহাদের সাধারণ ভাষা হইত তাহা হইলে এরূপ ঘটিত না। যত দিনে আবার একটি ভাষা সমুদয় ভারতের সাধারণ ভাষা না হইবে ততদিন সমুদয় ভারতবাসীগণ প্রকৃতরূপে এক জাতি হইবে না; এক জাতি না হইলে যে আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘুচিবে না ইহা বোধ হয় বলা বাহুল্য।

ইংরাজী যদিও ভিন্ন দেশের ভাষা তথাপি এখন ভারতের সকল খণ্ডেই ঐ ভাষার চর্চ্চা হওয়াতে এক খণ্ডের লোকেরা অপর খণ্ডের লোকদের সহিত উহার সাহায্যে পরস্পরের মনের ভাব বিনিময় করিতে

পারেন, ইহাতে জাতীয় ভাবের বীজ আবার আমাদের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সমুদয় ভারতে এক সাধারণ ভাষা প্রচলিত হইলে যে কি শুভ ফল ফলিতে পারে ইহা হইতে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু ইংরাজী ভাষাই কি আমাদের জাতীয় ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে? তাহা কখনও হইবে না, তাহা বাঞ্ছনীয়ও নহে, এবং ভারতে এখন যত প্রকার মিশ্র-ভাষা প্রচলিতআছে তাহার কোন একটিও দেশের সাধারণ ভাষা হইবার মত নাই কেবল সংস্কৃত ভাষাই সে স্থান পুনরায় অধিকার করিবার উপযোগী।

উপরি উক্ত অপভ্রংশ ভাষাগুলিরও এখন অবস্থা পরিবর্তন হইয়াছে, পূর্ব্বে ঐ সকল ভাষায় যে সকল ভাব প্রকাশ হইত না তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত উহাতে অনেক নূতন কথার ব্যবহার হইতেছে, সংস্কৃত ব্যাকরণ সংক্ষেপ করিয়াই উহাদের ব্যাকরণ হইতেছে এবং সংস্কৃত শব্দ হইতেই নূতন নূতন কথা বাড়িতেছে। এইরূপে ক্রমে যদিও ঐ সকল ভাষা মূল সংস্কৃত ভাষারদিকে অগ্রসর হইতেছে তবুও ঐ সমস্ত ভাষা একত্র মিলিয়া কিম্বা উহার মধ্যে কোন একটির, পরে এক সাধারণ ভাষা হওয়া অসম্ভব। এখন ভারতে এত অধিক ভাষা যে তাহার এক ভাষায় লিখিত কোন পুস্তক কেবল এক স্থানের লোকদেরই ব্যবহারে আইসে অবশিষ্ট কোন স্থানের লোকদের তাহাতে কোন উপকার হয় না। সেই জন্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে এক সময়ে এক বিষয়ে এক ভাব প্রকাশ করিতেই অনেক কৃতবিদ্য লোককে এখন সময় কাটাইতে হয়। সর্ব্বত্র এক ভাষা প্রচলিত থাকিলে তাহার মধ্যে এক জন লোক সেই ভাষায় কোন বিষয় লিখিলে তাহাই সকল স্থানের সকল লোকদের ব্যবহারে লাগিত। অপর কয়েক জনের মধ্যে কেহ তাহার উন্নতির নিমিত্ত কেহ অপর আবশ্যকীয় কর্ম্মে সময় নিয়োগ করিয়া দেশের অধিক কাজ করিতে পারিতেন।

একটু চিন্তা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে এখন পর্য্যন্ত কিয়ৎপরিমাণে সংস্কৃত ভাষাই ভারতের সর্ব্বসাধারণ ভাষা রহিয়াছে। হিন্দুস্থানী, গুজরাটী বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী আমরা যে যাহাই হইনা কেন, আমাদের সকলকারই ধর্ম্মশাস্ত্র এখনও একই রহিয়াছে এবং ভারতের যেখানেই যাই সে খানে এখনও যে দুই চারি জন যথার্থ পণ্ডিত দেখিতে পাই সংস্কৃতই তাহাদের সকলের ভাষা এবং যে দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত পুস্তক সকল লিখিত সে দেবনাগরী অক্ষরও এখনও দেশের সর্ব্বভাগেই চলিত আছে; সংস্কৃতের চর্চ্চা কিছু বৃদ্ধি হইলেই ভারতের একটি জাতীয় ভাষা হইবে এবং আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের প্রাচীন ঋষিগণের ভাষা, পুনরায় দেশের সাধারণ ভাষা হইয়া পুনর্জ্জীবিত হইলে সাধারণের সম্মুখে দেশের বিদ্যাভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া যাইবে। তাহা হইলে নূতন জ্ঞান এবং নূতন বল পাইয়া আমাদের নির্জ্জীব ভাবও

জীবন্ত হইয়া উঠিবে এবং ভারতের উন্নতির সোপান দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইবে।

আমরা অল্প যাহা বলিলাম তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে ভারতের যথার্থ উন্নতির নিমিত্ত ইহার সকল খণ্ডেই এক সাধারণ ভাষা প্রচলিত হওয়া কত প্রয়োজন এবং যেকালে এক সংস্কৃত ভাষাই সে উদ্দেশ্য সফল করিবার উপযোগী সে কালে সেই সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা বৃদ্ধি জন্য আমাদের সকলেরই সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। এখানে কেহ যেন মনে না করেন যে ইংরাজি ভাষাকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত ভাষা স্থাপন করার কথাই এখানে বলা হইতেছে। না, তাহা হইলে দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে না। দেশের উন্নতির জন্য ইংরাজি ভাষার চর্চ্চাও প্রয়োজন। বহু পুরাকালে আমাদের দেশে কোন বিদ্যার কত উন্নতি হইয়াছিল তাহা জানিবার জন্য ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ কি প্রকার যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন তাহা দেখিয়া একজন সহজে বুঝিতে পারেন যে ইয়োরোপে যে উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা জ্ঞাত হওয়া আমাদের কত অধিক প্রয়োজন? সংস্কৃত মৃত ভাষা, ইংরাজি জীবন্ত ভাষা, সংস্কৃত ভাষায় যে সকল জ্ঞান বদ্ধ রহিয়াছে তাহা সংস্কৃত শিক্ষা দ্বারা আমরা লাভ করিতে পারি আর ইয়োরোপ অধুনা যে সকল জ্ঞান লাভ করিতেছে তাহার ভাগ লইতে গেলে ইয়োরপীয় কোন ভাষা আমাদের জানিতেই হইবে। এ অবস্থায় ইংরাজি শিখিতেই আমাদের সকল দিকে সুবিধা। কেন না ইংরাজি ভাষা আমাদের রাজ ভাষা, কেবল ইয়োরপীয় বিদ্যাচর্চার ফল লাভ করা ছাড়া অন্য কারণেও ইংরাজি ভাষা না জানিলে আমাদের চলে না। তবে, কি ভাষা, কি বিজ্ঞান, কি অন্য প্রকার শিক্ষা, সকল শিক্ষারই প্রয়োজনের তারতম্য আছে, আমরা যদি সেই তারতম্য বুঝিয়া চলি, মুখ্যকে গৌণ এবং গৌণকে মুখ্য বলিয়া ভুল না করি এবং সেই অনুসারে আপন আপন পুত্র কন্যাগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করি তাহা হইলে আমরা যথার্থ এবং স্থায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব, বিদ্যা শিক্ষার মহত্তর উদ্দেশ্য লাভ করিতে পারিব। বিদ্যা শিক্ষার যে ফল লাভে আপনার, দেশের এবং সমগ্র মনুষ্য জাতির উপকার করা যায়—তাহাই বিদ্যা শিক্ষার মহত্তর উদ্দেশ্য।

পশু হইতে মনুষ্য যে শ্রেষ্ঠ জীব ইহা আমরা প্রতি কথায় বলিয়া থাকি, কিন্তু পশু অপেক্ষা আমরা কিসে শ্রেষ্ঠ? শারীরিক শক্তি, হস্তপদ চালনার ক্ষমতায় কি মানুষ পশু পক্ষী হইতে শ্রেষ্ঠ? না। আমরা আমাদের যে বুদ্ধির এত আত্ম শ্লাঘা করি সে বুদ্ধিও কি পশুদের নাই? হস্তী, অশ্ব, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি পশুদের বুদ্ধির পরিচয়ে সময় সময় আমরাই অবাক হইয়া যাই। তবে তাহাদের অপেক্ষা আমাদের শ্রেষ্ঠতা কোথায়? সংক্ষেপে বলিতে গেলে মনুষ্য-বুদ্ধি দুই শ্রেণীতে

নিন্দ্রা। বাবুই পক্ষীর বাসা নির্ম্মাণের শিল্পনৈপুণ্যে, শৃগালের চতুরতায় যে প্রকারের বুদ্ধি প্রকাশ পায় তাহাও বুদ্ধি, কিন্তু যে বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্য ন্যায়ান্যায় বিচার করিতে পারে অসত্য হইতে সত্য বাছিতে পারে জীবনের প্রকৃত মহান উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারিয়া এই পৃথিবীর স্বার্থপরতা ত্যাগ করিতে পারে—সেই বুদ্ধিতেই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা দেখা যায়। এবং যেরূপ শিক্ষায় এইরূপ বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত করে তাহাই যথার্থ শিক্ষা।

কারে—ডাক জলধর ?

১

মথিয়া অনন্ত শূন্য মর্ম্মভেদী স্বরে,-কারে-
ডাক জলধর ?
সাধনার ধন যাহা, মিলে কি কাঁদিলে তাহা
যুগ যুগান্তর !
প্রাণের আঁধারে জ্বলে,প্রাণের আঁধারে নেভে
প্রাণে যার স্থান,
প্রাণের বাহিরে তাঁরে কাঁদিয়া ডাকিলে, তবু
মিলে না সন্ধান।
জুড়াতে প্রাণের তৃষ্ণা, বিহঙ্গ অনন্ত পথে
উধাও কাঁদিয়া,
প্রাণের সৌরভ খুঁজি, কুরঙ্গ বিশাল বন
ভ্রমিছে ছুটিয়া।
আশা—জীবনের ভ্রান্তি, কল্পনার প্রস্রবিনী
যন্ত্রণার মূল
বিকৃত প্রবৃত্তি আশা,—জীবের পার্থিব মায়া,
কলুষ বিপুল।
সেই আশা হৃদে ধরি, হৃদয়ের ধনে তুমি
ডাক জলধর।
আশা না ভুলিলে কভু,মিলে কি আশার ধন
অবোধ অম্বর !

২

সাধিতে না জানে যেই, রোদন সম্বল তার
অকৃতি সে জন।
প্রাণের তৃষিত ধন, কাঁদিলে না মিলে রে—
সম্বর রোদন।
হের এই হৃদিতল কি দশা হইয়াছিল
কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
মথি শূন্য ধরাতল, কেঁদেছি আকুল প্রাণে
তাঁহারে ডাকিয়া।
শিহরিত পঞ্চ ভূত ব্রহ্মাণ্ড উঠিত কাঁদি
আমার রোদনে।
মেদিনী কাতরা হ'য়ে হৃদয়ে জড়া'য়ে মোরে
ধরিত যতনে।
ওই চন্দ্র সূর্য্য তারা, হৃদয়ের অন্ধকারে
জ্বলিতে চাহিত।
ওই বিহঙ্গম কুল শূন্য করি কণ্ঠ, প্রাণে—
সঙ্গীত ঢালিত।

ওই বন উপবন ... ৰ্য্য তুলিয়া তার
...র।
গিরি নদী গি... সম্মুখে ধরিতউ্খুলি
... ভাণ্ডার।

৩

যা কিছু বৈ... , সেই শূন্য হৃদি তলে
উঠিত উথলি,
আমার প্রাণের রত্ন ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া নাহি
মিলিত কেবলি,
জগৎ আকুল ক'রে উঠেছিল যে রোদন
সেই সে রোদন—
হৃদয়ের দ্বারে তাঁর একটী আঘাত নাহি
করিত কখন।
তোমার হৃদয়ময়ী ওই চপলার মত
থাকিয়া থাকিয়া।
প্রাণের আঁধারে মম, জলিয়া, সে অন্ধকারে
যাইত নিভিয়া।
বিপুল ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ অন্ধের হৃদয়-রাজ্য
যেমতি আঁধার
তেমতি এ পূর্ণপ্রাণ, আঁধারে রহিত ডুবি
বিহনে তাঁহার।
তখন বুঝিনু স্থির, পার্থিব-বৈভব-পূর্ণ
হৃদয় আমার,—
আশা তৃষ্ণা অভিমান, রূপান্তরে স্বার্থ যথা,
নহে স্থান তাঁর।

৪

বসিলাম যোগাসনে সৃজিতে আশ্রম নব
হৃদয়ে আমার।
সুখ—দুখ—অভিলাষ, সংযত করিয়া, চিত্ত
করিনু সংস্কার।
ভূত ভবিষ্যৎ ভুলি, সেবিলাম বর্তমানে
আনন্দের ভরে।
প্রাণের অতল তলে ডুবিলাম একা আমি
সাধনার তরে।
পূর্ণ করি সেই পুরী ডাকিনু কাতর স্বরে
দেবীরে আমার
অনন্ত সে প্রাণ-পুরী উজলিয়া বিকাশিল
প্রতিভা তাঁহার।
স্বার্থের বিপুল বিশ্ব গ্রাসিতে সহসা প্রাণ
হইল অস্থির
আকুলিয়া আলোড়িয়া,
উৎক্ষেপিয়াপ্রোৎক্ষেপিয়া
চূর্ণ করি তীর—
দুরাশার মহাসিন্ধু আঁধার সে হৃদিতলে
গেল শুকাইয়া।
শুষ্ক বেলা ভূমে তার পিপাসার মহানদী
গেল মিলাইয়া।

৫

মৃৎময় বারিময় কাষ্ঠময় শিলাময়
বসুধা আকৃতি,
সূর্য্যময় চন্দ্রময় গ্রহময় শূন্যময়
অনন্ত প্রকৃতি—
শূন্য করি অন্ধকার খসিয়া হইল চূর্ণ
নিভৃত অন্তরে
সে মহা শ্মশান স্থলে, সৃজিনু মন্দির আমি
আত্মার প্রাচীরে।
সংযমে জুড়িয়া প্রাণ, তৃপ্তির অতল জল,
করিয়া বিদার—
অক্ষুব্ধ পবিত্র বারি, মন্দিরের পদমূলে
করিনু প্রচার।

"শান্তি" নামে সেই নদী, প্রবাহিত আজ তথা
কর দরশন।
হের তার দুই তীরে "আত্মদান" নামে তরু
করেছি রোপণ।
দেবী প্রতিভার আভা, করি ঘণীভূত, তায়—
গঠিনু আকৃতি।
প্রবেশি মন্দিরে হের প্রতিষ্ঠা করেছি মম
দেবীর মূরতি।

৬

এ নহে সে দেবীমম, শারদ উৎসবে যাঁরে
বাঙ্গালীর ঘরে
মাটির প্রতিমা গঠি রাঙ অলঙ্কার দিয়ে
উপাসনা করে।
বনজাত তৃণ তুলি সুলভ গাঙ্গেয় ঢালি
অর্চ্চনা যাঁহার
মনঃ দেহি মানং দেহি, দেহি দেহি একি মন্ত্রে,
আরাধনা যাঁর।
এ নহে সে দেবীমম পরমার্থ প্রদায়িনী
যাঁর নিরাকার,
কাননে ভূধরে বসি ধ্যান মগ্ন ঋষিকুল
পূজে অনিবার।
জীবন্ত এ দেবী মম বসন্তের স্বরূপিনী
সদা প্রফুল্লিতা
প্রেম-পদ্ম বিরাজিনী, পূর্ণ প্রীতি বিধায়িনী
একি' ভক্তে প্রীতা।
পরকাল হ'তে দূরে বিরাজিতা এ সংসারে
তবু সাধনায়
প্রাণের মন্দিরে মম সতত প্রসন্নময়ী
কল্পতরু প্রায়।

৭

দেখিয়াছ কিবা ধ্যান, শুনিয়াছ কিবা স্তুতি
জীবের সংসারে
শুন আজ কোন [illegible] প্রাণেশ্বরী মম
কি [illegible]র।

স্তো[illegible]

"দেবি!
আবৃত শরীরে তুমি, [illegible]লে
বিরাজ আ[illegible]
স্পর্শ শক্তি রূপে তুমি, [illegible] শরীরের ত্বকে
সতত প্রচার।
শব্দ শক্তি রূপে তুমি, শ্রবণের মূলে মম
কর অবস্থান।
জ্ঞান রূপে চিত্তে মম, ঢালিয়া অমৃত ধারা
তুমি বিদ্যমান।
দর্পন বিহনে যথা স্বীয় বদনের শোভা
নহে অনুমান।
তোমা বিনা সেইরূপ প্রাণের ব্রহ্মাণ্ড মম
নহে বিদ্যমান।
তুমি মম—আমি তব, যেই তুমি সেই আমি
নহি ভিন্নাকার।
তব অপার্থিব রূপে, আমারো তদ্গত প্রাণে
করি নমস্কার।

৮

প্রাণের হারাণ ধন, চাহ যদি জলধর
সম্বর রোদন
আপন হৃদয় তলে, মগ্ন হ'য়ে অবিষাদে
কর অন্বেষণ।
আপনার সাধনায় নহে উপার্জ্জিত যাহা
সে ধন কি মিলে?
সে নহেরে ধন সেই, প্রাণ কাঁদে যার তরে
অন্যে যদি দিলে।
সাধিতে যে জন জানে কঠোর সাধনে তাঁর
সকলি আপন,

সে জন কি রহে ভুলি, কোথায় বিরাজে তাঁর
জীবনের ধন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড খুঁজি, যে ধন পা'বার নয়,—
প্রাণের মন্দিরে—
হৃদয়ের অন্ধকারে　　দেবীরূপে সেই ধন
সদা বিহরে।

"তুমি-মম" ভাবি যেই খুঁজে সেই [illegible]
ভকত সে নয়।
"আমি-তব" ভাবি যেই করে তাঁর উ[illegible]
তাহারে সদয়।

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাউ সাহেবের বখর।

তথা হইতে মারয়াড় প্রান্তে যাইবার কালে উদেপুর রাজ্যস্থ শিবসিং সিসওদে আসিয়া নিবেদন করিল, "শিবপুরের রাজা আমার চাকর হইয়াও নানা প্রকার গোল যোগ করিতেছে। ছোট বড় কিল্লা বল পূর্ব্বক হস্তগত করিয়া আমার মতের বিরুদ্ধে নিজ প্রান্তে ধূমধাম করিতেছে। এই নিমিত্ত বর্ষার চতুর্মাস শিবপুরের নিকটে বাস করুন বিংশতি লক্ষ টাকা দিব। শিবপুর ও দুর্গ আমার অধীন করিয়া দিন।" জনকোজী বিবেচনা করিলেন "দত্তাজী শিন্দে গ্রামে গিয়াছেন, তিনি আসা পর্য্যন্ত চতুর্মাস চুপ চাপ করিয়া যে কোন স্থানে কাটাইতে হইত তাহা অপেক্ষা এ উত্তম। একপথ দুই কাজ।" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। শিবপুর বেষ্টন করিয়া রহিলেন। রাণোজী ভোইটে উত্তম কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি টেকাল গড়ে মোর্চে লাগাইয়া ছিলেন। হঠাৎ মোর্চে হইতে গোলা লাগিয়া তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। জনকোজী এই সংবাদ পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। সেই খানেই দিপবালি হইল। শিবপুরের রাজাকে হস্তগত করিয়া উদেপুরের রাণোজীর সহিত ঐক্য করিয়া দিলেন। রানোজীর আজ্ঞায় সেবাবৃত্তিতে থাকিবে এইরূপ অঙ্গীকারানুসারে কর গ্রহণ করিলেন।

রঘুনাথ দাদা লাহোরে কার্য্য সিদ্ধি করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথে জনকোজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। জনকোজী তাহা জানিতে পারিয়াই সসৈন্যে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। দাদা সাহেবও স্বীয় শিবির হইতে দুইক্রোশ অগ্রসর হইয়া আসিলেন। উভয়ে সাক্ষাৎ হইল; দাদা সাহেব জনকোজীর শিবিরে আসিয়া তাঁহাকে একান্তে এই মন্ত্রণা দিলেন "তুমি এ বৎসরের কার্য্য নষ্ট করিলেও ক্ষতি

পরিশ্রম অনুষ্ঠানার্থে যদি ক্রোর টাকা ব্যয় হয় তাও দিব। কিন্তু নজীবখান রোহিলাকে শাস্তি দিবে, তাহার প্রাণ থাকিতে ছাড়িবে না এই ভিক্ষাটি আমাকে দাও। আমিই তাহাকে শাস্তি দিতাম কিন্তু মলহার রাওয়ের অনুরোধে পারিলাম না। তিনি তাহাকে আপনার ধর্ম্মপুত্র বলিয়া সেই অনুরোধে অন্তর্ব্বেদ-প্রান্ত ও কুরুক্ষেত্র হইতে কুঁজ-পুরা পর্য্যন্ত চল্লিশ লক্ষ টাকার বিষয় তাহার অধীন করিয়া দিলেন। মলহার রাওয়ের পুত্র অনেক। বিজয় নগরের মাধবসিং ও মারবাড়ের বিজেসিং এই প্রকার অনেক আছে। আবার নজীবখান রোহিলা এক পুত্র হইল। তিনি যতগুলিকে পুত্র বলিয়াছেন ততগুলি ফলও ভুগিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহার অহঙ্কার যায় না। তাহার যতগুলি ধর্ম্মপুত্র সবগুলি কুলাঙ্গার। আমি নজীবখানের পাগলাকুকুরের দশা করিতাম কিন্তু 'ঘৃতের কলসে ইন্দুর বসে' সেই প্রকার ঘটিয়াছে। এক্ষণে আঁচল পাতিয়া তোমার নিকটে এই ভিক্ষামাত্র চাহিতেছি।" ইহা বলিবামাত্র জনকোজী শিন্দে বন্দনা করিয়া নিবেদন করিলেন, দাদাসাহেব, আমি আপনার ভৃত্য, যেরূপ আজ্ঞা করিবেন তাহাই হইবে। নজীবখান কোন পদার্থ? তাহার শাস্তির ভার আমার রহিল। কিন্তু আপনি লাহোর মুলতান পঞ্জাব অটক পর্য্যন্ত জয় করিলেন এখন আমি কোনদিকে যাত্রা করিব?" দাদা-সাহেব উত্তর দিলেন, "তুমি নজীবখানের শিরচ্ছেদ করিলে তোমা দ্বারা আমার সকলি হইল।" এই প্রকারে তিনবার বলিলেন। পরে বহুমান, হাতি, ঘোড়া, রত্নাদি দিয়া রাজশ্রী রঘুনাথরাও দেশে আগমন করিলেন।

দশ পনের দিন পরে মলহাররাও আসিলেন। তাঁহাতে শিন্দেতে বার ক্রোশ অন্তর থাকিতে তিনি গঙ্গাধর তাত্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "[illegible] শিন্দেতে আমাতে সঙ্গী ছিলাম। ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত আমাদের ভয় করিত। আর যে কোন কর্ম্ম অসাধ্য তাহা সাধ্য হইত। আমার একটি পুত্র, সেও পিশাচবৎ এবং আমার বার্দ্ধক্য। যে কোন প্রকারে হয় জনকোজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মনের মালিন্য দূর করিয়া তাহার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিতে হইবে।" এই বলিয়া গঙ্গোবা তাত্যাকে জনকোজী শিন্দের নিকট পাঠাইলেন। গঙ্গোবা তাত্যা সাক্ষাৎ করিয়া মমতার সহিত অতি নম্র ভাবে নিবেদন করিল, "সুভেদারের বৃদ্ধাবস্থা এবং তুমি সুবোধ লোক। সুভেদার দেখা করিতে আসিতেছেন। তুমি তাচ্ছিল্য করিবে না।" জনকোজী বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন, "তাঁহাতে আমাতে স্বর্গে সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে তোমাদের যাহা উচিত বোধ হয় কর?" ইহা শুনিয়া গঙ্গোবা তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। তখন জনকোজী এক কথায় তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন, 'দত্তাজী শিন্দে আমার গুরু লোক, তাঁহার অনুপস্থিতিতে এ প্রকার দেখা শুনা করা উচিত হয় না।" এই বলিয়া গঙ্গাধরকে বিদায় করিলেন।

ক্রমশঃ।

চারুতার জয়!

অশ্বতেজে ভরা,
মৃদু হস্তে মরা;
চারুতার কাছে আর দর্প খাটে কার!"
স্বপ্নপ্রয়াণ।

আমাদের দেশের একজন গভীর চিন্তা-শীল দার্শনিক কেমন সরল ও মধুর কবিতায় এই মহান্ সত্যটি প্রচার করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কুটিল রাজনীতি অনুমোদিত কঠোর পশুবলের পক্ষপাতী তাঁহাদের নিকট সবিনয় প্রার্থনা এই যে তাঁহারা একবার ক্ষণকালের জন্য উল্লিখিত সুন্দর কবিতাংশের সারবত্তা ও মধুরতা অনুভব করিয়া দেখুন [illegible] চারুতা লাভ করিলে মানব যথার্থ [illegible] হয় না, জগতের চারুতাতেই মানব [illegible]। যাঁহারা বিশুদ্ধ হৃদয়-জাত বিশ্ববিজয়ী নৈতিক বলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পঙ্কিল-হৃদয়-উৎপন্ন বিকৃত পশুবলের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শিষ্য হইয়াছেন তাঁহারা যতই দাম্ভিক ও গর্ব্বিত হউক না কেন, তাঁহাদিগকে অবনত মস্তকে এই মহা সত্যের বিজয় অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরের জগতে যিনি উদার হৃদয়ের অনন্ত প্রীতি ও অনন্ত প্রেম বিতরণ করিয়া কোন একটি মহান্ সাধনায় সিদ্ধ হইতে বাসনা করেন, এবং জগতের অযুত নর নারীকে তাহার অমৃতাস্বাদ দানে কৃতার্থ করিতে সঙ্কল্প করেন তিনি ধন্য—তাঁহার জীবন অনন্ত পুণ্যের সুমধুর উৎসব-ক্ষেত্র। তিনিই প্রকৃত বীর—তাঁহার বীরত্ব অতুলনীয় এবং অনন্তকাল স্থায়ী—আমরা তাঁহাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করি।

পশুবলের উপাসকগণ অল্প কালের জন্য বিজয়ী হইতে পারেন বটে, কিন্তু [illegible] পরিণাম ঘোর পরাজয়! আলোকের [illegible] অন্ধকার যেমন অখণ্ডনীয়, [illegible] উত্থান ও জয়ের পর পতন ও পরাজয় [illegible] নাই নিশ্চিত। ভারতের [illegible] কর্ত্তা পশুবলের উপাসক, এবং [illegible] শাসনকর্ত্তা নৈতিকবলের [illegible] একজন কলঙ্কিত মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীন[illegible] ও অস্ত্র বিষয়ক আইন প্রভৃতি নিষ্ঠুর [illegible] প্রণয়ন করিয়া ২০ কোটি ভারতবাসীর দারুণ অশ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছিলেন। অপর জন স্বায়ত্ত-শাসন প্রণালী ও শিক্ষা-বিভাগ সংস্কার প্রভৃতি মঙ্গলকর বিষয়ের অবতারণা করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণ মন ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

পশুবলের মন্ত্র-শিষ্য প্রবল পরাক্রান্ত ফরাশিস্ বীর নেপোলিয়ন্ শাণিত অসি, সুতীক্ষ্ণ বেওনেট্ ও বিশ্বগ্রাসী কামান বলে কিছু দিনের জন্য স্বীয় দুর্দ্দমনীয় রাজ্য জয়-

[বা]সনা চরিতার্থ করিয়াছিলেন—কিছু দিনের জন্য তাঁহার রুদ্রতেজে সমগ্র ইয়রোপ ভীত ও কম্পিত হইয়াছিল—কিন্তু কিছু দিন পরেই তাঁহার যে পরিণাম উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নিরবচ্ছিন্ন বিষাদময়! অমর ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে জগতে তাঁহার শোচনীয় পতন ও পরাভব ঘোষণা করিতেছে। তিনি শত্রু-হস্তে বিজিত ও বন্দী হইয়া দেশ হইতে জন্মের মত নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। একদিন তিনি তাঁহার অদৃ[illegible] পরিবর্ত্তন চিন্তা করিয়া কাঁ[illegible] বলিয়া ছিলেন, "অহো! [illegible] জ্ঞানী রাজা হইয়াও জগতের [illegible] [জানি]তাম না; কিন্তু ভিখারী [illegible] [ভ]ক্তের মহত্ত্বের সাধনে ধন্য [illegible] এই আক্ষেপে তাঁহার [illegible] অনুতাপ প্রকাশ করি[illegible]

[illegible] জগতে [illegible] অদ্ভুত [illegible] পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। [illegible] তিনি তৎসমসাময়িক অকৃতজ্ঞ মানব-মণ্ডলীর উদ্ধারের জন্য নিয়ত কঠোর যন্ত্রণা ভোগ এবং পরিশেষে স্বীয় মহা মূল্য জীবন হাসিতে হাসিতে বলিদান করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের কি বিচিত্র চারুতা, এবং চরিত্রের কি অপরূপ মধুরতা—আজিও তিনি শিক্ষিত জগতের কোটি কোটি নর নারীর হৃদয়-জাত ভক্তি কুসুমাঞ্জলি লাভে জীবিত রহিয়াছেন!

আমাদের দেশে শুভক্ষণে রাম জন্মিয়াছিলেন। কোন কোন [বৈ]দেশিক সমালোচক বলেন, রামচন্দ্র কবি কল্পনার এক অতি অদ্ভুত সৃষ্টি—তিনি অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র নহেন। একথা আমরা সম্পূর্ণ রূপে অবিশ্বাস করি। হৃদয়ের মধুরতা প্রভাবে আমাদের রামচন্দ্র ভীষণ শত্রুরও আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ এবং সমস্ত ভারতবাসীর অকৃত্রিম ভক্তি লাভ করিয়া অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কঠোর সাধনা ভারতের গৌরবের পরিচায়ক। ধন্য সেই দেশ যে দেশে তাঁহার জন্ম, এবং ধন্য সেই মহা কবি যিনি তাঁহার পূর্ণবিকশিত চরিত্রের গুণ গান করিয়াছেন!

আর রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ভিখারী হইয়া যে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন সে কীর্ত্তি কোন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন? সিদ্ধার্থ দিবানিশি সুখের নিকুঞ্জ মধ্যে কাল কাটাইতেন, দুঃখ কাহাকে বলে জানিতেন না—তিনি জানিতেন সমস্ত জগতই সুখময় সমস্ত জগতই [illegible]ময়। সহসা চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন জগতে কাহারো সুখ নাই শোক তাপ-দুঃখ-জ্বালায় জগৎ দিবানিশি হাহাকার করিতেছে। পর-দুঃখে সিদ্ধার্থের হৃদয় বিদীর্ণ হইল, এক মাত্র পরোপকারকে জীবনের ব্রত রূপে ধরিয়া অতুল বিভব, রাজ সিংহাসন, প্রাণের অধিক স্ত্রী পুত্র সকলকে ত্যাগ করিয়া জগতের দুঃখ নিবারণের উপায় অনুসন্ধান করিতে বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হইলেন। এই যে হৃদয়ের বীরত্ব ইহার সহিত আর কোন বীরত্বের তুলনা?

অল্পদিন হইল আমাদের চৈতন্যও হৃদয়ের মধুরতার প্রবাহ ঢালিয়া দিয়া এক মহা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন! তিনিও পবিত্র পিতার নাম লইয়া প্রাণ ভরিয়া গাইয়াছিলেন,

"তোমারই জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারই কার্য্য যা সাধিব!"

কে বলে তিনি সাধনায় সিদ্ধ হন নাই? তাঁহার জন্মভূমি বঙ্গদেশ অশিক্ষিত হউক, তাঁহার উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম না হউক, এবং অন্য বহুবিধ দোষে দোষী হউক, কিন্তু বঙ্গ-সন্তান অকৃতজ্ঞ নহে, আজিও বঙ্গের সহস্র সহস্র স্ত্রীপুরুষ দিনান্তে একবার সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ করিতে পাইলে অপার সুখ অনুভব করিয়া থাকে। খৃষ্ট যেমন তদীয় শিষ্য মণ্ডলীকে মধুর ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন, "যদি কেহ তোমার দক্ষিণ গণ্ডে করাঘাত করে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে তোমার বাম গণ্ড ফিরাইয়া দিবে," আমাদের চৈতন্যও তেমনই একদিন নিজে আহত হইয়া তদীয় শিষ্য মণ্ডলীর সম্মুখে একটি জলন্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। দস্যু মাধাই তাঁহার সুকোমল অঙ্গে গুরুতর আঘাত করিয়াছে—দর দর ধারে শোণিত স্রাব হইতেছে—তিনি তথাপি দৃক্পাত শূন্য—তিনি প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গাইলেন,

"মাধাইরে!
মেরেছিস তুই কলসীর কাণা
তাই বলে কি প্রেম দিব না!"

হৃদয়ের কি [illegible] কি অপার মাধুর্য্য [illegible] বিজয়ী জলন্ত ভাব [illegible] চ্ছ্বাসে শত্রুকেও [illegible] দান করিতে পারেন [illegible] এই মর জগতে অমর [illegible]

আর আমাদের [illegible] রামমোহন রায়! কা[illegible] ও তাঁহার জন্মে প[illegible] অযুত নরনারীর দুর্গতি [illegible] হৃদয়ে যে মহা জ্ঞান [illegible] দুঃখের বিষয় বঙ্গ[illegible] নিবিড় কুসংস্কারে [illegible] গ্রাহ্য করিল না। [illegible] শিষ্য যাঁহারা তাঁহা[illegible] তাঁহারাও অতি অল্প [illegible] সম্প্রদায়ে বিভক্ত হই[illegible] রামমোহন স্বদেশের [illegible] প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ [illegible] চয় দিয়াছিলেন তাহ[illegible] অপরের অবিদিত না[illegible]

খৃষ্ট, বুদ্ধদেব, [illegible] রামমোহন ইহাঁরা সকলেই [illegible] কঠোর সাধনায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং স্ব স্ব সাধনানুরূপ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাঁদের মহা সাধনার মহা-মন্ত্র সুবিমল উদার হৃদয়ের বিশ্বজনীন ভালবাসা এবং পূর্ণ বিকশিত চরিত্রের হৃদয়গ্রাহী প্রীতি। মহাব্রতে ব্রতী হওয়া ক্ষতি-লাভ-গণনায় নিমগ্ন ক্ষুদ্র হৃদয়ের আয়ত্তাধীন নহে। জগতের হিত সাধন অথবা

দেশানুরাগ ও স্বজাতি প্রেমের বাসনায় মত্ত হইয়া একাল পর্য্যন্ত অনেকেই ক একটি গুরু ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। হারা সূক্ষ্ম ন্যায় পথের পথিক হইয়া রদ জ্যোৎস্নাময়ী সুস্নিগ্ধ সুবিমল রজনীর ায় অনন্ত প্রেম ও প্রীতি বিকশিত হৃদ-ের মধুরতায় জগতের মন মুগ্ধ করিয়া-লেন তাঁহারাই কেবল স্ব স্ব অবলম্বিত ব্রত পালনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যাঁ-রা চরিত্রের শোভা দেখাইতে পারেন াই, লক্ষ্য পথে তাঁহাদের পদস্খলন হই-ছে, সুতরাং আর তাঁহারা অগ্রসর হইতে ারেন নাই। এই শেষোক্ত শ্রেণীর নেকের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, ন্তু তাহা অনাবশ্যক; কারণ তাহা আ-াদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। আজি আমরা ই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেখাইতে প্রয়াস পাইব, ামাদের অধঃপতিত দেশের কলঙ্কমোচন রিতে হইলে আমাদের হৃদয় ও চরিত্রের শাভা কেমন হওয়া উচিত।

অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, আজি ালি আমাদের দেশের শত শত সুশিক্ষিত রনারীর অন্তরে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি প্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বদেশের দুর্গতির বিষয় চিন্তা করিয়া একান্ত ব্যথিত হৃদয়ে উক্ত দুর্গতি দমন করিতে শত শত উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সাধু উদ্যম দেখিয়া আশা করা যাইতে পারে যে তাঁহাদের সমবেত যত্নে একদিন শুভ ফল জন্মিবে। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, যে প্রণালীতে এক্ষণে যত্ন ও উদ্যম বিহিত হইতেছে তাহা হইতে শীঘ্র কোন সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই। একটি অধঃপতিত দেশের পঙ্কোদ্ধার কোন ক্রমেই সহজ ব্যাপার নয়। কঠোরতম সাধনা ভিন্ন একটি দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতির ললাট হইতে কলঙ্কের কালিমা প্রক্ষালিত হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসাদে আমরা সভ্যতার আদি জননী ইটালির পতন ও পুনরুত্থান পাঠ করিয়াছি। পুণ্যাত্মা রায়েন্জী গ্যারিবল্ডী ও ম্যাজিনি যে কঠোরতম সাধনায় স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং যে মহামন্ত্রে স্বজাতিকে দীক্ষিত করিয়া স্বদেশের মৃতকল্প দেহে নব জীবন দান করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। ইহারা সকলেই ক্ষুদ্র আত্মাভিমান বিসর্জ্জন, নীচ স্বার্থপরতা বলিদান, এবং ধন মান ও যশের আশা জলাঞ্জলি দিয়া নিয়ত স্বদেশের জন্য অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। কখনও ভীষণ কারাগারে বদ্ধ, কখনও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত এবং কখনও বা নিতান্ত অসহ্য উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ের প্রকৃত-বল ও চরিত্রের যথার্থ মহত্ব নিস্তেজ হয় নাই। আজি তাঁহাদের বীরত্ব গৌরব সভ্য জগতের শিক্ষার আদর্শ স্থল!

রায়েন্জী, ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডী, ক-সুথ্, ওয়াসিংটন্, ও উইলিয়ম্ টেল্ প্রভৃতি ক্ষণজন্মা বীরগণের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া আজি আমাদের দেশের অনেক সুশিক্ষিত যুবক তাঁহাদের অনুকরণ প্রয়াসী হইয়াছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের অন্তরে যে এই বাসনা টুকু জাগাইয়া দিয়াছে এ বড় সুখের বিষয়! কিন্তু আমাদের দেশের কয়জন স্বদেশানুরাগী যুবকের হৃদয়ে তাঁহাদের হৃদয়ের ন্যায় বীর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের দশাংশের একাংশ বিদ্যমান আছে। ভ্রান্ত আমরা—ইয়ুরোপীয় জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে আমাদের জ্ঞান চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে—তাই আমরা আমাদের প্রকৃত বল বুঝিতে পারি না—আমরা মুষ্টিমিত অন্ন ভোজী বাঙ্গালী কি উপাদানে নির্ম্মিত তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না! এই জন্য আমরা কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারি না, কিন্তু কথায় বীরত্ব প্রকাশ করিয়া চরিতার্থ হই! এ সংসারে কথায় কখনই কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় নাই, হইবে না—ধ্যান-রত মহাযোগীর তপশ্চর্য্যার ন্যায় কঠোর সাধনায় উহা সাধিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের কয়জন যুবক তেমন সাধনা করিতে সমর্থ? কয়জন যুবক চরিত্রের চারু শোভা প্রদর্শন করিয়া সমস্ত স্বদেশ বাসীকে এক প্রাণতায় বদ্ধ করিতে পারেন? বীর-জননী পুণ্য ভূমি চিতোরের বীররত্ন প্রতাপ জগতে যে মহৎ চরিত্রের শোভা দেখাইয়াছিলেন—তাহা মনে হইলে হৃদয়ের মধ্যে তাড়িৎ-প্রবাহ ছুটিতে থাকে। তিনি 'স্বর্গাদপী গরিয়সী' পবিত্র জন্মভূমির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে যে মহা ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, বিচিত্র বেশ-ভূষা প্রিয়, বিলাসী, নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম ও বাক্‌পটু আমরা তাহা কি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি? আমাদের তেমন ক্ষমতা কোথায়? জানি না কত দিনে আমাদের [illegible] ও জাতীয় চরিত্র পরিশো[illegible] না কত দিনে আমরা [illegible] আত্ম-সম্মান-জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া [illegible] শক্তির উপাসক হইব। [illegible] সুশিক্ষিত স্বদেশবাসীগণ [illegible] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমান গুলি [illegible] স্বার্থপরতা পদ দলিত করিয়া [illegible] শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের মধ্যে অকপট সদ্ভাব স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন, এবং পরস্পরে পরস্পরের [illegible] দোষ বা শিক্ষার অভাব ভুলিয়া [illegible] পরিবর্ত্তে অকৃত্রিম ভালবাসা, [illegible] গভীর সহানুভূতি ও আন্তরিক [illegible] দেখাইতে পারিবেন, [illegible] নন্দ জন্মে, সেই সুখময় দিনে আমাদের মৃত জাতীয় জীবন পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে। যত দিন না আমরা স্বদেশবাসীকে [illegible]রের সহিত ভালবাসিব তত দিন উন্নতির ভাণ করা বিড়ম্বনা মাত্র!

অন্য কথা দূরে যাক এই ত ভারতের হিতের নিমিত্ত "British Indian Association" ও "Indian Association" স্থাপিত হইয়াছে। দুইয়ের প্রায় একই উদ্দেশ্য। দুইটি সভার সভ্যগণ এক দেশেরই লোক এবং প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুই সভার প্রধান প্রধান নেতা গণের মধ্যে লজ্জা জনক মতভেদ ও অসদ্ভাব কেন? ইহাঁরা কি স্বদেশের হিতসাধনরূপ মহাব্রতের কথা স্ব-

...য়া পরস্পরের সামান্য সামান্য মত-...গুলি বিস্মরণ এবং স্ব স্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ...ন গুলি বিনাশ করিয়া, এক প্রাণে, ...য্যমে জন্ম ভূমির মুখোজ্জ্বল করিবার ... জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন না? ...র পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য না ...র যদি কোন কারণ থাকে তবে আ-... ক্ষুদ্র বুদ্ধির এই বিশ্বাস যে তাঁহাদের ... মধুরতা ও চরিত্রে পূর্ণতার অভাব. ...। তাঁহারা কি সে অভাব নিবারণ ...ন না?

...দেশের উজ্জ্বল রত্ন সদৃশ সুশিক্ষিত ও ...-সম্পন্ন নর-নারীগণ। আপনাদের ... বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি, আপনারা স্বদেশের দুর্দ্দশা মোচনে স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করুন। আসুন, আমরা সকলে হৃদয়ের ক্ষুদ্রভাব দমন করিয়া একপ্রাণে মিলিত হই। পরস্পরে পরস্পরের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস, প্রাণগত ভালবাসা ও যথাসাধ্য সহায়তা স্থাপন করিয়া মৃত দেশকে আবার জীবন দান করি। যদি ভাগ্যে শুভদিন উপস্থিত হয় তাহা হইলে, আজি আমরা যাহাদের চরণ তলে লুণ্ঠিত ও লাঞ্ছিত হইতেছি, তাহারাই আবার সেই শুভদিনে স্বস্ব গর্হিত আচরণের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া অবনত মস্তকে বলিবে "চারুতার কাছে আর দর্পখাটে কার!"

শ্রী বিজয়লাল দত্ত।

লীলা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

...মি যা ভাবিয়াছিলাম তাই ঘটিয়াছে। ...দের কপালে কষ্ট আছে, তাহারা সৎ-...র্শ শুনিবে কেন? সুরেশচন্দ্র কাহারও কথা শুনিলেন না, তেমনি ফল ফলিল। তিনি এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। ছেলেটা যে নিতান্ত হাবাগোবা এমত ত আ...র বোধ হয় না, কিন্তু নিজের কাজ গুছাইয়া লইতে বোধ করি তেমন হুঁসিয়ার নয়। গণেশচন্দ্র বলিতেন, সুরেশ-চন্দ্র ছেলে মন্দ নয়, কিন্তু বুদ্ধির কিছু অভাব। আমারও তাহাই বোধ হয়। গণেশচন্দ্র অর্থশূন্য কথা বলিবার লোক নন। তাঁহাকে যে জানিত সেই বলিত ছেলেটী অসাধারণ বুদ্ধিমান। তিনি যখন বাল্যাবস্থায় পাঠশালায় যাইতেন, তখন সকলে বলিত, এ ছেলে বাঁচলে হয়।

সুরেশচন্দ্র লজ্জায় আর কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারেন না। শ্বশুরবাড়ী যাওয়া

বন্ধ করিলেন। নিমন্ত্রণ হইলেও সে মুখো হন না। আমি বলি, বেশ হইয়াছে। ফেল হইলে যদি এতই লজ্জা বোধ হয়, তাহা হইলে এ লজ্জা ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনা কেন? বাবুর নিজের পড়া ভাল লাগে না, শেলি, তাসো, দান্তে পড়িতেন। কই, শেলি পড়িয়া পাস হইতে পারিলে কই? দান্তের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে এখন ত সেনেট হাউসে প্রবেশ নিষেধ হইল। যে চাবি দিয়া কল্পনার দ্বার খোলা যায়, তাহা দিয়া ত বিদ্যার দ্বার এম এ, বি এ উপাধির দ্বার খোলা যায় না। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। এখন থাক, বাহিরে পড়িয়া থাক। আর সকলে ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট মুন্সফ, উকীল হইবে, আর তুমি তোমার কবিত্ব লইয়া, শেলি লইয়া ধুইয়া খাইও। সুরেশচন্দ্রের উপর আমার এমনি রাগ হইতেছে, যে আর কি বলিব! দেখ দেখি এমন মূর্খও জগতে আছে! যদি দশ বিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ থাকিত, কিছু তালুক মুলুক থাকিত, তাহা হইলেও বুঝিতাম, আচ্ছা বাপু, তোমার পড়িতে ইচ্ছা হয় পড়, না হয় না পড়, কবিতা লেখ, [illegible] লেখ, যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর। টাকা না নষ্ট করিলেই হইল, হিসাবী হইলেই হইল। তোমার কিছু নাই, তোমাকে পরের চাকরী করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, কলম ঠেলিয়া আঙ্গুলে ঘাটা পড়াইয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে। তোমার এ সব বিড়ম্বনা কেন? তুমি বলিবে ইংরাজেরা অনেকে কবি হয়। তাহাতে তোমার কি? ইংরাজেরা ত [illegible] ধিপত্য করিতেছে সমগ্র ভারতবর্ষ তাহাদের অধীনে, তাহারা যাহা করিবে তুমিও তাই করিবে? তাহাদের টাকা কত, তাহারা কবি হইবে না কেন? তুমি যদি কবিতা লিখিয়া এক পয়সাও পাইতে তাহা হইলেও [illegible] বুঝিতাম। অনর্থক এ উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে কেন? তুমি গরিব বাঙ্গালী, তোমার এত কথায়, এত গোলমালে কাজ কি? পড়াশুনা করিবে, পাস [illegible] চাকরী করিবে, সাহেবের মন রাখিয়া [illegible] টাকা কড়ি রাখিবার চেষ্টা [illegible] জানি। তোমার কি এমন [illegible] যাছে, যে তুমি মহাভাবনা [illegible] সুরেশ চন্দ্র বলেন কত কি [illegible] শুনিয়া বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা [illegible] "তোমার আবার কিসের ভাবনা [illegible] ঘাড়ে সংসারও চাপে নি, [illegible] ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে হ[illegible] তবে তুমি কি ভাবনা ভাব। [illegible] যে তোমার অনাস্[illegible] কথা।" ভারি [illegible] সংসারের ভাবনা ছাড়া আর কিসের ভাবনা থাকিতে পারে? যে বলে আমি আর কোন ভাবনা ভাবি, আমি তাহার কথা শুনিলে হাসি। হরগৌরী বাবু সুরেশচন্দ্রকে বলিলেন "এবার ত ফেল্ হলে। এখন কি করিবে? আবার পড়।"

সুরেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "যে আজ্ঞা।"

হরগৌরী বাবু বলিয়া দিলেন, "এবার খুব মন দিয়া পড়িবে। আমি [illegible] কাল পেন্সন লইব। আর, আমি ত [illegible]

[illegible] আছি। যা পার, এই বেলা করিয়া [illegible]।"

[illegible]চন্দ্র পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি যখন তাঁহার সেই [illegible] মূর্ত্তি গাউনে আবৃত করিয়া, শামলা [illegible] ডিগ্রী আনিতে গিয়াছিলেন, তখন [illegible] তাঁহাকে খুব মানাইয়াছিল। ডিগ্রী [illegible] চূড়া ছাড়িয়া, সোজা সিঁতে [illegible] বুকে চাদর বাঁধিয়া তিনি সুরেশ-[illegible] দেখিতে আসিলেন। আসলটা, [illegible] দিতে আসিলেন। গণেশচন্দ্র দেখিতে [illegible] পুরুষ, তা নয়। একে একটু [illegible] কালো, চোক ছোট, [illegible] কিন্তু আমি [illegible] বুদ্ধিমান, তাহারা তেমন [illegible] সুরেশকে দেখিয়া গণেশ-[illegible] একবার কেশ [illegible] একবার [illegible] [illegible]"

[illegible]

[illegible] কি না। বলিলেন, "[illegible] [illegible] বিগন সহজে বিচলিত হন না। [illegible] টা কি? আর একবার দেখ্‌বে [illegible]"

সুরেশচন্দ্র। কাজেই।

গণেশচন্দ্র কহিলেন, "তাই ভাল।" তিনি আর দাঁড়াইলেন না। আজ তাঁহাকে [illegible] অনেক স্থানে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরমা।

কিরণের পিতামহী সেকেলে মানুষ, ষাট [illegible] বয়স হবে। সেকেলে লোক হইলেই একালের লোকের চক্ষে তেমন ভাল দেখায় না। সেকেলে চকমিলান বাড়ী এখনকার নব্য লোকের ভাল লাগে না। এখন সব নূতন হইতেছে, পুরাতন কিছুই ভাল নয়, কিছুই থাকিবে না। যত কিছু সেকেলে আছে, তাহার মধ্যে সেকেলে বিধবা সকলের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছেন। সেকেলে বৃদ্ধ আর এখনকার শিক্ষিত যুবায় যত না প্রভেদ, সেকেলে বুড়ী আর এখনকার সভ্য যুবতীতে তত প্রভেদ। কোন যুবতী আর একজন যুবতীর সঙ্গে দেখা হইলে আপনি বলিয়া সম্বোধন করেন, বেশ দস্তুর মত নমস্কার করেন, লেখা পড়া পুস্তকাদির কথাবার্ত্তা হয়, আরও সব সভ্যতানুমোদিত, সুরুচিসম্পন্ন কথাবার্ত্তা হয়। আর একজন সেকেলে বুড়ী, চেনা নাই, শুনা নাই, একেবারে তুমি বলিয়া, হাত ধরিয়া [illegible] টানিয়া ঘরে বসাইবে। তা-[illegible] গহনা দেখিবে, স্বামীর কত [illegible] জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে, শাশুড়ী কি করিতেছেন, বাড়ীতে কে রাঁধে, আজ সকালে [illegible] কি রান্না হইল, এই [illegible] সব জিজ্ঞাসা করিবে। ইহাতে নবীনারা রাগ না করিবেন কেন?

কিরণের পিতামহীর এ সব দোষ গুলি ছিল। নহিলে লোক নেহাত মন্দ নয়। তিনি ছেলেদের আলোর এক একবার ভারি ভক্ত হন। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু [illegible] করিতে একজন অগ্রগণ্য দলপতি। তাই বলিয়া অখাদ্য বাদ যায় না। রাত্রিকালে অনেক সদাড়িক সূপকার বস্ত্র মধ্যে রোষ্ট, কট্‌লেট্, চপ্, করি প্রভৃতি দেবদুর্লভ উপাদেয় সামগ্রী আনয়ন করিত, চৌধুরী মহাশয় কাঁটা চামচে ধরিয়া সেই মহাপ্রসাদ উপযোগ করিতেন। ছুরী কাঁটা ধরা তেমন ভাল অভ্যস্ত ছিল না, কাঁটাটা প্রায় উল্টাইয়া ধরিতেন, এক একবার কাঁটা চামচে পরি-

ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ হস্তের পরিচালনা করিতেন। শুনা যায় একবার উইল্‌সনের হোটেলে গোমাংস পর্য্যন্ত উদরস্থ করিয়াছিলেন। বাড়ীতে সেই ইংরাজ জগন্নাথ প্রসাদ আসিলে, ছোট ছোট ছেলেরা একটু আধটু প্রসাদ পাইত। কিরণের পিতামহী সেই সময় মহা বিপদে পড়িতেন। বলিলে কেহ কথা শোনে না, সকলেই সেই ছাই ভস্ম গুলা খাইবে। ঠাকুরমা এক মুখ থুথু লইয়া, অন্দরের দরজাগোড়ায়, দুই হাতে কাপড় গুটাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কিছুক্ষণ পরেই নবীন, শ্যাম, গোপাল, অক্ষয় সকলে ছুটাছুটি করিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিত। হয়ত গোপাল ঠাকুরমাকে জড়াইয়া ধরিতে আসিল। ঠাকুরমা চেঁচাইতেন, "ওরে দাঁড়া, দাঁড়া, ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে, সরে যা! ওরে, ওদিকে যাস্‌নে! আগে ভাল জল দিয়ে মুখ হাত ধো, কাপড় ছাড়্, গঙ্গাজল পরশ কর্, তার পর ঘরে দোরে যাস্।" এই বলিয়া তিনি গঙ্গাজল আনিতে গেলেন। কেবা তাঁর কথা শোনে? যে যেদিকে পাইল ছুট মারিয়া বিছানায় শয়ন করিল। ঠাকুরমা পঞ্চপাত্র, কি একটী চুম্‌কি ঘটী করিয়া গঙ্গাজল আনিয়া, পৌত্র, দৌহিত্রদিগকে দেখিতে না পাইয়া কেবল বকিতেন, "রাম বল, রাম বল। পৃথিবীতে এত খাবার সামগ্রী রয়েচে, তা খেয়ে কি তোদের মন ওঠে না? ওই অমৃত কি না খেলেই নয়? ধর্ম্ম কর্ম্ম, বাচ বিচার সব গেল। যেন মোছোনমানের ঘর করে তুল্লে গা! ইচ্ছা করে এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাই। বলি আমি আর কদিনই বা আছি, তার পর তোদের যা ইচ্ছা হয় করিস্। মোছোনমানের ছোঁয়া খাস্, বউ নিয়ে চেরেটে কোরে হাওয়া খেতে যাস্, বিবি বিয়ে করিস্, যা ইচ্ছা তাই করিস্। সে কটা দিনও কারুর দেরি সয় না।" যখন দেখিলেন কেহ তাঁহার কথা শোনে না, তখন তিনি আর সব ছাড়িয়া দিয়া আপনি সাবধান হইলেন। তাঁহার ঘরে কোন ছেলে গঙ্গাজল না স্পর্শ করিয়া প্রবেশ করিতে পায় না। তাঁহার পাকের সামগ্রী কোনও ছেলে হাত দিলে সে দিন আর তাঁহার খাওয়া হয় না। একদিন রাত্রে কিরণের একটী পিসতুতো ভাই বাহির বাড়ীতে কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া ভিতরে আসিয়া কিরণের পিতামহীকে ছুঁইয়া ফেলিল। কিরণের পিসির নাম বিন্দুবাসিনী; পিতামহী ডাকিলেন, "বিন্দু।"

"কে, মা ডাক্‌চ?"—একটু চড়া স্বরে এই উত্তর হইল।

মা বলিলেন, "দেখেছিস্ তোর ছেলের আক্কেল? আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।" বিন্দুবাসিনী মুহূর্ত্তের মধ্যে বেরিয়ে বাহিরে আসিয়া কিছু রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? বিনোদ কি করেচে মা?"

মা। কর্‌বে আবার কি? আমার মাথা খেয়েচে। এই শীতের মাঝে আবার নেয়ে মরি।

কন্যা। কি হয়েছে ছাই বলনা।

মা। হবে আবার কি? আমার শ্রাদ্ধ হয়েছে। বিনোদ আমায় ছুঁয়ে ফেলেচে।

কন্যা। ড্যাক্‌রা গেল কোথায়? ওকে আমি দাদার সঙ্গে খেতে মানা করে দিয়েচি না?

মা। তোমার ছেলেরা কথা শোনে যার ছেলে সব কি না। যেটী বারণ কর সেইটী আগে কর্‌বে।

কন্যা রাগে ফুলিতে লাগিলেন। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "বিনোদ, ওরে কোথায়? ড্যাক্‌রা, পোড়ামুখো, হতভাগা, একবার এদিকে আয় তুই।"

মা তখন নরম হইয়া বলিলেন, "কাটি বলে গালাগালি দিলে কি হবে? ছেলে মানুষ ছুঁয়ে ফেলেচে তার এখন কি হবে? ওর কি এখনো জ্ঞান হয়েচে?"

বিনোদ সব কথাটা জানেনা, বাড়ীতে তখন শুক্লধারী পাচক মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয়ে ব্যস্ত ছিল। মার কাছে আসিয়া কহিল, "কি মা ?"

বিন্দুবাসিনী দৃঢ়মুষ্টিতে বিনোদের হাত ধারণ করিয়া কহিলেন, "আজ তোমাকে আস্ত রাখব না। তোকে দাদার সঙ্গে যেতে মানা করেচি, তবু তুমি নোলার আশায় কুকুরের মত পাত চাট্‌তে গিয়েচ। তোর নোলায় ছিচ্‌কে পুড়িয়ে দেব, জানিস ?"

বিনোদবিহারী সেখ হুসেন আলির দীর্ঘ, ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল আর সেই [illegible] অপূর্ব্ব সামগ্রীর সৌরভ ও আস্বাদ স্মরণ করিতে ছিলেন। মাতার কঠোর কথার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার পৃষ্ঠের সঙ্গে মাতার কোমল হস্তের মধ্যে মধ্যে বড় কঠিন আলাপ হয়, এজন্য তিনি অতিমাত্র ভীত হইয়া কহিলেন, "মামা, আমায় ডাক্‌লেন তাই গিয়েছিলাম।"

"আর আমি যা বল্লুম তা মনে ছিল না? মিঞাকে ছুঁয়েচিস্ কেন, পোড়াকপালে?" এই বলিয়াই ঠাস্ ঠাস্ করিয়া মারিল দুই চড়।

মাতা আসিয়া বিন্দুবাসিনীর হাত ধরিলেন। কহিলেন, "বিন্দু, মার উপর রাগ করে কি ছেলে ঠেঙ্গাতে আছে? ছেড়ে দাও, লক্ষ্মী মা আমার।"

কন্যা মাকে এক ঠেলা দিয়া কহিলেন, "ছেড়ে দাও বল্‌চি, নইলে ভাল হবে না। আমার ছেলেকে আমি মারব, আর কারুর তাতে কি?"

এই বলিয়া চড় ছাড়িয়া ছেলের পিঠে দুম দুম করিয়া কিল মারিতে আরম্ভ করিলেন।

পুত্র ঠেলা খাইয়া পড়িতে পড়িতে রহিল।

ঘরের ভিতর কিরণ লীলাকে বলিতেছিল, "ভাদ্র মাসের তাল কার ঘাড়ে পড়্‌চে? সেজপিসীর গলা শুনেচ ত? বাবা, এমন মেয়ের পায়ে গড় করি।"

এদিকে ঠাকুরমা স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "ও মারা ত বিনোদকে হল না, ও আমাকেই মারা হল।"

বিন্দুবাসিনী ছেলেকে মনের সাধ মিটাইয়া ঠেঙ্গাইলে পর, পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন।

কিরণের মা আর লীলা দুই জনকে কত বুঝাইলেন, তাঁহারা কোন মতেই জলস্পর্শ করিতে সম্মত হন না। কিরণের পিতামহী যা ফল মূল খান, কিছুই খাইতে চান না। তাঁহারা না খাইলে আর কেহ খায় না দেখিয়া রাত্রি দুপুরের পর আহার করিলেন।

শ্রীমতী বিন্দুবাসিনীর গরিবের ঘরে বিবাহ হইয়াছে। এজন্য তিনি মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে থাকেন। তাঁহার তিন চারিটী সন্তান। বাপের বাড়ী আসিলে বাড়ী সুদ্ধ লোক তাঁহার ভয়ে তটস্থ থাকিত।

আবার যখন ঠাকুরমা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন, নবান্ন মাখিতে বসিতেন, হরির লুট দিতেন, সে সময় ছেলেরা হাত পাতিয়া তীর্থের কাকের মত তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। সে বৎসর যখন তাঁহার অনন্ত ব্রত সারা হয়, তখন ভারি ঘটা হইয়াছিল। সাত দিন আগে হইতে ব্রতের সামগ্রী সাজান আরম্ভ হইল। ছেলেরা দরজার চৌকাটে দাঁড়াইয়া চেঁচামেচি করিত। ঠাকুরমা সুবিধা বুঝিয়া নাতিদের বলিলেন, "আমার কাছে ত মোছোনমানের ভাত নেই, আমার কাছে তোরা এসেছিস কেন?

জন দুই নাকি সুরে ধরিল, "না ঠাকুর মা, আর আমরা সে সব খাবনা।

ঠাকুরমা তখন চাপিয়া ধরিলেন, "আর কখন মোছোনমানের এঁটো খাবি[illegible]?"

"না ঠাকুরমা আর আম[illegible] কখন খাব না।" "না দিদিমা, [illegible] সত্য কর্‌চি।"

"খাবিনে?"

"না, খাবনা।"

"খাবিনে।"

'না, গো, খাবনা, খাবনা। তোমার পায়ে পড়ি আমায় ঐ সন্দেশটা দাওনা ঠাকুর মা।"

এই বলিয়া তাহারা ঠাকুরমার কাছে উত্তম আহার করিল। রাত্রিকালে আবার যে কে সেই। আবার সেই যবনায় পাইবার আসায় ছুটিত। ঠাকুরমা মনে মনে সঙ্কল্প করিতেন, তিনি ছোঁড়াদের আর একটা কথাও বিশ্বাস করিবেন না। আবার সে সঙ্কল্প ছোঁড়াগুলার কাকুতি মিনতিতে ভাঙ্গিয়া যাইত।

ঠাকুরমার আর একটী অভ্যাস ছিল। তিনি একজনের কাছে তাহার মনরাখা কথা বলিতেন, আবার তাহার পশ্চাতে ঠিক বিপরীত কথা বলিতেন। কিরণের মার কাছে এক রকম কথা বলিলেন, কিরণের পিসির সাক্ষাতে আর এক রকম বলিলেন। বাড়ীতে একটী নূতন ব্রাহ্মণের মেয়ে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ঠাকুর মা মনে মনে সন্দেহ করেন, বামণ ঠাকুরুণের একটু আধটু হাতটান আছে, অথচ সে কথা মুখে ফুটিয়াও বলা যায় না। ব্রাহ্মণী ছাড়িয়া গেলে আর একটী সহজে মেলে না। এক দিন বামণ ঠাকুরুণ আসিয়া বলিল, "মা, এক পলা তেল দাও ত গা।"

ঠাকুরমা কিছু সন্দিগ্ধান্তঃকরণে কহিলেন "কেন বাছা, রোজ যেমন একবাটী তেল দি, আজও ত তেমনি দিয়েছি। আবার তেল কেন?"

ব্রাহ্মণী। আজকে মাছ ভাজতে একটু বেশি তেল লেগেছে, আর আলু পটল ভাজতেও তেল বড় কম লাগে না। [illegible] না দাও ত আমি পুড়িয়ে রা[illegible]। আমার তাতে কি? আমার নিজের [illegible] খাবে না, তোমারই নাতি পু[illegible] খাবে।

ঠাকুরমা অন্য কথা না কহিয়া এক পলা তেল বাহির করিয়া দিলেন।

গৃহিণীর মধ্যমা কন্যা [illegible] বাপের বাড়ী। সেই দিন ঠাকুরমা কন্যার সাক্ষাতে গল্প করিলেন, "বামণ ঠাকরুণের উপর আমার বড় সন্দ হয়। আজকেই সে তেল চুরী করেচে।"

শৈলবালা গিয়া কিরণের মাকে ইঙ্গিত করিলেন, "বউ একবার শুনে যাও।" এই বলিয়া একটী নিভৃত ঘরে প্রবেশ করিলেন।

কিরণের মা তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েচে ঠাকুরঝি?"

ঠাকুরঝি কহিলেন, "তুমি ভাঁড়ার [illegible] করে দেখো শুনো। বামণ ঠাকুরুণটী লোক ভাল নয়।"

"কেন, সে কি করেচে?"

"তুমি বুঝি তা জাননা? মা বলেচেন যে সে আজ তেল চুরী করেচে।"

"তা নিলেই বা তাই? আমাদের একটু তেল চুরী করলে ত আর আমরা গরিব হব না। তুমি ভাই ঠাকরুণকে বুঝিয়ে ব'ল যেন একথা প্রকাশ না হয়। আজকাল লোকের যে কষ্ট।"

প্রকাশ হবে কেন? কিন্তু তুমি একটু সাবধান থেক।"

কিরণের মা কহিলেন, "তোমরা যেন ঢাক বাজিও না ভাই। কতই বা চুরী করবে। ভাঁড়ার ত আর তার হাতে নয়।"

"তোমার যদি এত বড়মানুষী [illegible] থাকে ত তোমার ধন যাকে ইচ্ছা তুমি বিলিয়ে দাও না কেন? সত্যিই ত আমি কোথাকার কে, যে তুমি আমার কথা শুনবে? আমি তোমার ভালর জন্যেই বল্‌তে এসেছিলাম।" এই বলিয়া শৈল-

বামন ঠাকুরানী ফর্‌কিয়া বাহির হইয়া গেলেন!

পর দিবস ঠাকুর মা স্নান করিয়া পূজা আহ্নিক করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণী আসিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা, মা, তুমি নাকি বলেছ যে আমি রান্নার তেল বোতলে করে বিক্রী করি। তা' এমন কলঙ্ক কি না দিলেই নয়? লোকের নামে মিছে কোরে এমন কথা বল্‌তে নাই। বলেছ, বেশ করেছ বাছা, আমার পাওনা চুকিয়ে দাও, আমি এই বেলা মানে মানে বিদায় হই।"

ঠাকুরমা বাম হস্তের উল্টাপিঠ মাথার উপর রাখিয়া কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশের কথা। তুমি হলে ভদ্রলোকের মেয়ে, তোমার নামে আমি এমন কথা কখন বলতে পারি? কে তোমায় এমন কথা বলেচে, আমায় বল ত?"

ব্রাহ্মণী হাঁড়ির কালিকলঙ্কিত হস্ত দোলাইয়া কহিলেন, "কেন, আমায় আজ কালোশশী বল্‌লে।"

অমনি কাল ঝির ডাক পড়িল। ঠাকুর মা কহিলেন, "হ্যাঁলা ময়না, আমি কখন তোমার গলা ধরে তোমার কানে কানে বলতে গিয়াছিলাম যে বামণঠাকুরুণ তেল চুরী করে তাই তুমি ঠগ লাগাতে গিয়েচ?"

ঝি বলিল, "আমার কি অপরাধ বাছা? আমায় হরি বল্লে তাই শুনেছি।"

আবার হরির উপর আক্রমণ হইল। সব শেষ ঠাকুরমা সূর্য্যের দিকে দুই হাত তুলিয়া কহিলেন, "হে দিননাথ! আমি যদি এমন কথা বলে থাকি ত যেন আমার দুটী চক্ষু অন্ধ হয়।"

বামন ঠাকুরুণ ত কোন মতে থাকিবে না। কিরণের মা কত করিয়া তাহাকে চার [illegible] পয়সা দিয়া সান্ত্বনা করেন। তার পর [illegible] ঝীকে থামাইতে একবেলা লাগিল।

অনেকেই বলিত কিরণের ঠাকুরমা দোঠকা, এক মুখে দুই কথা বলেন। তুমিও হয়ত তাই বলিতেছ। কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিতেছি তাঁহার বেশি কিছু দোষ নাই। বিবেচনা কর স্ত্রীলোকে চিরকালই পরাধীন। ছেলেবেলা বাপের, বয়সকালে স্বামীর, বুড় বয়সে ছেলে কি মেয়ের বশে থাকিতে হয়। সকলেরই মন রাখিতে হয়। আগে বাপ মার, তার পর শ্বশুর শাশুড়ীর, তার পর পুত্র কন্যার মন রাখিয়া চলিতে হয়। যাহাকে অনেকের মন রাখিতে হয় সে এক রকম কথা কিরূপে কহিবে। অতএব তোমরা যাহাই বল, কিরণের পিতামহীকে আমার বড় মন্দ লোক বোধ হয় না।

লীলাকে দেখিয়া তিনি বড় সন্তুষ্ট হইলেন। লীলার আচার ব্যবহারেও বড় আহ্লাদিত হইলেন। লীলা তাঁহার পূজার সময় গঙ্গাজল আনিয়া জল ছড়াইয়া দেয়, আগে যাহা কিরণের মা করিতেন এখন সব লীলা করে, তাঁহাকে কিছু করিতে দেয় না। লীলার পবিত্র স্বভাব দেখিয়া তিনি বলিতেন, লীলার হাতের রান্না খেতে আমার রুচি হয়। লীলার এমন বয়সে বৈধব্যদশা হইল, এই বলিয়া কতবার কাঁদিতেন। স্ত্রীলোকে পরের জন্য নিজের চক্ষে এত জলও রাখিতে পারে।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কথাবার্ত্তা।

(সন্ধ্যাবেলায়।)

১ম। আমি সন্ধ্যা কেন এত ভালবাসি জান? সমস্ত দিন আমরা পৃথিবীর মধ্যেই থাকি—সন্ধ্যাবেলায় আমরা জগতে বাস করি। সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই, পৃথিবী অপেক্ষা পৃথিবী-ছাড়াই বেশী—এমন লক্ষ লক্ষ পৃথিবী কুচি কুচি সোনার মত আকাশের তলায় ছড়াছড়ি যাইতেছে। জগৎ মহারণ্যের একটি বৃক্ষের একটি শাখার একটি প্রান্তে একটি অতি ক্ষুদ্র ফল প্রতিদিন পাকিতেছে। তাহাই পৃথিবী। আমরা কীটাণুরা তাহারই রসে পুষ্ট হইতেছি। দিনে দেখিতাম পৃথিবীর মধ্যে ছোট-খাট যাহা কিছু সমস্তই চলা-ফিরা করিতেছে, সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই পৃথিবী স্বয়ং চলিতেছে। রেলগাড়ি যেমন পর্ব্বতের খোদিত গুহার মধ্যে প্রবেশ করে—তেমনি, পৃথিবী তাহার কোটি কোটি আরোহী লইয়া একটি সুদীর্ঘ অন্ধকারের গুহার মধ্যে যেন প্রবেশ করিতেছে—এবং সেই ঘোরা নিশীথগুহার ছাদের মণ্ডপে অযুত গ্রহতারা একেকটি প্রদীপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারি নীচে দিয়া একটি অতি প্রকাণ্ডকায় গোলক নিঃশব্দে অবিশ্রাম গড়াইয়া চলিতেছে।

২য়। এই বৃহৎ পৃথিবী সত্য সত্যই যে অসীম আকাশে পথচিহ্নহীন পথে অহর্নিশি হূহু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এক নিমেষও দাঁড়াইতে পারিতেছে না, ইহা একবার মনের মধ্যে অনুভব করিলে কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া থাকে।

১ম। এমন একটি পৃথিবী কেন—যখন মনে করিতে চেষ্টা করা যায় যে, ঠিক এই মুহূর্ত্তেই অনন্ত জগৎ প্রচণ্ডবেগে চলিতেছে এবং তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণু থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে; অতিবৃহৎ অতি গুরুভার লক্ষকোটি অযুত নিযুত চন্দ্র সূর্য্য তারা গ্রহ উপগ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু, লক্ষ যোজন ব্যাপ্ত নক্ষত্রবাষ্পরাশি কিছুই স্থির নাই; অতি বলিষ্ঠ বিরাট এক যাদুকর পুরুষ যেন এই অসংখ্য অনল-গোলক লইয়া অনন্ত আকাশে অবহেলে লোফালুফি করিতেছে (কি তাহার প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ বাহু! কি তাহার বজ্রকঠিন বিপুল মাংসপেশী!) প্রতিপলকেই কি অসীম শক্তি ব্যয় হইতেছে! তখন কল্পনা অনন্তের কোন্ প্রান্তে বিন্দু হইয়া হারাইয়া যায়!

২য়। অথচ দেখ, মনে হইতেছে প্রকৃতি কি শান্ত!

১ম। প্রকৃতি আমাদের সকলকে জানাইতে চায় যে, তোমরাই খুব মস্ত লোক—তোমরা আমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছ। বিদ্যুৎ-মায়াবিনীকে তার দিয়া বাঁধিয়াছ—বাষ্প-দানবকে লৌহ কারাগারে বাঁধিয়া

তাহার দ্বারা কাজ উদ্ধার করিতেছ। প্রকৃতি যে অতি বৃহৎ কার্য্যগুলি করিতেছে তাহা আমাদের কাছ হইতে কেমন গোপন করিয়া রাখিয়াছে, আর, আমরা যে অতি ক্ষুদ্র কাজটুকুও করি, তাহাই আমাদের চোখে কেমন দেদীপ্যমান করিয়া দেয়!

২য়। নহিলে, আমরা যদি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই অনন্তের কাজ চলিতেছে, তাহা হইলে কি আমরা আর কাজ করিতে পারি!

১ম। কম কাজ! বড় হইতে ছোট পর্য্যন্ত দেখ। অতি মহৎশক্তিসম্পন্ন কত সহস্র নক্ষত্র লোক, অথচ দেখ, তাহারা ছোট ছোট মাণিকের মত কেবল চিক্‌চিক্ করিতেছে মাত্র! আমরা ফুলবাগানের মধ্যে বসিয়া আছি, মনে হইতেছে চারিদিকে যেন ছুটি। অথচ প্রতি গাছে পাতায় ফুলে ঘাসে অবিশ্রাম কাজ চলিতেছে—রাসায়নিক যোগ-বিয়োগের হাট বসিয়া গিয়াছে—কিন্তু দেখ, উহাদের মুখে গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রমের ভাব কিছুমাত্র নাই। কেবল সৌন্দর্য্য, কেবল বিরাম, কেবল শান্তি! আমি যখন আরাম করিতেছি, তখনো আমার আপাদমস্তকে কাজ চলিতেছে—আমার শরীরের প্রত্যেক কাজ যদি মেহন্নত করিয়া আমার নিজেকেই করিতে হইত তাহা হইলে কি আর জীবন ধারণ করিয়া সুখ থাকিত!

২য়। প্রকৃতি বলিতেছে, আমি তোমার জন্য বিস্তর কাজ করিয়া দিতেছি আর তুমি কি তোমার নিজের জন্য কিছু করিবে না! জড়ের সহিত তোমার প্রভেদ এই যে, তোমার নিজের জন্য অনেক কাজ তোমার নিজেকেই করিতে হয়। তুমি পুরুষের মত আহার উপার্জ্জন করিয়া আন, তার পরে সেটাকে পাকযন্ত্রে রাঁধিয়া লইবার অতি কৌশলসাধ্য কার্য্য ভার, সে আমার উপরে রহিল, তাহার জন্যে তুমি বেশী ভাবিও না। তুমি কেবল চলিবার উদ্যম কর, দেখিবে আমি তোমাকে চালাইয়া লইয়া যাইব।

১ম। ঠিক কথা, কিন্তু প্রকৃতি কখনো বলে না যে, আমি করিতেছি। আমাদের বেশীর ভাগ কাজ যে প্রকৃতি সম্পন্ন করিয়া দিতেছে, তাহা কি আমরা জানি! আমাদের নিরুদ্যমে যে শতসহস্র কাজ চলিতেছে, তাহা চলিতেছে বলিয়া আমাদের চেতনাই থাকে না। এই যে অতি কোমল বাতাস বহিতেছে, এই যে আমার চোখের সুমুখে গঙ্গার ছোট ছোট তরঙ্গগুলি মৃদু মৃদু শব্দ করিতে করিতে তটের উপরে মুহুর্মুহু লুটাইয়া পড়িতেছে ইহারা আমার হৃদয়ের এই অতি তীব্র শোক অহরহ শান্ত করিতেছে। জগতের চতুর্দ্দিক হইতে আমার উপর অবিশ্রাম সান্ত্বনা বর্ষিত হইতেছে অথচ আমি জানিতে পারিতেছি না, অথচ কেহই একটি সান্ত্বনার বাক্য বলিতেছে না। কেবল অলক্ষ্যে অদৃশ্যে আমার আহত হৃদয়ের উপরে তাহাদের মন্ত্রপূত হাত বুলাইয়া যাইতেছে আহাউহুটুকুও বলিতেছে না। আমাদের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী

এই যে কার্য্যকুশল সদাব্যস্ত ব্যক্তিগণ গুপ্তভাবে থাকে সে কেবল আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য; আমাদিগকে জানাইবার জন্য যে আমরাই স্বাধীন।

২য়। অর্থাৎ, অধীনতা খুব প্রকাণ্ড হইলে তাহাকে কতকটা স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে—কারাগার যদি মস্ত হয়, তবে তাহাকে কারাগার না বলিলেও চলে। বোধ করি, আমাদিগকে স্থায়ীরূপে অধীন রাখিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। পাছে মুহুর্মুহু আমাদের চেতনা হয় যে আমরা অধীন, ও বৈরাগ্য সাধনা দ্বারা প্রকৃতির শাসন লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করি, এই ভয়ে প্রকৃতি আমাদের হাত হইতে হাতকড়ি খুলিয়া লইয়া আমাদিগকে একটা বেড়া-দেওয়া জায়গায় রাখিয়া দিয়াছে। আমরা ভুলিয়া থাকি আমরা অধীনতার দ্বারা বেষ্টিত, মনে করি আমরা ছাড়া পাইয়াছি।

১ম। কিম্বা এমনও হইতে পারে প্রকৃতি আমাদিগকে স্বাধীনতার শিক্ষা দিতেছেন। দেখ না কেন, উত্তরোত্তর কেমন স্বাধীনতারই বিকাশ হইতেছে। জড় যে, সে নিজের জন্য কিছুই করিতে পারে না। উদ্ভিদ্ তাহার চেয়ে কতকটা উচ্চ। কারণ টিঁকিয়া থাকিবার জন্য খানিকটা যেন তাহার নিজের উদ্যমের আবশ্যক, তাহাকে রস আকর্ষণ করিতে হয়, বাতাস হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হয়। মানুষ এত বেশী স্বাধীন যে, প্রকৃতি বিস্তর প্রধান প্রধান কাজ বিশ্বাস করিয়া আমাদের নিজের হাতেই রাখিয়া দিয়াছেন। আর, স্বাধীনতা জিনিষ বড় সামান্য নহে। [illegible] কোন বালাই নাই। আমরা [illegible] কি করিলে যে ভাল হইবে [illegible] তাহা ভাবিয়া পাই না। [illegible] একবার এটা দেখিতেছি, এক [illegible] দেখিতেছি; এবং এইরূপ [illegible] করিতেই আমরা [illegible] বিষ[illegible] পড়িতেছি। উত্তরোত্তর [illegible]ধ্যে [illegible] বিকাশ হইয়া আসিয়াছে [illegible] ক্রমিক চালনা হয়, তাহা হইলে ম[illegible] পর এমন জীব জন্মাইবে, যাহাদের ক্ষুধা পাইবে না, অথচ বিবেচনা পূর্ব্বক আহার করিতে হইবে (অনেক মানুষেরই তাহা করিতে হয়), রক্ত সঞ্চালন ও পরিপাক কার্য্য তাহার নিজের কৌশলে করিয়া লইতে হইবে, (মানুষের রন্ধন-কার্য্যও কতকটা তাহাই) ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার শরীরের পরিণতি সাধন করিতে হইবে—এক কথায়, তাহার আপাদমস্তকের সমস্ত ভার তাহার নিজের হাতে পড়িবে। তাহার প্রত্যেক কার্য্যের ফলাফল সে অনেকটা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে। একটি কথা কহিলে আঘাতজনিত বাতাসের তরঙ্গ কতদূরে কত বিভিন্ন শক্তিরূপে রূপান্তরিত হইবে তাহা সে জানিবে, এবং তাহার সেই কথার ভাব সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কত হৃদয়কে কতরূপে বিচলিত করিবে, তাহারি ফল পুরুষানুক্রমে কতদূরে কি আকারে প্রবাহিত হইবে তাহা বুঝিতে পারিবে।

২য়। আমাদের স্বাধীনতাও আছে,

অধীনতাও আছে, বোধ করি, চিরকালই ...থিবে। স্বাধীনতার যেমন সাধনা আব... ...ীনতারও বোধ হয় সেইরূপ সাধনা ...গত বা উৎকর্ষপ্রাপ্ত সর্ব্ব... ...াকেই যথার্থ স্বাধীনতা বলে। ...ত্র স্বাতন্ত্র্যকে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা ...থার্থ যে রাজা সে প্রজার অ... ...অথবা ... অধীন, দেবতা এই সম... অর্থাৎ স্বাধীনভাবে অধীনতাকেই শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে। জড় পদার্থ অধীন ভাবে অধীন, মানুষেরা অধীন ভাবে স্বাধীন, আর দেবতারা স্বাধীন ভাবে অধীন। আমরা যখন মহত্ব লাভ করিব, তখন আমরা জগতের দাসত্ব করিব, কিন্তু সেই দাসত্ব করাকেই বলে রাজত্ব করা। আর স্বতন্ত্র হওয়াকেই যদি স্বাধীন হওয়া বলে তাহা হইলে ক্ষুদ্রতাকেই বলে, স্বাধীনতা বিনাশকেই বলে স্বাধীনতা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিলাতে ছাত্রজীবন।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

এইরূপ বক্তৃতা শুনিয়া, প্রশ্নোত্তর শ্রেণীতে শিক্ষা পাইয়া, পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ছাত্রদিগের যেরূপ জ্ঞান-লাভ হয়, তাহা ছাড়া আবার যাহাতে তাহারা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় সমূহ নিজ হাতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাহার কার্য্যকারী জ্ঞান লাভ করিতে পারে এই উদ্দেশে বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগেই ছাত্রদিগের নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখার শ্রেণী আছে। এইরূপ শ্রেণীতে ছাত্রেরা আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি লইয়া অধ্যাপক অথবা তাঁহাদিগের সহকারীদিগের উপদেশমতে আলোচ্য বিষয় সমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখে। মনেকর কোন একটী পদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি কি তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে, কিরূপে তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে তাহা অধ্যাপক কিম্বা তাঁহার সহকারী বলিয়া দিলেন ; পরে আবার ছাত্রদিগের নিকটে আসিয়া দেখেন, তাহারা কিরূপে কাজ করিতেছে; যদি কোন ছাত্র কোন বিষয় কেমন করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে তাহা বুঝিতে না পারে, তবে তাঁহারা তাহাকে তাহা দেখাইয়া দেন। এইরূপ শ্রেণীতে কাজ করা ভিন্ন আবার ছাত্রেরা ল্যাবরেটরীতেও কাজ করিতে পারে। ল্যাবরেটরী শব্দে বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়গুলি হাতে হাতে পরীক্ষা

করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ও যন্ত্রাদি বিশিষ্ট ঘর বুঝায়। বিজ্ঞানের ছাত্রেরা ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে অধিক বা অল্প কাল ধরিয়া ল্যাবরেটরীতে কাজ করিয়া থাকে। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে শিক্ষার নিমিত্ত, প্রকৃত শিক্ষার নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক হইতে পারে তাহা প্রায় সমুদায়ই এই কলেজে পাওয়া যায়। পদার্থ বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ কর, সেখানে দেখিতে পাইবে যে উত্তাপ, আলোক, শব্দ, তড়িৎ, চৌম্বকশক্তি, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যন্ত্রাদি সজ্জিত রহিয়াছে; জন্তু-বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতে যাও, সেখানে কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, মৎস্য, পক্ষী, গো অশ্ব, ঘোটক, বানরাদি বিবিধ প্রকার জন্তুর মৃতদেহ ও অস্থিচর্ম্মবর্ম্মাদি দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সুন্দররূপে সাজান আছে। ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ল্যাবরেটরী আছে। ছাত্রেরা কোন বিষয় ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে হইলে এক, দুই কি তাহার অধিক বৎসর ধরিয়া সে বিষয়ে উপদেশ-বক্তৃতা শোনে আর ল্যাবরেটরীতে কাজ করে। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কলেজে যে সকল বক্তৃতা প্রভৃতি অন্য রকম শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি পাইবার বিলক্ষণ সুবিধা; কিন্তু অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে শুদ্ধ কেবল পরীক্ষার নিমিত্তই শিক্ষা দেন না, আর ছাত্রদিগের মধ্যেও যাহাদিগের বাস্তবিক শিক্ষা লাভের ইচ্ছা আছে তাহারা শুদ্ধ কেবল পরীক্ষা উদ্দেশ্য করিয়াই বিদ্যাভ্যাস করে না। অধ্যাপকেরা তাঁহাদিগের স্ব স্ব বিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ছাত্রদিগকে শিখাইতে চেষ্টা করেন আর বুদ্ধিমান্ ও যত্নশীল ছাত্রেরাও সে গুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করে। ছাত্রেরা ি [illegible] র নিজের প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ি [illegible] য় অধ্যয়ন করে, কিন্তু তাহাদিগের ম [illegible] শালী ছাত্রেরা একটী কি দুইট [illegible] ধিক মনোযোগ ও যত্নের সহিত অনুশীলন করে। ছাত্রদিগকে উৎসাহ দেওয়ার নিমিত্ত ইউনিভর্সিটী কলেজে পুস্তকাদির পুরস্কার, অথবা স্বর্ণ বা রৌপ্যমেডলের পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে, যাহারা এইরূপ পুরস্কার পায় না অথচ কলেজে পরীক্ষায় উত্তম শিক্ষার পরিচয় দিতে পারিয়াছে তাহাদিগকে প্রশংসা-পত্র দেওয়া হয়। যাহারা পুস্তকাদি বা মেডল পুরস্কার পায়, তাহারাও প্রশংসাপত্র পায়। ইহা ভিন্ন আবার অনেক বিষয়ে বৃত্তি আছে; এই সকল বৃত্তির নিমিত্ত হয় বিশেষ একটী পরীক্ষা দিতে হয় আর না হয় নিজে অনুসন্ধান করিয়া কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে হয়, বিজ্ঞান ও কাব্য বিভাগে কয়েকটী বৃত্তি আছে সে গুলির নিমিত্ত বিশেষ কোন পরীক্ষা নাই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে যে সকল শ্রেণী আছে সে সকল শ্রেণীর পরীক্ষায় সমুদয়ে যে দুই চারি জন ছাত্র উত্তম ফল দেখায় তাহারাই এই কয়েকটী বৃত্তি পায়। কলেজের ছাত্রেরা পরীক্ষায় কি রকম ফল

দেখাইল তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত কলেজের ছাত্রদিগকে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে পুরস্কার দেওয়ার নিমিত্ত একবার চিকিৎসা বিদ্যা বিভাগে আর একবার কাব্য, বিজ্ঞান, আইন ইত্যাদি সকল বিভাগে বৎসরে দুইবার সমারোহ করিয়া সভা হয়। "লজের প্রেসিডেন্ট্ (লর্ড্ ক্রিমার্ল) অন্য কোন উচ্চপদারূঢ় .য়ে সভাপতির পদ গ্রহণ প্রথমতঃ কলেজের ঐ সকল বিভাগের সাম্বাৎসরিক বিবরণী পঠিত হয়, এই বিবরণীতে কলেজের ছাত্রেরা লণ্ডন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কিরূপ ফল দেখাইয়াছে তাহা লেখা থাকে; পরে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে যাহারা যাহারা মেডল বা পুস্তকাদি পুরস্কার পাইবে তাহাদিগের নাম ধাম সভায় পড়িয়া তাহাদিগকে পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র দেওয়া হয়, আর যাহারা শুদ্ধ প্রশংসা পত্র পাইবে তাহাদিগের নাম ধাম পড়িয়া যাওয়া হয়, ইহারা পরে কোন সময়ে কলেজের অফিস্ হইতে প্রশংসা পত্র চাহিয়া লয়। কলেজে বৎসর বৎসর ক্যালেণ্ডার বহি ছাপা হয়, তাহাতে কলেজের অন্যান্য সমুদয় বৃত্তান্তের সহিত কলেজের পরীক্ষায় কোন্ বিষয়ে কোন্ কোন্ ছাত্র উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে তাহা লেখা থাকে। এই রূপে ছাত্রদিগকে অনেক উপায় দ্বারা বিদ্যা চর্চ্চার উৎসাহ দেওয়া হয়।

কলেজে অক্টোবর মাস হইতে মার্চ্চের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত শীতাধিবেশন, আর এপ্রিল হইতে জুনের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অথবা মে হইতে জুলাইয়ের শেষ পর্য্যন্ত গ্রীষ্মাধিবেশন। অন্যান্য সময়ে কলেজ বন্ধ থাকে; শীতাধিবেশনে ক্রিষ্ট্মাসের সময় ডিসেম্বরের শেষভাগে ও জ্যানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কলেজ বন্ধ থাকে। রবিবারে যে কলেজ বন্ধ থাকে তাহা বলা বাহুল্য। হুইট্মন্‌ডে নামক পর্ব্বোপলক্ষেও এক দিন ছুটী হয়। কলেজে ছুটীর সময়েও কয়েক দিন ও রবিবার ভিন্ন অন্য সকল দিনে লাইব্রেরি খোলা থাকে আর ছাত্রেরা অনেকে সেখানে বসিয়া পড়ে।

অক্টোবর মাসে কলেজ খুলিবার সময় চিকিৎসা বিদ্যা বিভাগে একটী, আর অন্যান্য সকল বিভাগে একটী সভা করা হয়; ইহাতে সাধারণতঃ অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ উপস্থিত থাকেন, অন্যান্য লোকও উপস্থিত থাকিতে পারেন; এই সভার এক জন অধ্যাপক সাধারণের বুঝিবার মত কোন একটী বিষয়ে বক্তৃতা দেন। কলেজের গ্রীষ্মাধিবেশনে একদিন সন্ধ্যাবেলা একটী সভা করা হয়, তাহাতে অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে, ছাত্রদিগের অনুরোধানুসারে তাহাদিগের কোন কোন বন্ধুকে, ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। সভা উপলক্ষে কলেজের কতকগুলি ঘর উত্তম করিয়া সাজান হয়, কলেজের ভিন্ন ভিন্ন অংশে কল ও যন্ত্রাদি, অণুবীক্ষণ দ্বারা দ্রষ্টব্য জীব জন্তু ও অন্যান্য পদার্থ, আর চিত্র প্রভৃতি রাখা হয়। সভাতে সঙ্গীত হয়, আর উপস্থিত ব্যক্তিদিগের ব্যবহারার্থে চা, লেমনেড, প্র-

ভৃতি পানীয় দ্রব্য ও সে সঙ্গে অনেক রকম খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করা হয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সভা করিয়া কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করা হয়, ছাত্রদিগের মনেরও স্ফূর্ত্তি সাধন করা হয়।

ছাত্রেরা কলেজে যে কেবল পাঠাভ্যাসেই ব্যস্ত থাকে, এমন নয়। অবকাশ মতে তাহারা শরীরের সামর্থ্য বিধায়ক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ক্রীড়া করিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে ভলন্টীয়ার হইয়া কলেজে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করে। ইহা ছাড়া তাহারা আপনাদিগের মধ্যে কলেজে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে কয়েকটী সভা সংস্থাপন করিয়াছে। ছাত্রদিগের বাৎসরিক সভায় যন্‌ ব্রাইট্‌ ও সার্‌ যন্‌ লবকের ন্যায় ব্যক্তিরাও আসিয়া সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।

কলেজের সাধারণ ভার কলেজের সেক্রেটরীর হস্তে; কলেজের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভার সেই সেই বিভাগের ডীন্‌ ও ভাইস্‌-ডীনের হস্তে; এই সকল বিভাগের কোন দুই জন অধ্যাপক এই দুই পদগ্রহণ করেন।

ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্রের বিষয় দুই একটি কথা।

জগৎ বিখ্যাত বাগ্মী সিসিরো কল্পনার চক্ষে রাজ্য তন্ত্রের যে উৎকর্ষ দেখিয়া যান আজ কাল ইংলণ্ডে তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ইহা দেশীয়দের গৌরবের কারণ এবং বিদেশীয়দের উচ্চ আদর্শ স্বরূপ। আধুনিক ইংরাজের পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন জর্ম্মাণিতে বাস করিতেন, তখন তাহাদের যে রাজ্যতন্ত্র ছিল তাহা এবং ইংলণ্ডের অদ্যকার রাজ্যতন্ত্র মূলে এক, কিন্তু সময় এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রয়োজন মত প্রথমোক্ত টিতে মধ্যে মধ্যে এত পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে যে অতি সাবধানের সহিত পরীক্ষা না করিলে এই দুইটি বস্তু যে মূলে এক তাহা হঠাৎ বোধ হয় না। কি প্রকারে যে এই সামান্য বীজ হইতে বৃহৎ শাখা উপশাখা বিশিষ্ট ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজ্যতন্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে তাহার বর্ণনা আমাদের সাধ্যাতীত এবং উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। এই বিষয়ের আলোচনায় অনেক লোক তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল স্বরূপ শত শত পুস্তক প্রচলিত আছে। এই আলোচনা হইতে যে অতি উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞান লাভ হয় তাহা সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন। ভূত ঘটনার আলোচনা হইতে আমরা যে উপদেশ পাই জীবনের সামান্য

দৈনিক কার্য্যে তাহার কত প্রয়োজন হয়, তাহা অনেকেই জানেন। তবে যে কোন জাতীয়-কার্য্যে ইহার অত্যন্ত প্রয়োজন হইবে তাহা কি অতি আশ্চর্য্য? এই উপদেশ অবহেলা করিয়া কোন ব্যক্তি তাঁহার নিজের কোন কার্য্যে যে ভুল করেন তাহার সংশোধন সম্ভব না হইলেও ক্ষতি একজনের মাত্র। কিন্তু জাতীয় কার্য্যে কোন ভুলের ফল অতিশোচনীয়। এবিষয় ঠেকিয়া শেখা সচরাচর পোষায় না। আমাদের এই জাতীয় পুনরুজ্জীবনের সময়। কতক গুলিন ক্ষুদ্র বিষয়ে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার আমরা পাইতে চলিলাম। অষ্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য উপনিবেশে যে প্রকার প্রতিনিধি সভা আছে তাহার আদর্শে ভারতবর্ষে সভা সংস্থাপনের জন্য প্রচুর লেখালিখি চলিতেছে, এবং অল্প দিনের মধ্যে যে আমাদের এই অভিলাষটি সফল হইবে তাহা আমরা আশা করিয়া থাকি। এই আশা যে সম্পূর্ণরূপ ভ্রান্তিমূলক তাহা নিতান্ত বোধ হয় না। ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্র এবং তাহার ইতিহাসের আলোচনায় যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা এই অবস্থায় আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ইংলণ্ডের সহিত আমাদের যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহাতে ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্র বিষয় কতকটা মোটামুটি জ্ঞান আমাদের অত্যন্ত আবশ্যক বলিলে বোধ হয় বেশি বলা হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সাধারণ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অধিক কি আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যেও দুই এক জন এমত পাওয়া যায় যাঁহাদের এবিষয়ের জ্ঞান অত্যন্ত অস্পষ্ট। ইংরাজেরা এক্ষণে কি প্রকারে শাসিত হইতেছেন সে বিষয়ে মোটামুটি দুই একটি কথা বলা আমাদের অভিপ্রায়। ইহা পড়িয়া যদি এক জনেরও এবিষয়ে আলোচনা করিতে ইচ্ছা জন্মে তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ মনে করিব। ইংলণ্ডের রাজ্য শাসন ভার রাজা বা রাণী এবং পার্লামেন্ট নামক এক মহা সভার উপর অর্পিত আছে। অল্পের মধ্যে বলিতে গেলে কোন এক রাজ্যের শাসন কর্ত্তার তিনটি কর্ত্তব্য কার্য্য। প্রথম প্রজাদের নিমিত্ত আইন করা—দ্বিতীয়তঃ এই আইন প্রয়োগ করা—এবং তৃতীয়তঃ অন্য কোন রাজ্যের সহিত কাজ পড়িলে প্রজাদের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করা। ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্রে প্রথমটির ভার পার্লামেণ্টের এবং অন্য দুইটির ভার রাজার উপর নিহিত আছে। পার্লামেণ্ট কিন্তু যে আইনই করুন না রাজার স্বাক্ষর ব্যতীত তাহা দেশে প্রচলিত হইবার উপযুক্ত হয় না। রাজার উপর যে দুইটি বিশেষ ভার আছে সে বিষয়ে পার্লামেণ্টের মতের বিরুদ্ধাচরণ নিবারণ করিবার যে উপায় আছে তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার পূর্ব্বে রাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত দুইটি কর্ত্তব্য কার্য্য তিনি কি প্রকারে নিষ্পন্ন করেন সেই বিষয়ে দুই একটি কথা বলিতে অভিপ্রায় করি। অন্যান্য দেশের রাজার ক্ষমতা অসীম বলিলেই হয়। স্পষ্ট রূপে

রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে এমন কোন আইন ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যে প্রায় দেখা যায় না। সুবিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের কিছু পূর্ব্বে ফরাসী দেশে রাজার ক্ষমতার ঘোর ব্যভিচার হইয়াছিল। রুসো প্রজার স্বত্ব দাঁড় করাইবার এবং রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া লকের বিখ্যাত 'কাল্পনিক বন্দোবস্ত' (Imaginary contract) মনুষ্যের সম্মুখে নূতন করিয়া আনয়ন করেন। ইহার মূল কথা এই যে তাঁহারা কল্পনা করিয়া লইলেন আধুনিক সমাজ স্থাপনার পূর্ব্বে অতি প্রাচীন কালে এক জন লোক প্রস্তাবিত কতকগুলিন কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা করায় একদল মনুষ্য তাহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করে। এই বন্দোবস্ত হইতেই রাজা প্রজা সম্বন্ধের সূত্রপাত। এখন যদি কোন রাজা তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য না করেন তবে সেই মুহূর্ত্তেই প্রজাদের তাঁহাকে রাজ পদ হইতে বিচ্যুত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এদিকে রাজারা এবং তাঁহাদের পক্ষীয় লোকেরা বলেন যে রাজার শাসন করিবার ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত কোন সময়ে কাহার সহিত কোন প্রকার বন্দোবস্তের ফল নহে। তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই তাঁহারা করিতে পারেন। তাঁহাদিগকে পদচ্যুত কবিবার অথবা তাঁহাদের কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করিবার পৃথিবীতে কাহারও ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডের প্রথম জেম্স এই কথাটি প্রথম বাহির করেন এবং সকল লোকে যাহাতে ইহা বিশ্বাস করে সেই জন্য বিশেষ চেষ্টাবান হন। এবং ইহার জন্যই তাঁহার পৌত্র দ্বিতীয় জেম্স্ ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ফরাসী দেশে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। যাহাই হউক ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর এই কথা বলিবার এখন কোন অধিকার নাই।

খ্রীষ্টীয় ১৭০১ সালে পার্লামেণ্ট বন্দবস্ত প্রণালী (Act of Settlement) নামক এক ব্যবস্থা করেন; তাহার দ্বারা ব্রন্সিক বংশীয় রাজপুত্রদিগকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত কতকগুলিন প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত করাইয়া ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন দানকরা হয়। যে মুহূর্ত্তে রাজা প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পারঙ্মুখ হইবেন সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহাকে সিংহাসন বিচ্যুত হইতে হইবে। প্রটেশ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী না হইলে অথবা রোমান ক্যাথলিক্ ধর্ম্মাবলম্বীকে বিবাহ করিলে কেহ ইংলণ্ডের সিংহাসনারোহন করিতে পারিবেন না। দেশের অন্য সকল লোকের উপরে যে আইন চলে ইংলণ্ডের রাজা তাহার শাসন বহির্ভূত। স্পষ্টাক্ষরে লেখা না থাকিলে পার্লামেণ্টের কোন আইন রাজার উপর খাটে না। গুরুদোষে দোষী একজন লোককে রাজা স্বেচ্ছামত সম্পূর্ণরূপে মাপ করিতে পারেন। যে কোন ইংরাজকে ইনিই ডিউক, মারকুইস, কৌণ্ট, বাইকৌণ্ট এবং ব্যারন উপাধি দিতে পারেন। এই উপাধিধারী ব্যক্তিদের কতকগুলিন বিশেষ অধিকার (privileges) আছে; ক্রমে সেগুলি কতক কতক উল্লেখ করা যাইবে। ইহারা

সকলে রাজ্যের পিয়ার্স (Peers of the Realm) এই নামে খ্যাত। কোন প্রজাকে ব্যারনেট্ নাইট্ ইত্যাদি খেতাব দিতে এবং কোন বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ মেডল পেনসন্ ইত্যাদি দিতে কেবল ইনিই সক্ষম। ইহাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন প্রজা বিদেশীয় রাজা প্রদত্ত কোন খেতাব গ্রহণ করিতে পারে না। পার্লামেণ্ট ডাকিতে বা কিছু দিনের জন্য ইহার কার্য্য বন্ধ রাখিতে কি নিয়মিত সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বেও ভাঙ্গিয়া দিতে, অন্য কোন রাজ্যের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ সন্ধি সংস্থাপন এবং কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিতে কেবল ইহাঁরই অধিকার আছে। ইনি অন্য রাজ্যে দূত পাঠান এবং অন্য রাজ্যের দূতের অভ্যর্থনা করেন। এই সকল কার্য্যে রাজাকে কতকগুলি লোকের পরামর্শ লইয়া চলিতে হয়। ইহারা রাজ মন্ত্রী নামে খ্যাত। রাজা কোন আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে এই মন্ত্রীদিগকে পার্লামেণ্টের নিকট তাহার জন্য হিসাব দিতে হয়। দোষ প্রমাণীকৃত হইলে মন্ত্রীরাই শাস্তি পান রাজার কিছু হয় না। ধরিয়া লওয়া হয় যে রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না। এই রাজমন্ত্রীদিগকে লইয়াই ইংলণ্ডের রাজসভা (ব্রিটীশ ক্যাবিনেট)। বলিতে গেলে এই ক্যাবিনেটই প্রকৃত পক্ষে দেশ শাসন করে। ক্যাবিনেটের ইতিহাসটি অতি চমৎকার। বহু দিবসাবধি ইংলণ্ডে গুপ্তসভা (প্রিবি কৌন্সিল) নামে একটি সভা চলিয়া আসিতেছে। রাজা সমস্ত রাজ কার্য্য সম্বন্ধে ইহার পরামর্শ লইতেন। অনেক দিন অবধি এই প্রকার চলিয়া আসে। ক্রমে সভাটি বড় হইয়া পড়িল। রাজার কোন লোককে সম্মানিত করিবার ইচ্ছা হইলে তাহাকে এই সভার সভ্য নিযুক্ত করিতেন। এমন একটি বড় সভাদ্বারা রাজ কার্য্য কখনই গুপ্তভাবে এবং সত্বরে সম্পন্ন হইতে পারে না দেখিয়া ক্রমে রাজা প্রয়োজন মত ইহার মধ্য হইতে জন কয়েক লোক বাছিয়া লইয়া পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। বেকন্ এই প্রথার দোষগুণ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় অতি স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় চার্লসের সময় হইতে এই মন্ত্রীসভার উপর সকলের নজর পড়িতে আরম্ভ হইল। ইহা দ্বারা ইংরাজ জাতির স্বাধীনতার গর্ব্ব সম্পূর্ণ রূপে লোপ পাইবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বৃদ্ধেরা বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। তথাচ ইহার ক্ষমতা দিনে দিনে বাড়িতে চলিল এবং অবশেষে আমরা এখন দেখিতেছি যে প্রকৃত পক্ষে ইহার উপরেই রাজ্যশাসনের ভার। কিন্তু মহা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দেশের কোন আইনে ইহার নাম গন্ধ নাই। রাজা যাহাদিগকে এই সভার সভ্য নিযুক্ত করেন গবর্ণমেণ্টের কোন গেজেটে তাহাদের নাম বাহির হয় না। রাজার যাহাকে ইচ্ছা মন্ত্রীত্বে বরণ করিবার ক্ষমতা আছে। পরে দেখিব যে পার্লামেণ্টের সভ্য না হইলে এবং তথায় বিশেষ প্রতিপত্তি না থাকিলে কোন লোককে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় না, এবং করা হইলেও তাহার দ্বারা কাজ চলে না। এই মন্ত্রী-সভার সভ্যেরা প্রায়ই রাজ্যের

বড় বড় চাকরী একটা না একটা গ্রহণ করেন। প্রিবি কৌন্সিলটি এখনও আছে কিন্তু ইহার ক্ষমতা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য উপনিবেশ এবং ভারতবর্ষের আপিল শুনা এবং বাণিজ্য এবং শিক্ষার তত্ত্বাবধারণ করা পর্য্যন্তই প্রায় বোধ হয় উহার ক্ষমতার শেষ। প্রথমোক্ত কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইবে এই অভিপ্রায়ে বেতনভোগী আইনজ্ঞ জন কয়েক পণ্ডিতগণকে এই সভার সভ্য নিযুক্ত করা হয়। প্রিবি কৌন্সিলের সকল সভ্যের নামের পূর্ব্বে The Right honourable এই কয়েকটি কথা বসান হয়। রাজমন্ত্রী মাত্রেই এবং রাজ্যের সকল পিয়ার্স প্রিবি-কৌন্সিলের সভ্য।

এক্ষণে পার্লেমেন্টের বিষয় গুটি কতক কথা। এই সভাটি দুই ভাগে বিভক্ত। হাউস্ অব্ লর্ড্স্ এবং হাউস্ অব্ কমন্স। মান্যে হাউস্ অব্ লর্ড্স্ রাজার পরই। কিন্তু আসল ক্ষমতা ইহার বড় বেশি নাই। সকলেই বোধ হয় জানেন, সমস্ত রাজবংশীয় পুরুষগণ, দুইজন আর্চবিসপ্ চব্বিশ জন বিসপ্, ইংলণ্ডের সমস্ত পিয়ার্স, স্কট্ল্যাণ্ডের পিয়ার্সদের প্রতিনিধি ষোলজন এবং আয়ারল্যাণ্ডের ২৮ জন এই সভার সভ্য। রাজমন্ত্রীদিগের মধ্যে যিনি এই সভার সভাপতি তিনিই ইংলণ্ডের লর্ড চান্সেলার। আইনজ্ঞ ও আত্মব্যবসায়ীদিগের ইহা অপেক্ষা আর উচ্চপদ নাই। Content এবং non content এই দুইটি কথা দ্বারা কোন প্রস্তাবে সভ্যেরা তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করেন। টাকা কড়ির সম্বন্ধে অথবা হাউস্ অব কমন্স সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিবার অধিকার এ সভার নাই। ইহার সম্পর্কে হাউস্ অব কমন্স কোন আইন করিতে পারে না। রাজ্যের মধ্যে ইহা সর্ব্বোচ্চ আদালত, ইহার উপর আর আপিল নাই। এই সভার কোন সভ্য রাজবিদ্রোহিতা অথবা অন্য কোন গুরু অপরাধ করিলে এ সভাই কেবল তাহার বিচার করিতে সক্ষম। এই সভাগৃহে একটি রাজসিংহাসন আছে। পার্লামেন্টে আসিলে রাজা এই সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং হাউস্ অব কমন্সের সভ্যদিগকে ডাকিয়া পাঠান। তাহারা আসিয়া সভাগৃহের দরজায় দণ্ডায়মান হইলে রাজার যাহা কিছু বক্তব্য তাহা বলেন। রাজার আর বক্তব্য কি, মন্ত্রীরা যাহা শিখাইয়া দিয়াছেন তাহাই বলেন। এই সভার সভাপতি লর্ড চান্সেলার অন্যান্য সভ্যের ন্যায় কোন প্রস্তাবে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা করিতে হইলে তাঁহাকে তাঁহার নিজের আসনত্যাগ করিয়া ডিউকরা যেখানে বসেন সেইখানে সরিয়া যাইতে হয়। রাজসিংহাসন এবং লর্ড চান্সেলারের আসনের চতুষ্পার্শ্বে খানিকটা স্থান, কেন জানিনা, হউস অব লর্ড্সের বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহা ব্যতীত হউস অব কমন্সের এবং ইহার সভ্যদের আর কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা আছে, সেগুলি সমস্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত।

রাজা হাউস অব লর্ড্‌স এবং হাউস অব কমন্স এই তিনটির মধ্যে শেষেরটির ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রাজার যাহা যাহা বিশেষ ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে সেগুলিন ক্যাবিনেটের মেম্বররা ভোগ করেন। রাজার নামে তাঁহারা আপনাদের অভিপ্রায় মত কাজ করেন। রাজা ইহাদের কোন কার্য্যে অমত প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। করিলে ইহারা চাকরী পরিত্যাগ করেন। এই স্থলে আমরা এসম্পর্কে অধিক কিছু বলিব না। যথা স্থানে এ বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে হাউস্ অব লর্ডসের অতি অল্পই আসল ক্ষমতা আছে। এই সম্বন্ধে অধিক বলা আর আবশ্যক করে না। এ বিষয়ে বড় বড় লোকের যাহা মত তাহা নিম্নের দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে হাউস অব লর্ড্‌সে লর্ড সেলবার্ণ রাজ্যের খরচের হিসাব দেখিবার প্রস্তাব করায় তাঁহার সহযোগীরা বলেন যে ইহা তাঁহাদের অধিকারের বহির্ভূত। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বর্ক মহোদয় হাউস অব কমন্সে তাঁহার একটি বিখ্যাত বক্তৃতায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা না উদ্ধৃত করিয়া থাকিতে পারিলাম না—I am sure no man is more zealously attached than I am to the privileges of this House (the House of Commons) particularly in regard to the exlusive management of money. The lords have no right to the disposition, in any sense, of the public purse; but they (the lords) have gone further in self-denial than our utmost jealousy could have required. A power of examining accounts, to censure, correct and punish it, we never, that I know of, have thought of denying to the House Lords. It is something more than a century since we voted that body useless: they have now voted themselves so.

দেখিতে দেখিতে প্রবন্ধটি কিছু বাড়িয়া পড়িয়াছে। হৌস্ অব্ কমন্সের বিষয় এবং পার্লামেন্টের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বলিতে গেলেও অল্প স্থানে হইবে না। এই নিমিত্ত এবারকার মত এই খানেই বন্ধ করা গেল। যদি প্রবন্ধটিকে সাধারণে পাঠ যোগ্য মনে করেন তাহা হইলে বাকি যাহা এ বিষয়ে বলিবার আছে তাহা অতি শীঘ্রই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

অতিথি-আগমন।

বহু দিন পরে আজ পূরিয়ে উঠেছে প্রাণ
উন্মত্ত মধুর তানে,
বহু দিন পরে আজ ফিরেছে আনন্দ দিন
স্মৃতির স্বপন সনে !
অনন্ত নীলিমা মাঝে দুলিছে সুধাংশু তারা,
উৎসবে মেতেছে আজ,
কিরণে কিরণে আজ করিতেছে আলিঙ্গন ;
আমিও তাদের মাঝ।
বিশাল নিথর ছায়া, অতল, অচিন্ত্য শূন্য
কাঁপিছে হরষ ভরে,
তন্ত্রিত সে বিশ্ব-বীণা গাহিছে অনন্ত গান
অনাদি দেবতা করে ;
অতীত-তপন হতে বরষে কিরণ-কণা,
আঁধার হৃদয় পরে !

প্রফুল্ল কুসুম মালা দিগন্তে জড়ায়ে যায়,
ছায়াপথে ফুটিতেছে ফুল ;
বিহ্বল মদিরা পানে ঘূর্ণিত রক্তিম আঁখি
পাগল অমর কুল ;
পুলকে পূর্ণিত প্রাণ হাসিছে প্রকৃতি রাণী,
হাসিছে কুসুম বালা,
হাসিছে ধরণী রাণী দুলিছে মুকুতা মালা
জগত করিয়ে আলা ;
আকুল সুরভি ভারে জড়িত জড়িত গতি
অলস সমীর ;

অস্ফুট বাদিত্র ধ্বনি দুলিয়ে পরশে কানে,
শুনে তায় মানস অধীর।

নক্ষত্র নক্ষত্র সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে গায়,
শুনিছে পরাণ মোর ;
কালের বিশাল চক্রে শুনিয়ে ঘর্ঘর রব
বিপুল আনন্দে ভোর ;
বিস্ময় মোহের ভুলে ঘোর নিদ্রা নিমগন
শুয়ে কাল অনন্ত শয়নে,—
দূর ভবিষ্যৎ ভেদি নেহারে নয়ন মোর—
নিশি যবে পোহাবে স্বপনে,
মেলিয়া অলস আঁখি উঠিবে ঘুমন্ত কাল,
শিহরিয়ে হেরিবে তখন,
বিপুল ভীষণ চক্র ঘুরিতেছে অন্য পথে
নাহি মানে কালের বারণ !

আলোক-উরমি মালা ঢলিয়ে ঢলিয়ে চলে
হেরিতেছি নয়নে ;
সৃজন-প্রণব-বাণী অতি সে গম্ভীর ধ্বনি
পশিছে শ্রবণে।
প্রথম প্রণয় ধারা, অতি সে পবিত্র রবে
উথলে হৃদয়-মাঝে ;
উষার প্রথম হাসি, নদীর প্রথম কথা,
কানন প্রথম সাজে।

ঘূর্ণিত ঘূর্ণিত গতি ঘূর্ণিত স্বজন লয়,
ঘূর্ণিত চক্ষের পরে ;
ঘূর্ণিত তরঙ্গদল আহত হৃদয়ে আজি
অতীত-নিশ্বাস ভরে।

তুষার নীহার রাশি, উত্তুঙ্গ ধবলা গিরি,
অন্ধকার গভীর নিশায় ;
প্রভাতিছে শোকনিশি, মিলাইছে মেঘজাল
নিরমল নীলিমায় ;
তুষার স্তূপের পরে উদিতেছে শুকতারা
উজ্জল বরণ,
শুদ্ধ সতী রমণীর মৃত পতি বক্ষ পরে
এক বিন্দু অশ্রুর মতন !

আনন্দ উচ্ছ্বাস মাঝে কেন বা বিষাদ বারি,
কেনরে কাঁদিছে প্রাণ,
আকুলিত বাষ্প ভরে না পায় দেখিতে আঁখি,
ফিরে আমি শিশুর সমান !

নিশ্বাস-আগারে আজি এসেছে অতিথিরে,
এসেছে হারাণ ধন,
সুনীল সাগর হতে গড়িয়ে এসেছে ঢেউ,—
ভাসিয়ে গিয়েছে মন !

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ভাউ সাহেবের বখর।

মহ্লাররাও শুনিয়া ভাবিলেন "ও ছেলেমানুষ"। পরে কুচ করিয়া দুই ক্রোশ অন্তরে শিবির স্থাপন করিলেন। মহ্লাররাও মান মহত্ব বিবেচনা না করিয়া শিন্দের শিবিরে চলিলেন। সংবাদ পাইয়া জনকোজী ভাবিলেন, "এখন অগ্রসর হইয়া যাওয়া উচিত হইতেছে। নহিলে অন্যথা হইবে।" জনকোজি অগ্রসর হইয়া সাক্ষাৎ করিলেন। দশ পনের দিন দিবারাত্রি একত্রে থাকিয়া মহ্লাররাও শিন্দের মনোবিকার দূরীভূত করিলেন এবং স্বীয় পুত্রকে শিন্দের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক দেশে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে জনকোজী নিবেদন করিলেন, "সুভেদার, তুমি আমার গুরুলোক, তুমি অটক পর্য্যন্ত দেশ জয় করিয়াছ। এক্ষণে আমার যাত্রার নিমিত্ত কোন্ রাজ্য মুক্ত?" মহ্লাররাও উত্তর দিলেন, "তোমার জন্য এক রাজ্য আছে। ভাগীরথীর উপর পুল বাঁধিয়া অযোধ্যায় যাইবে। সুজাউদ্দৌলাকে শাসন করিলে অভিষ্টানুরূপ ধন পাইবে। এ রাজ্য মুক্ত।" জনকোজী নিরুত্তর। উত্তর দিলেন, "ভাগীরথীর পুল বাঁধা কি প্রকারে ঘটিবে?" মহ্লাররাও বলিলেন, "নজীবখান রোহি-

লার হস্ত ধরিয়া তদ্দ্বারা এই কার্য্য সিদ্ধি করিবে।" জনকোজী বলিলেন, "নজীবখান রোহিলা নরাধম। গাজুদীখানের দ্বারা প্রতিপালিত হইল, তাহারই সর্ব্বনাশ করিল। তাহাত তুমি জানই। আর যদি-ইবা নিজ প্রয়োজন অনুরোধে তাহার সহিত মিত্রতা করি তাহা হইলেও স্বামী-দ্রোহীতা হয়। তিনি আমাকে নজীবখানের প্রতি যুদ্ধ যাত্রার আজ্ঞা দিয়াছেন। এক্ষণে এ প্রকার কর্ম্ম করিলে আমি স্পষ্টরূপে স্বামীদ্রোহী হই। আমি কোন প্রধান কর্ম্মচারী ব্যক্তি নহি। আমি আজ্ঞাধীন সামান্য ভৃত্য মাত্র। আমার এ প্রকার কার্য্য উচিত হয় না।" মহ্লাররাও উত্তর দিলেন, "বাবা, তোমার বালক-স্বভাব" অটক হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত এক-ছত্র রাজ্য হইয়াছে। হিন্দুস্থানে একমাত্র নজীবখান খল রহিয়াছে। সে শাসিত হইলে পেশবে দূত দ্বারা আটক হইতেও কর আনাইতে পারিবেন। তখন তুমি আমি সহজেই নির্মাল্যবৎ হইয়া পড়িব। তখন কেহ খবরও লইবেনা। এই হেতু এই প্রকার খলদের রক্ষা করিয়া যাহা যাহা কর্ত্তব্য করিবে।" ইহা বলিয়া মহ্লাররাও স্বীয় পালিত পুত্র তুকোজী হোলকরকে দুই সহস্র সৈন্য সমেত রাখিয়া বিদায় লইয়া দেশে গমন করিলেন।

দত্তাজী শিন্দে দেশে ছিলেন। তিনি বিবাহ করিয়া চারি সহস্র সৈন্যসহ নারো শঙ্করকে সঙ্গে লইয়া জনকোজী শিন্দের নিকটে আসিতেছিলেন। পথে রাজশ্রী দাদাসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বহু প্রকারে গৌরব করিলেন এবং জনকোজীকে নজীবখান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন দত্তাজীর নিকটেও আঁচল পাতিয়া তাহা বলিলেন। দত্তাজী মানা করিলেন। দাদা সাহেব পুনায় পৌছিলেন। দত্তাজী উজ্জয়িনীতে উপনীত হইলেন। মলহাররাও উজ্জয়িনীতে গেলেন। জনকোজী শিন্দে ও মলহাররাওয়েতে ঐক্য হইয়াছে ইহা দত্তাজী পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। দত্তাজী শিন্দে অগ্রসর হইয়া বহুসম্মান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া মলহাররাওকে উজ্জয়িনীতে আনিলেন। দুই চারি দিন একত্র থাকিয়া পান ভোজন প্রভৃতি অতিথিসৎকার করিলেন। দত্তাজী শিন্দে মলহাররাওকে প্রশ্ন করিলেন, "সুভেদার, তুমি অটক পর্য্যন্ত দেশ জয় করিয়াছ। এক্ষণে আমার যাত্রার নিমিত্ত কোন রাজ্য মুক্ত?" তখন মহ্লাররাও বলিলেন, "এ বিষয়ে জনকোজীকে বলিয়াছি আর তোমাকেও বলিতেছি যে, নজীবখান রোহিলার হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহা দ্বারা ভাগীরথীর পুল প্রস্তুত করিয়া লইবে এবং পরপারে অযোধ্যা, ঢাকা, বাঙ্গালা এবং কাউর দেশ পর্য্যন্ত যাত্রা করিবে। এ রাজ্য মুক্ত। যত ধন চাহ পাইবে। এবং সুজাউদ্দৌলাকে শাসন করিয়া ভাগীরথীর পরপারের অর্দ্ধ দেশ গ্রহণ করিবে। তন্মধ্যে আট দশটা বৃহৎ কেল্লা আছে তাহাতে থানা স্থাপন করিবে। তাহা হইলে সেতু বন্ধের ন্যায় তাহার উপর দিয়া যখন ইচ্ছা যাতায়াত করা যাইবে।

ইহা না করিয়া তুমি যদি নজীবখানকে শাসন কর তাহা হইলে পেশবে তোমাকে ধুতি কাচার কাজে নিযুক্ত করিবে।" এই রূপ স্পষ্ট বলিলেন। তখন এ কথা দত্তাজী শিন্দের মনে প্রবেশ করিল। স্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা জ্ঞান হইল। মহ্লারাওয়ের বাক্যেতে পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল। ধন যেমন লোভীর মন অধিকার করে তদ্রূপ হইল। মলহাররাও মন্ত্র দিয়া দেশে গেলেন। পরে বিঠলরাও শিবদেব দেশে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন, তিনিও ঐ কথা বলিয়া গেলেন। অগ্নিতে ঘৃত দানের ন্যায় আরও বলবৎ হইল। জনকোজীর মনে মহ্লাররাওয়ের মন্ত্রণা স্থান পায় নাই। সুভেদারের কথা রক্ষা করিলে নিমকহারামীর দায়ী হইতে হয়। আর তাহাতে স্বামী অসন্তুষ্ট হইবেন? স্বামীর যাদৃশ আজ্ঞা জনকোজীর মনোবৃত্তিও তদনুযায়ী। এ দিকে দত্তাজী শিন্দে মলহাররাওয়ের মন্ত্রণাকেই প্রাধান্য দিলেন।

জনকোজী শিন্দে মারয়ার প্রান্তে কার্য্যবিধি নির্দ্ধারিত করিয়া দিল্লী অভিমুখে চলিলেন। খেড়ীতে পৌঁছিলে দত্তাজী শিন্দেও তথায় আসিলেন। খুড় ভাইপোর মিলন হইল। সে রাজ্যে তাঁহাদের কোন ভয় ছিল না এই হেতু দত্তাজী শিন্দে স্বীয় স্ত্রী ভাগীরথী বাই এবং জনকোজীর স্ত্রী কাশী বাইকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তথা হইতে কুচ করিয়া দিল্লীতে উপনীত হইলেন। দিল্লী ছাড়াইয়া লাহোর দরোজা সন্নিকটে মজনু পাহাড়ের উপরে যমুনাতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিলেন। গাজুদ্দীখান উজীরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। জনকোজীর অভিপ্রায় এই যে, "উজীরের দ্বারা নজীবখানকে শাস্তি দিতে হইবে।" গাজুদ্দীখানেরও তাহাই অভিলাষ। উজীরের দ্বারা নজীবখানকে শাস্তি দেওয়ার কথা দত্তাজী শিন্দেও মুখস্থ বলেন। কিন্তু তাঁহার মনোগতভাব ভিন্নরূপ। শেষে গাজুদ্দীখান পনের লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত স্বীকার পাইলেন। নিজেও সঙ্গে যাইবেন স্থির হইল। দত্তাজী শিন্দে ভাবিলেন, "যে কোন ছল করিয়া হয় উজীরকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে।" এই স্থির করিয়া উজীরের উকীলকে আজ্ঞা দিলেন "পাতশাহী-অস্ত্রমধ্যে যে দুই তোপ আকবরশাহ পাতশাহের অধীনে ছিল সেই অটক ও ফতেলস্কর এবং অপর এক কিল্লেকুশাদ এই তিন তোপ আমাকে দিতে হইবে।" অন্যান্য তোপ যেখানে সেখানে চলিয়া গিয়াছিল। এই তিনটিমাত্র অবশিষ্ট। এ কয়টি পঞ্চধাতব সুবর্ণ সদৃশ তেজস্বী, দৈর্ঘ্য চৌদ্দহাত, পরিধি সাতহাত এমনি বৃহৎ। এক একটি নয় লক্ষ টাকার। এই তোপ চাওয়াতে গাজুদ্দীখান বড়ই বিষাদিত হইলেন। "প্রাণ যায় সেও স্বীকার কিন্তু এ তোপ দিতে পারিব না।" এইরূপ উত্তর আসিলে দত্তাজী শিন্দে সেনা সজ্জিত করিয়া পাতসাহী অস্ত্রাগারের দিকে চলিলেন। গাজুদ্দীখানের সৈন্যও প্রস্তুত হইয়া আসিল। উভয় দিক হইতে কিছুক্ষণ গোলাগুলি চলিল। কিন্তু উজীরের লোক

অন্ন, তাহারা স্বস্থানে সরিয়া পড়িল। সেই গোলযোগে দিল্লির এক অংশ জয়সিং-পুরের সর্ব্বনাশ হইল এবং দিল্লী সহরেরও বিনাশকাল উপস্থিত হইল।

সরোজিনী প্রয়াণ।

১১ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ইংরাজি ২৩ শে মে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। আজ শুভলগ্নে "সরোজিনী" বাষ্পীয় পোত (ব্যাকরণ-অনুসারে বাষ্পীয়া পোতিনী) তাহার দুই সহচরী লৌহ-তরী দুই পার্শ্বে লইয়া বরিশালে তাহার কর্ম্ম ক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করিবে। আবার, একটা অলঙ্কারের দোষ পড়িল—কর্ম্ম "ক্ষেত্র" কথাটা ব্যবহার বুঝি ঠিক শুদ্ধ হইল না—কারণ, মানুষ সম্বন্ধেই ও কথাটা সচরাচর প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু বুদ্ধিমান লোকেরা আপনি ছাড়া মানুষ মাত্রেরি সহিত গরুর সাদৃশ্য দেখিতে পান,—এই কর্ম্মক্ষেত্র আপিষকেই বলিতে পারেন। কিন্তু ষ্টীমারকেও গরু বলা যায় না, আবার জলকেও ডাঙ্গা বলা যায় না। যাত্রা যে-লগ্নেই হউক্ লেখাটা শুভলগ্নে আরম্ভ হইল না, কারণ দুছত্র না যাইতেই গোটা দুয়েক গলদ করিয়া বসিলাম। কিন্তু গুণগ্রাহী সুধী মরালগণ আমার এই জলযাত্রা বর্ণনার জল-টুকু পরিত্যাগ করিয়া বাকীটুকু গ্রহণ করিবেন। রামবল, জল-যাত্রার জলই যদি বাদ দিতে হয়, তাহা হইলে ত নিতান্তই চড়ায় উঠিতে হয়, কিন্তু তাহা আমাদের মূলেই উদ্দেশ্য নহে, তবে ভগবান্ অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন এখনো ঠিক বলিতে পারি না। লেখাও যেমন, যাত্রাও তেমন, খুব যে ভাল রকমে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বলা যায় না, কেন না—থাক্, সে কথা পরে বলা যাইবে। উল্টাপাল্টা করিয়া বলা আমার অভিপ্রায় নহে, এবং তাহাতে আমি সুদক্ষও নহি। সাহিত্যে একদল লোক আছে তাহারা আগার কথা গোড়ায় আনে, গোড়ার কথা আগায় লইয়া যায়, অথচ শেষকালে আগাগোড়া সমস্তই কে—সোজা হইয়া আসে। ইহা এক প্রকার দিগ্‌বাজি খেলা, এইমাত্র দেখিলাম পা-দুটো আকাশের দিকে, মাথাটা মাটির দিকে, পরের মুহূর্ত্তেই দেখি আসমানের মাথা আস্‌মানেই আছে, জমির পা জমি-তেই দাঁড়াইয়া। কিন্তু এ সকল কসরৎ আমার আসে না, সুতরাং সমস্ত আনু-পূর্ব্বিক বলিতে হইল।

পাঠকেরা এতক্ষণে ইহা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন, বর্ত্তমান লেখকের অন্যান্য নানা

প্রকার দোষ থাকিতে পারে, যথা ব্যাকরণে ভুল হয়, দুটো কথা একত্র জোটাইতে হইলে সমস্ত অলঙ্কার শাস্ত্রটা বন্ধক রাখিতে হয়, এতদ্ভিন্ন মানসিক দুর্ব্বলতাও নানাপ্রকার আছে, কিন্তু অধিক বলা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ। ভূমিকা উপক্রমণিকা পরিত্যাগ করিয়া একেবারেই আসল কথাটার উপরে তাঁহার কলমের অগ্রভাগ তীরের মত আসিয়া বিদ্ধ হয়। আপাততঃ মা সরস্বতীই তাহার লক্ষ্য, কারণ, আরম্ভেই তাঁহাকে সারিয়া ফেলিয়া তবে লেখা উচিত।

অয়ি শ্বেতভুজে ভারতি, শুনিয়াছিলাম তুমি সরোজবাসিনী, সরোজিনীর উপরে তুমি পায়ে পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাক, অতএব আমাদের ভরসা ছিল বিস্তর—কিন্তু আমাদের কপাল এম্‌নি, যে সমস্ত সরোজিনীতে শ্বেতভুজার উদ্দেশ পাওয়া দূরে থাকুক শ্বেতের মধ্যে যে একটা কাপ্তেন ছিল, সেবেটাও যে জাহাজ ছাড়িতে না ছাড়িতে কোথায় ভাগিল, তাহার ঠিকানা পাওয়া গেল না। ক্রমে শ্বেতবর্ণ ভুলিয়া যাইতেছি, দাঁত না খিঁচাইলে মনে পড়ে না। কারণ, জাহাজে পরস্পরের মুখের দিকে যখন চাহি তখন চোখে অন্ধকার ঠেকে, সেটা চোখের দোষ নহে, জাহাজের খোলের দিকে চাহি, সেখানে পাথুরে কয়লা; আর খালাসি যে কয়টা আছে তাহাদের মুখ দেখিলে রাণীগঞ্জের মনের বেদনা দূর হয়। কালো রঙের জালায় তুমি বাঙ্গলা মুল্লুক ছাড়িয়াছ, তুমি যে সরোজিনীতে অধিষ্ঠান কর সেখানকার ভ্রমর গুলোও এত কাল হয় না—অতএব মা তোমার ভরসা ছাড়িয়া এই খানেই তোমাকে গড় করিয়া লেখায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

কিন্তু, তামাসা বেশীক্ষণ ভাল লাগে না,—বিশেষতঃ টানাবোনা তামাসা। হাসি তামাসা অনেক সময়ে পর্দ্দার কাজ করে, হৃদয়ের বেআব্রুতা দূর করে। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে সকলই শোভা পায়, কিন্তু নগ্ন প্রাণ লইয়া কিছু বাহিরে বেরোন যায় না—সে সময়ে প্রাণের উপর আবরণ দিবার জন্য গোটাকতক হাল্কা কথা গাঁথিয়া ঢিলেঢালা এক প্রকার শাদা আলখাল্লা বানাইতে হয়, সেটার রং কতকটা হাসির মত দেখায় বটে। কিন্তু সকল সময়ে এ রকম কাপড়ও জোটে না। সে অবস্থায় অসভ্যদের মত গায়ে রং করিয়া, উল্কি পরিয়া, এক ছটাক শুষ্ক দন্তচ্ছটা আধসের জলে গুলিয়া সর্ব্বাঙ্গে তাহারি ছাপ মারিয়া সমাজে বাহির হইতে হয়—কিন্তু সে হইলে কেমন সংয়ের মত দেখিতে হয়, এবং দেখিতে দেখিতে রংচং শুকাইয়া উঠে ও শরীর চড়্চড় করিতে থাকে। সেথাই লোকে দেখে, লেখকের কথা কি আর কেউ ভাবে। যখন নাটকের পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পঞ্চমদের প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা দুর্জ্জয় সিং তাঁহার সাড়ে তিন লক্ষ সৈনিকের কর্ণকুহরের সুরঙ্গ পথ দিয়া হৃদয়ের বারুদখানায় জিহ্বারূপ জলন্ত দেশালাই কাঠি চালাইতেছেন, ও সাড়ে তিন লক্ষের নাক মুখ দিয়া মুহুর্মুহু জয় জয় আওয়াজ বাহির হইতেছে, তখন যে মহাকবি রামধন মুখুয্যেকে অভি-

শ্রাম ছারপোকা কামড়াইতেছে ও তাঁহার ডাবা হুঁকাটিতে জল ফিরান হয় নাই, সে কথা কি আর পাঠকের মনে আসে! উপন্যাসে ২৭৫ পৃষ্ঠায় যখন পাঠক চোখের জল আর রাখিতে পারেন না, কঠিন বুকও দেখিতে দেখিতে ফাটিয়া উঠে—তখন যে পটল নামক খুদে খোকাটি বিছানার চাদরের উপরে ভদ্রতার নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক জগৎকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া তাহার বিরুদ্ধে গলা ছাড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার লেখক মামা কলম রাখিয়া বিষম আক্রোশে খুদি চাকরানীকে হাঁকাহাঁকি করিতেছেন, সে কথা কি কোন সমালোচকের মনে উদয় হয়, হইলেও কি সমালোচনায় তিনি এক তিল রাখিয়া কথা কন্! আমি যে আজ দুপর বেলায় একপেট আহার করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে একটা বালিষ কোলে করিয়া জাহাজের একটি ক্ষুদ্র কামরায় বসিয়া কাগজ পেন্সিল হাতে করিয়া লিখিতে বসিয়াছি, আমার আশপাশের খবর এ লেখার মধ্যে কেহত দেখিতে পাইবেন না! কানের কাছে তিনটে মিস্ত্রি বসিয়া লোহার পাতের উপরে যে হাতুড়ি ঠুকিতেছে, দক্ষিণ পার্শ্বে অবিশ্রাম করাতের ঘস্ঘস্ শব্দ উঠিতেছে—তাহার উপরে আবার যে কাগজে লিখিতেছি, বাতাসে ক্রমাগত তাহার পাতা উড়াইতেছে, কোনক্রমে তাহাকে স্থির রাখিতে পারিতেছি না, কোন্ মমতাবান্ পাঠক এসব কথা জানিবেন বা গ্রাহ্য করিবেন! ব্যাপারগুলি নিতান্ত ছোট নহে। আর, ছোট হইলই বা;—বড় যত বড়ই হউন না কেন, জগতের শত সহস্র ছোটগুলি তাঁহার সম্ভ্রান্ত নাকের মধ্য দিয়া শত সহস্র দড়ি চালাইয়া তাঁহাকে যে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে এ তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না। ঠিক্ কোন্ মুহূর্ত্তে আমি মাথাঘষার গলিতে ডান পা না বাড়াইয়া বাঁ পা বাড়াইয়াছিলাম সেই জন্য বেনেপুকুরের রাস্তায় গাড়িচাপা পড়িলাম না সে কি আমরা জানিতে পাই! দুই ঘন্টা আগে যদি লিখিতে বসিতাম তবে ঠিক্ এ লেখা কখনই বাহির হইত না—তাহাতে নূতন লেখার ভঙ্গী থাকিত, আর পাঁচটা নূতন কথা থাকিত। আমার সেই দুই ঘন্টা আগেকার সম্ভাবিত লেখা অর্থাৎ যে লেখা হইল না, সে একেবারে অনন্তকালের মধ্যে হারাইয়া গেল, হয়ত বা তাহার মধ্যে সঙ্গে আমার এক অনঙ্কুরিত কীর্ত্তি ভাসিয়া গেল। (অসংখ্য সম্ভাবিত ঘটনার কণায় ঘোলা হইয়া কালস্রোত জগতের উপর দিয়া তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে বেগ এত বেশী যে, সকল কণা থিতাইয়া পড়িবার অবসর পায় না। প্রত্যেক মুহূর্ত্ত গোটাকতক সম্ভাবনামাত্র জগতের তলে রাখিয়া যাইতেছে ও অসংখ্য সম্ভাবনা, নিষ্ফল অসীমতা, কোটি কোটি নূতন যুগ যুগান্তরের বীজ লইয়া অনন্ত মরণ সাগরে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে।) এই সমস্ত ক্ষুধিত "হইতে পারিল না" রা মিলিয়া দল বাঁধিয়া যদি জগতে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আসে তাহা হইলে জগতের কি আর কোথাও ঠাঁই থাকে! দেখ একবার কি কথা বলিতে

কি কথা আসিয়া পড়িল। এই জন্যইত বলি সম্ভাবনার কুষ্টি আগে হইতে কে নির্ণয় করিতে পারে! যখন ভাতের কাঠি হাতে করিয়া বাহির হইলাম, তখন কে জানিত আমি জয়ঢাক বাজাইতে বসিব!

লেখার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, আমাদের যাত্রার সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। মনেত করিয়াছি বরিশালে যাইব—কিন্তু যেরূপ সম্ভাবনা প্রত্যহ দেখা যাইতেছে তাহাতে বরিশালে নাও যাইতে পারি! এমন স্থানে যাইতে পারি যেখানকার ভূগোল-বিবরণ আজও প্রস্তুত হয় নাই; সকল রাস্তা দিয়াই যেখানে যাওয়া যায়, অথচ কোন রাস্তা দিয়াই ফেরা যায় না! সেই সম্ভাবনা প্রচুর পরিমাণে দেখিতেছি বলিয়াই লেখাটা সহজেই কেমন তামাসার মত হইয়া আসিতেছে। কারণ মরণের বাড়া আর ত তামাসা নাই! এতবড় দাম্ভিক জীবনটা যে দুইটি ক্ষুদ্র নাসাগহ্বরের মধ্য দিয়া ফুঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল আর তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না—পাঁচটা অঙ্ক দাপাদাপি করিয়া অবশেষে শেষ গর্ভাঙ্কে সমস্তই যে প্রহসনে পরিণত হইল, ইহার হাস্য রসটুকু আমরা ঠিক আস্বাদন করিতে পাই না, কারণ আমরা নাট্যশালার মধ্যেই বাস করি, দর্শক যদি কেহ থাকে সে বোধ করি হাসি রাখিতে পারে না! তাহার চেয়ে আমরা আপনারাই হাসিয়া লই না কেন! কাঁদিলেই ত আমাদের হার হইল, এতবড় একটা ঠাট্টা যখন ধরা পড়িল, তখন ত আমাদেরই জিত! জীবনের সিংহাসনের উপর জরী জড়ান মছলন্দ পাতিয়া আমাদিগকে পুঁতুলটির মত সমস্ত দিন কে বসাইয়া রাখিয়াছে, অবশেষে সন্ধ্যা-বেলাটিতে মছলন্দখানি তুলিয়া দেয়, দেখা যায় খানকতক চিতার কাষ্ঠ—এই ত পরিহাস; এই জন্যই ত এত বিকট অট্টহাস্য! আমরাও হাসিতেছি—হাঃ হাঃ হাঃ!

এস তবে, হাসিতে হাসিতে সকালে বাহির হওয়া যাক্! আজ এপারই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, শুনিয়াছি আজ যাত্রা শুভ। যাত্রীর দল বাড়িল। কথা ছিল আমরা তিন জনে যাইব—তিনটি সাবালক পুরুষ মানুষ। সকালে উঠিয়া জিনিষ পত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি, পরম-পরিহসনীয়া শ্রীমতী ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরাণীর নিকটে ম্লান-মুখে বিদায় লইবার জন্য সমস্ত উদ্যোগ করিতেছি, এমন কি আমার এই খঞ্জন গঞ্জন মৃগ লোচনের আশে পাশে ফোঁটা দুয়েক লোনা জলের সরঞ্জাম করা গিয়াছে, এমন সময় শুনা গেল তিনি তাঁহার দুইটি পুণ্যফল তাঁহার শ্রীমতী যথা ও শ্রীমান্ সর্ব্বস্বটিকে লইয়া আমাদের অনুবর্ত্তিনী হইবেন। অনেকটা চখের জলের আয়োজন ব্যর্থ হইল; গম্ভীর মুখে বিদায় লইবার যে একটি গুরুতর মহিমা আছে, ঠিক যাইবার সময়ে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। তিনি কার মুখে শুনিয়াছেন যে আমরা যে পথে যাইতেছি, সে পথ বড় সহজ নহে, সে পথ দিয়া বরিশালে যাইব বলিয়া অনেকেই বরিশালে যায় নাই এমন শুনা গিয়াছে; আমরাও পাছে সেইরূপ

ফাঁকি দিই এই সংশয়ে তিনি অনেক ক্ষণ ধরিয়া নিজের ডান হাতের পাঁচটা ছোট ছোট সরু সরু আঙ্গুলের নখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্তর বিবেচনা করিতে লাগিলেন, অবশেষে ঠিক আটটার সময় নখাগ্র হইতে যতগুলো বিবেচনা ও যুক্তি সংগ্রহ হইতে পারে সমস্ত নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। সকাল বেলায় কলিকাতার রাস্তা যে বিশেষ সুদৃশ্য তাহা নহে, বিশেষতঃ চিৎপুর রোড। সকাল বেলাকার প্রথম সূর্য্য কিরণ পড়িয়াছে, সেক্‌রা গাড়ির আস্তাবলের উপর—আর এক সার বেলোয়ারি ঝাড়-ওয়ালা মুসলমানদের দোকানের উপর। গ্যাস ল্যাম্প গুলোর উপর সূর্য্যের আলো এমনি চিক্‌মিক্ করি[illegible] দিকে চাহিবার যো নাই। সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের অভিনয় করিয়া তাহাদের সাধ মেটে নাই, তাই সকাল বেলায় লক্ষ যোজন দূর হইতে সূর্য্যকে মুখ ভেঙাইয়া অতিশয় চক্‌চোক্যে মহত্ত্বলাভের চেষ্টায় আছে। ট্রাম গাড়ি শিষ্ দিতে দিতে চলিয়াছে, কিন্তু এখনো যাত্রী বেশী জুটে নাই। চিৎপুরের যে ধুলাগুলো নীচে পড়িয়া থাকে মুনিসিপালিটির ঝাঁটা সে গুলোকে উপরে উঠাইয়া তাহাদের কতক অংশ আশপাশের বাড়ি ঘরের জানলা দরজার মধ্যে,কতক পান্থদের নাসিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কতক ময়রার দোকানের মিঠাইয়ের দানায় দানায়,অপক্ষপাতিতার সহিত বিভাগ করিয়া দিতেছে, এবং অবশিষ্ট অংশ পুনশ্চ পরদিন প্রভাতের সম্মার্জনীর সম্মান অপেক্ষা করিয়া সেই রাস্তায় আসিয়া জমা হইতেছে। মুনিসিপালিটির শকট কলিকাতার পাপের বোঝা বহন করিয়া, কৃতজ্ঞ নাসিকার মধ্যে অদৃশ্য দূত সকল প্রেরণ করিয়া নিজের গৌরবে অত্যন্ত মন্থর হইয়া চলিয়া যাইতেছে। যাত্রা আরম্ভেই আমাদের ফুট্‌পাথের পার্শ্বে সারি সারি ছ্যাকরা গাড়ি আরোহীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, এবং সেই অবসরে অশ্বচর্ম্মাবৃত চতুষ্পদ কঙ্কাল গুলা ঘাড় হেঁট্ করিয়া অত্যন্ত শুক্‌নো ঘাসের আটি অন্যমনস্কভাবে চিবাইতেছে; তাহাদের সেই পারমার্থিক ভাব দেখিলে মনে হয় যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা তাহাদের সম্মুখস্থ ঘাসের আঁটির সঙ্গে সমস্ত জগৎসংসারের তুলনা করিয়া সারবত্তা, ও সরসতা সম্বন্ধে কোন প্রভেদ দেখিতে পায় নাই—অবশেষে পরম বৈরাগ্য ভরে নীরবে অহরহ নিষ্কাম ধর্ম্ম পালনে রত হইয়াছে। দক্ষিণে মুসলমানের দোকানে হৃতচর্ম্ম খাসীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কতক দড়িতে ঝুলিতেছে, কতক খণ্ড খণ্ড আকারে শলাকা আশ্রয় করিয়া অগ্নিশিখার উপরে ঘুর খাইতেছে—এবং বৃহৎকায় রক্তবর্ণ কেশবিহীন শ্মশ্রুলগণ বড় বড় হাতে মস্ত মস্ত রুটি সেঁকিয়া তুলিতেছে। (নোট। এইখানে একটা মস্ত তত্ব লেখকের নজর এড়াইয়া গেছে—পাঠকদের চতুর্ব্বর্গ ফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহা অত্র নিবিষ্ট হইল। (মানুষেরাও প্রত্যেকে যেন একটা মস্ত খাসীর পৃথক্ পৃথক্ টুক্‌রা,—সামাজিকতা নামক একটা অতি বৃহৎ লৌহশলা-

কার মধ্যে বিদ্ধ হইয়া এই লক্ষ লক্ষ মনুষ্য টুক্‌রা ঘেঁষাঘেঁসি অবস্থায় সংসারের অগ্নি-শিখার উপর ক্রমিক ঘুর খাইতেছে। নীতিজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে শুনা যায় যে, এই উপায়ে তাহারা উত্তরোত্তর ভারি সুস্বাদু হইয়া উঠিতেছে, এমন কি এমন আর দশ পনেরো শতাব্দী ক্রমিক সেঁক খাইলে পর সবশুদ্ধ মিলিয়া চরম সভ্যতার পরম সুগন্ধি শিক্ কাবাব প্রস্তুত হইবে। কি সান্ত্বনার কথা! ঘোর, আরো ঘোর, পোড় আরো পোড়, সমস্ত প্রস্তুত হইলে একদিন আমাদের মাথার উপরকার এই নীলাকাশের ঢাক্‌নাটা হঠাৎ কে খুলিয়া দিবে এবং এই বসুন্ধরার গোল থালাটি হইতে বাষ্পাকুল কাবাবি গন্ধ সুরলোকের নবাবী নাসিকায় প্রবেশ করিতে থাকিবে! কাবাবের দোকানের পাশে ফুঁকো ফানুষ নির্ম্মানের জায়গা, কিন্তু তাহাদের চুলায় কখনো আগুন জ্বালান হয় না। ঝাঁপ খুলিয়া কেহ বা হাত মুখ ধুইতেছে, কেহ বা দোকানের সম্মুখে ঝাঁট দিতেছে, দৈবাৎ কেহ বা পাকা দাড়ি লইয়া চোখে চষমা আঁটিয়া একখানা পার্সী কেতাব পড়িতেছে। সম্মুখে মস্‌জিদ্, একজন অন্ধ ভিক্ষুক মস্‌জিদের সিঁড়ির উপরে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাবুলী ওয়ালারা কেহ পথে দাঁড়াইয়া, কেহ দোকানে বসিয়া। টেরিটি বাজারের কাছে গরুর গাড়ি-পূর্ণ শাক সব্‌জি; মুটেদের মাথায় বড় বড় ঝাঁকায় পরস্পর-বাঁধা হাঁস মুরগী প্রভৃতি স্তুপাকৃতি হইয়া চলিয়াছে; হাঁসগুলির কোমলশুভ্র দীর্ঘ ঘাড় গুলি ঝাঁকা হইতে নীচে ঝুলিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছে, মুরগীরা বন্দী অবস্থায় পরস্পর ঝগড়া করিতে ত্রুটি করিতেছে না; সদয় হৃদয় মনুষ্য মহারাজারা এই অসহায়দের পরম মুক্তি দিবার জন্য জবর যজ্ঞের হুতাশন জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। আবার দক্ষিণ পার্শ্বে চাহিয়া দেখ, পাখীর দোকান। এক একটি ছোট খাঁচা কুড়ি পঁচিশটি করিয়া অরণ্যের ছোট ছোট পাখীগুলির দ্বারা একেবারে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে—অবিশ্রাম তাহারা কিচ্‌মিচ্ করিতেছে—ম্যুনিসিপালিটির ধুলা ও খাবি খাইতেছে—আকাশের দিকে উড়িতে চাহিতেছে অথচ পাখাটু ছড়াইবার জায়গা নাই।

গ [illegible]মে কয়লা ঘাটে গিয়া পৌঁছান গেল। সমুখ হইতে ছাউনি-ওয়ালা বাঁধা নৌকাগুলা দৈত্যদের পায়ের মাপে বড় বড় চটিজুতার মত দেখাইতেছে। মনে হইতেছে, তাহারা যেন হঠাৎ প্রাণ পাইয়া অনুপস্থিত চরণগুলি স্মরণ করিয়া চট্‌চট্ করিয়া চলিবার প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া পড়িয়াছে। একবার চলিতে পাইলে হয়, এইরূপ তাহাদের মুখের ভাব। একবার উঠিতেছে, যেন উঁচু হইয়া ডাঙ্গার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে কেহ আসিতেছে কি না,—আবার নামিয়া পড়িতেছে। একবার আগ্রহে অধীর হইয়া জলের দিকে চলিয়া যাইতেছে, আবার কি মনে করিয়া আত্ম সম্বরণ পূর্ব্বক ডাঙ্গার দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। গাড়ি হইতে মাটিতে পা দিতে না

দিতে ঝাঁকে ঝাঁকে মাঝি আসিয়া আমাদিগকে টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। এ বলে, আমার নৌকায় আইস ও বলে, আমার নৌকায় আইস, এইরূপে মাঝির তরঙ্গে পড়িয়া আমাদের তন্বুর তরী একবার দক্ষিণে যায়, একবার বামে যায়, একবার মাঝখানে আবর্ত্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হইতে থাকে। অবশেষে অবস্থার তোড়ে, পূর্ব্ব জন্মের বিশেষ একটা কি কর্ম্মফলে বিশেষ একটা নৌকার মধ্যে গিয়া পড়িলাম। পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। গঙ্গায় আজ কিছু বেশী ঢেউ দিয়াছে, বাতাসও উঠিয়াছে। এখন জোয়ার। ছোট ছোট নৌকাগুলি আজ পাল ফুলাইয়া ভারি তেজে চলিয়াছে আপনার দেমাকে অ[illegible] ক[illegible] হইয়া পড়ে [illegible]

দেয়!" কিন্তু পাষণ্ড মাঝিরা বাঙ্গালীর সন্তান হইয়াও ও কথায় বেশী মনোযোগ দিল না—মনে মনে কহিলাম, আমাদের জাহাজে পৌঁছিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় তোমরা জলে ডুবিয়া মর'! কিন্তু সম্মুখে চাহিয়া দেখি, ব্রাহ্মণের অভিশাপ সদা সদাই সফল হয় না! একটা মস্ত ষ্টীমার দুই পাশে দুই লৌহতরী লইয়া আশপাশের ছোটখাট নৌকাগুলির প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা ভরে লোহার নাকটা আকাশে তুলিয়া গাঁ গাঁ শব্দ করিতে করিতে সধূম্র নিশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। মনো[illegible] যোগ দিয়া দেখি[illegible]

রাখ্ রাখ্

থাকিলেই যথেষ্ট। কারণ, তখন জাহাজ অত্যন্ত কাছে আসিয়াছে। মনে মনে বলিলাম, হে অদৃষ্ট এই যদি তোমার লিখন ছিল যে নিজের জাহাজে লাগিয়া নিজে ডুবিব, তবে এত আয়োজনের কি আবশ্যক ছিল, বাড়ির দুয়ারের কাছে পৈতৃক পুকুরটা ছিল, সেইখানেই ডুব মারিলেই ত হইত! অনেক কষ্টে জাহাজ থামিল নৌকাটা তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কথাটা ঠিক নয়, তাহার পাশে আসিয়া ঘুর্কি নাচন নাচিতে লাগিল। মহা গোল-যোগ বাধিল, ঢেউ খাইয়া খাইয়া নৌকার ... হইল, জাহাজের উপর হইতে একটা সিঁড়ি নামাইয়া দিল। ছেলেদের প্রথমে উঠান গেল তাহার পর আমার ভাজ ঠাকুরাণী যখন বহুকষ্টে তাঁহার পূজ্য পাজোড়া স্থল পদ্ম-দুখানি জাহাজের উপরে তুলিলেন তখন আমরাও মধুকরের মত তাহাদেরি পশ্চাতে উপরে উঠিয়া পড়িলাম। এখন মরণকে আর কে ভয় করে! জীবনের ভার অত্যন্ত দুর্ব্বহ, যমই আমাদের প্রিয়জন। এ কিন্তু শুকনো ডাঙ্গার উপরে—তার পর জলে নামিয়া যখন ঢেউ দেখা যায় তখন মনের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতান্তর উপস্থিত হয়।

ক্রমশঃ।

অণুদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান ব্যবধান আছে, অণুগুলি সেই স্থান মধ্যে বিকম্পন করিতেছে। কঠিন পদার্থের অণু সকল পরস্পর এত ঘন সংলগ্ন যে তাহাদের মধ্যে কোন স্থান ব্যবধান আছে বলিয়া মনেই হয় না, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কঠিনতম প্রস্তর আর মসৃণতম ধাতুও অবিচ্ছিন্ন-অন্তরায় বিহীন, অণুময় নহে। তবে ইহাদের অণুগুলির মধ্যে স্থান ব্যবধান অতি অল্প, এবং সেই অল্প স্থানেই তাহাদের বিকম্পন আবদ্ধ ইহাই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন নাই—কেননা পরমাণু যেমন দৃষ্টির অতীত অণু ও ... দৃষ্টির অতীত, অণুদিগের বিক

স্পীয় অবস্থাতেই পদার্থের অণু সকল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরে গমন করে।

কিন্তু কঠিন পদার্থ অণুর অতি ক্ষুদ্র বিকম্পন পথ হইতে বায়ু-বিরল কাচ-পাত্র মধ্যস্থ অতি লঘু বাষ্পের (গ্যাস) সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত অণুবিকম্পন পথও এত দিন বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক বিন্দুমাত্র লক্ষিত হয় নাই। অনুমান ছাড়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত বসাইতে তাঁহারা এতদিন সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন। ক্রুক্‌শ্‌ সম্প্রতি ইহাতে কৃত কার্য্য হইয়া বিজ্ঞানকে আর একটি উচ্চ সোপানের উপর দাঁড় করাইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এত দিন কোন বায়ু-নিষ্কাশন যন্ ... ক অধিক ...

অবস্থায়, স্থানাভাবে, চাকসংলগ্ন মৌমাছির ন্যায়,পদার্থঅণু অবিরত একটির উপর একটি আসিয়া ঝাঁকিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু চতুর্থ অবস্থায় একটি অণু আর একটি অণুর গাত্র স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে পথমুক্ত পাইয়া স্বাধীন ভাবে খানিক দূরে চলিয়া যায়, চলিয়া গিয়া আবার সেখান হইতে ফিরিতে থাকে, এবং এইরূপ গতির সময় সেই গতির পথ স্পষ্ট প্রত্যক্ষমান হয়। আরো স্পষ্ট বুঝিবার জন্য, কিরূপ পরীক্ষা দ্বারা এই বিকম্পন পথ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ...কটু বলা আবশ্যক।

...দিক রুদ্ধ বায়ুপূর্ণ কোন একটি ... মনে ক... ...

যদি ২৫ ভাগের ২৪ ভাগ বায়ু বাহির না করিয়া নুতনাবিষ্কৃত উপায় দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নলবায়ুর ৪০ ভাগের ৩৯ ভাগ বায়ু বাহির করা যায় তাহা হইলে সমস্ত নলের অভ্যন্তর দেশ একরূপ অস্পষ্ট আলোকপূর্ণ হইবে, কেবল বিষম মেরুতারের কাছাকাছি একটা স্থানে অন্ধকার দেখা যাইবে। কিন্তু এই অন্ধকার স্থান ও বিষম মেরুবিন্দুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে গাঢ় নীল বর্ণের একটা আলোকের টুকরা দেখা যাইবে। ইহার পর যদি ৪০ ভাগের ৩৯ ভাগের স্থলে ১৬০ ভাগের ১৫৯ ভাগ বায়ু নল হইতে বাহির করিয়া ফেলা যায় তবে ... বিস্তৃত আলোকের মাঝে মাঝে পড়িতে থাকিবে—এবং পূর্ব্ব...

বাহির করিয়া লইতে লইতে শেষোক্ত অন্ধকারটি বাড়িয়া বাড়িয়া সমস্ত নলটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। এই অবস্থাতেও নলটি সম্পূর্ণ বায়ু শূন্য নহে। এখন ঐ নলের ভিতর বায়ু যে অবস্থায় থাকে তাহা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা নামে কথিত হয়—এই অবস্থায় নলাভ্যন্তরস্থিত বায়ু লঘু অপেক্ষাও লঘুতম, এবং এই অবস্থাপন্ন বায়ুর অণুগুলির বিকম্পন পথ এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে তাহা মাপা যাইতে পারে। নলটি উপ'র উক্ত রূপে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবার কারণ কি তাহা এইবার দেখা যাউক। ইহা [illegible]

হইতে দেখা যায়। কিন্তু নলটির বায়ুঅণুর সংখ্যা ক্রমে ক্রমে যতই বিরল করিয়া ফেলা যায়—ততই একটি অণুর, মেরুতার হইতে বিদ্যুৎ গ্রহণ করিয়া অন্যটির কাছে যাইতে কিছু দেরী হয় এবং তাহাকে বিদ্যুৎ দিয়া আবার মেরুতারের নিকট ফিরিয়া আসিতেও সময় লাগে, এই মধ্যবর্ত্তী দুই সময় আলোক উৎপন্ন হয় না, কাজেই মেরুর কাছে ও নলের স্থানে স্থানে অন্ধকার উৎপন্ন হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে নল মধ্যে যতই বায়ু কমিতে থাকে, যতই অণুগুলির চলিবার পথ বাড়িতে থাকে, ততই এক- [illegible]

নলমধ্যস্থিত প্লাটিনম তারের অগ্রভাগ যদি একটি ক্ষুদ্রবিন্দু না হইয়া একটি চাকতির মত হয়, এবং সেই চাকতি নিম্নাভিমুখী করিয়া রাখা হয় তবে সেই অণুগুলি, দর্পণ হইতে আলোক বিক্ষিপ্ত হইবার ন্যায়, চাকতির গাত্র স্পর্শ করিয়া সমরেখায় বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। অন্য কথায়, স্বঅঙ্গের বিদ্যুতালোক নলের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, নলের মধ্যে উহারা নির্ঝর প্রবাহে খেলিতে থাকে। এই সময় আলোক বিশ্লেষণী যন্ত্র দ্বারা এই আলোক বিশ্লেষণ করিয়াও পদার্থের অনেক গুপ্ত ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইতেছে।

বস্থা ভেদে এই সংযোগের পরিমাণ মাত্র প্রভেদ। যোগ শাস্ত্র ইহা হইতে আরো অধিক দূর গিয়াছে এই শাস্ত্রের মতে পদার্থের সপ্তবিধ অবস্থা।

স্থূল (কঠিন তরল ও বায়বীয়) স্বরূপ,—সূক্ষ্ম অন্বয় ও অর্থবত্ব। *

কঠিন তরল ও বায়বীয় এই ত্রিবিধ অবস্থা সম্পন্ন পদার্থই আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্ট হয়—সেই জন্য এই তিন অবস্থাই স্থূল বলিয়া গণ্য। ঐ অবস্থাপন্ন পদার্থ যখন কার্য্য করে—তখন উহাদের স্বরূপ-অবস্থা। যাহা পরমাণুত্ব প্রাপ্ত হইল তাহা [illegible]—অ[illegible] ই অবস্থাকে আ-

[illegible]

অন্য বিষয়ের আলোচনার মধ্যে, প্রসঙ্গ-ক্রমে মাত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উল্লেখ দেখিতে পাই—সুতরাং এরূপ স্থলে ও সকল বিষয়ের বিবৃত আলোচনা কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, বেশ তাহা যেন হইল কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রাচীন লুপ্তাবশিষ্ট পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাতেও ত ইয়োরপ শাস্ত্রের ন্যায় আলোচ্য বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবৃত হয় নাই। সুতরাং বিজ্ঞানের যে যে সমস্ত পুস্তক বিনষ্ট হইয়াছে তাহাতেও যে বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ আলোচনা ছিল এমন সম্ভবে না। বিজ্ঞানের যথার্থ উন্নতি হইলে কি এরূপ হইত?

দেখিলেই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এখন পণ্ডিতদিগের যে সকল জ্ঞান লিপিবদ্ধ করা হইতে সে কাহাদিগের জন্য? সাধারণ পাঠকদিগের জন্য। যাহারা যথার্থ বিদ্যাপ্রয়াসী তাহাদের জন্য নহে? যাহারা প্রকৃত পক্ষে বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষী হইত, তাহারা পুস্তক মাত্র পাঠে তাহা লাভ করিত না, গুরু স্বয়ং তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। যাহারা তত গভীর রূপে বিদ্যা শিক্ষা করিতে অপারক কিম্বা শিখিতে ইচ্ছা করে না—তাহাদিগকে স্থূল জ্ঞান দিবার জন্যই বিশেষ রূপে শাস্ত্র প্রণয়ন

তাহা তাঁহারা সাধারণকে তন্ন তন্ন রূপে বুঝাইবার আবশ্যকতাই বুঝিতেন না। বিজ্ঞান-জ্ঞানকে পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির উপায় স্বরূপ করিতে তাঁহারা যেন ঘৃণা করিতেন। আর্য্যগণের আচার, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রণালী প্রভৃতি সকলরূপ সামাজিক নিয়ম হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনই আর্য্যগণের চরম লক্ষ্যছিল। তাঁহারা জানিতেন মনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই পার্থিব সুখ শান্তি লাভ হইবে—কিন্তু কেবল মাত্র সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার কার্য্য। অতএব যাহাদের কুতূহল নিবৃত্তি করাই অভিলষিত, শিল্প সাধন করাই যাহাদের পুরুষার্থ, চিরকাল বন্ধন দশায় থাকিতে যাহারা ক্লেশ বোধ করে না, তাহারাই উহার অনুষ্ঠান করুক, কিন্তু যাহারা জ্ঞান ভোগ করিবে, অধ্যাত্ম তত্ত্বে নিমগ্ন হইয়া আত্মাকে মুক্ত করিবে, তাহারা উহা করিবেও না জানিবেও না। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষের উপর আবার ভাসমান পদার্থের উপদেশ কি? মনুষ্য বুদ্ধিবলেই তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবে। উৎপ্রেক্ষা বা উদ্ধার করিতে পারিবে। * কপিল ত একজন দার্শনিক, তিনি একথা বলা কিছু আশ্চ-[illegible] নহে. কিন্তু ইনি একা [illegible]হেন

[illegible] বাস্তবিক প্রাচীন [illegible]ন এত অভিজ্ঞতা লাভ ক[illegible]হলেন তবে ইয়োরপীয় শাস্ত্রকারগণের ন্যায় তাহারা কেন সে সকল বিষয় অতি সুস্পষ্ট বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করেন নাই? শাস্ত্রমধ্যে তাহা এত প্রহেলিকাময় [illegible] কেন? প্রথমতঃ আ-[illegible] বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় [illegible] বিষয়ক [illegible] প্রভৃতিতে,

[illegible]ষ [illegible]মান হয়। বৈশেষি[illegible]তে পদার্থের দুইরূপ, সংঘাতরূ[illegible]পু-[illegible] পৃথিব্যাদয়ঃ নিত্যা [illegible]

* [illegible] সংগ্রহ করিয়া দিয়া উপকৃত করিয়াছেন।

সাহায্য ব্যতীত কেবল শাস্ত্র পাঠে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবে না) সেই সময় পরমার্থ চিন্তায় ক্ষেপণ করিয়া মনের উন্নতি সাধন করুক, এই অভিপ্রায়েই আর্য্য শাস্ত্রের প্রকাশ প্রণালী ইয়োরোপ শাস্ত্রের প্রকাশ প্রণালী হইতে ভিন্ন এইরূপ ধারণা হয়।

শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী।

বিদেশী ফুলের গুচ্ছ।

সিন্ধুতীরে বিষন্ন-হৃদয়ের গান।

(Shelley)

১

মধুর সূর্য্যের আলো, আকাশ বিমল,
ক্ষা সঘনে উঠি— ারিচয় নে ল।
সংস্কৃত শাস্ত্র মাত্রেরি প্রকাশ প্রণ
রপীয় শাস্ত্র প্রণালী হইতে ভিন্ন।
কি বিজ্ঞান প্রত্যেক বিষয়েই ইয়ো
কারগণ যে সিদ্ধান্তে আসিতেছেন
প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোপান
গুলিতে উঠিবার নিয়ম দেখাইতে
কিন্তু আর্য্যগণ কোন সিদ্ধান্তে উপ
হইবার সোপান—তাহার প্রণালী কিছু
বলিয়া কেবল সিদ্ধান্তটি বলিয়াই
নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদে
জ্ঞানের অভাব প্রকাশ পাইতেছে না—
কেবল সেই জ্ঞান প্রকাশের প্রণালীর অস-
ম্পূর্ণতা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু সেই
জ্ঞানশালী পণ্ডিতদিগের পুস্তকে এ অস-
ম্পূর্ণতাটুকই বা কেন? একটু ভাবিয়া

উপকূল পানে ধেয়ে
মুঠি মুঠি তারাবৃষ্টি করে ঢেউগুলি!
বিরলে বালুকা তীরে
একা বসে রয়েছি রে,
ক তারাবৃষ্টি করিছে বিজুলী।
ঢেউগুলি করিছে উত্থান,
একটি তান!

নাই যশ, নাই প্রেম, নাই অবসর ;
পূর্ণ করে আছে এরা সকলেরি ঘর,
সুখে তারা হাসে খেলে,
সুখের জীবন বলে
আমার কপালে বিধি লিখিয়াছে আরেক
অক্ষর।

৪

কিন্তু নিরাশাও শান্ত হয়েছে এমন,
যেমন বাতাস এই, সলিল যেমন।
মনে হয় মাথা থুয়ে
এইখানে থাকি শুয়ে
অতিশয় শ্রান্তকায় শিশুটির মত,
কাঁদিয়া দুঃখের প্রাণ
ক'রে দিই অবসান,
যে দুঃখ বহিতে হবে, বহিয়াছি কত!
আসিবে ঘুমের মত মরণের
ধীরে ধীরে হিম হবে

যত চাপিলাম মুঠি
পাপ্‌ড়িগুলি গেল টুটি,
কান্না ওঠে, গান থেমে যায়।

কি বলিছ সখা হে আমার,
ফুল নিতে যাব কি আবার!
থাক্, বঁধু, থাক্ থাক্,
আর কেহ যায় যাক্,
আমি ত যাবনা কভু আর!
শ্রান্ত এ হৃদয় অতি দীন,
পরাণ হয়েছে বলহীন।
ফুলগুলি মুঠা ভরি
মুঠায় রহিবে মরি,
আমি না মরিব যত দিন!

ন, দর্শন

ান আবিষ্কর্ত্তা তাঁহারাই প্রায় ছিলেন। কোন বিষয়ের অনু-
ষ্ঠিতকার্য্য হইতে, কোন সিদ্ধান্ত হইতে, তাঁহাদের যে সকল ক্ষুদ্র ... রিতে হইত তাহাতে যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইত, সেই ও পরিশ্রম যাহারা স্বীকার করিবে না, রা তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল মাত্র ভোগ ক, একের সিদ্ধান্ত অন্যে গ্রহণ করুক, তি ক্ষুদ্র পথ দিয়া চলিতে সকলের যে ময় ক্ষেপ হইবে, বৃথা সময় ক্ষেপ হইবে, কেন না তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল গুরুর

* সাংখ্য দর্শন। শ্রীকালীবর বেদান্ত-বাগীশ প্রণীত।

(Aubrey De Verr.)

প্রভাতে একটি দীর্ঘশ্বাস ;
একটি বিরল অশ্রুবারি
ধীরে ওঠে, ধীরে ঝ'রে যায় ;
শুনিলে তোমার নাম আজ,
কেবল একটুখানি লাজ—
এই শুধু বাকি আছে হায় !
আর সব পেয়েছে বিনাশ !
এককালে ছিল যে আমারি,
গেছে আজ করি পরিহাস !

(Augusta webster.)

গোলাপ হাসিয়া বলে,"আগে বৃষ্টি যাক্‌চ'লে,
দিক্ দেখা তরুণ তপন,
[illegible]"
মধ্যাহ্নের স্বচ্ছ করে
সাজিয়াছে থরে থরে
ক্ষুদ্র নীল দ্বীপগুলি, শুভ্র-শৈল-শির ;
কাননে কুঁড়িরে ঘিরি,
পড়িতেছে ধীরি ধীরি
পৃথিবীর অতি মৃদু নিঃশ্বাস সমীর।
একই আনন্দে যেন গায় শত প্রাণ ;
বাতাসের গান আর পাখীদের গান,
সাগরের জলরব
নগরের কলরব
এসেছে কোমল হ'য়ে স্তব্ধতার সঙ্গীত সমান।

২

আমি দেখিতেছি চেয়ে সমুদ্রের জলে
শৈবাল বিচিত্র বর্ণ ভাসে দলে দলে।
আমি দেখিতেছি চেয়ে,

বড় শীঘ্র গেলি মধুমাস,
দুদিনেই ফুরাল নিশ্বাস !
বসন্ত আবার আসে বটে,
গেল যে সে ফেরে না আবার !

(P. B. Marston.)

হাসির সময় বড় নেই,
দুদণ্ডের তরে গান গাওয়া ;
নিমেষের মাঝে চুম খেয়ে
মুহূর্ত্তে ফুরাবে চুম খাওয়া !
বেলা নাই শেষ করিবারে
অসম্পূর্ণ প্রেমের মন্ত্রনা ;
সুখস্বপ্ন পলকে ফুরায়,
তার পরে জাগ্রত যন্ত্রণা !
কিছুক্ষণ কথা ক'য়ে লও,
তাড়াতাড়ি দেখে লও মুখ ;
তা[illegible] দেখা শুনা,
তা[illegible]তেছে [illegible]
[illegible]বর ভরে
[illegible] কেমন করে
আমার সে ভাব আজি বুঝিবে কি আর
কোন প্রাণ !

৩

হায় মোর নাই আশা, নাইক আরাম,
ভিতরে নাইক শান্তি অন্তরে বিরাম।
নাই সে সন্তোষ ধন—
জ্ঞানী ঋষি যোগীগণ
ধ্যান সাধনায় যাহা পায় করতলে ;
আনন্দ মগন মন
করে তারা বিচরণ
বিমল মহিমালোক অন্তরেতে জ্বলে।

হে প্রকৃতি, তারে নিয়ে কি হ'ল' তোমার!
শত রঙ্ করা পাখী
তোর কাছে ছিল নাকি!
কত তারা, বন, সিন্ধু, আকাশ অপার!
জননীর কোল হতে কেন তবে কেড়ে নিলি!
লুকায়ে ধরার কোলে ফুল দিয়ে ঢেকে দিলি!
শত-তারা-পুষ্পময়ি!
মহতী প্রকৃতি অয়ি,
না-হয় একটি শিশু নিলি চুরি ক'রে—
অসীম ঐশ্বর্য্য-তব
তাহে কি বাড়িল নব!
নুতন আনন্দ কণা মিলিল কি ওরে!
অথচ তোমারি মত বিশাল মায়ের হিয়া,
সব শূন্য হয়ে গেল একটি সে শিশু গিয়া!

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মণ্ডন শঙ্কর সংবাদ।

(মাধবাচার্য্যের শঙ্কর দিগ্বিজ্য়... ——
.কাল,
...গোল।
শঙ্করাচার্য্য ...
পরি... ...মুর্ষু শ্রবণ ত...
মিশাইবে পলে
সাগরের অবিরাম একতান অন্তিম কল্লো...!

(Mrs. Browning.)

সারাদিন গিয়েছিনু বনে,
ফুলগুলি তুলেছি যতনে।
প্রাতে মধুপানে রত
মুগ্ধ মধুপের মত
গান গাহিয়াছি আনমনে!

এখন চাহিয়া দেখি, হায়,
ফুলগুলি শুকায় শুকায়!

(Ernest Myers)

আমায় রেখ না ধ'রে আর,
আর হেথা ফুল নাহি ফুটে।
হেমন্তের পড়িছে নীহার,
আমায় রেখ না ধ'রে আর।
যাই হেথা হতে যাই উঠে,
আমার স্বপন গেছে টুটে!
কঠিন পাষাণ-পথে
যেতে হবে কোন মতে
পা দিয়েছি যবে!
একটি বসন্ত রাতে
ছিলে তুমি মোর সাথে,
পোহাল ক্ষ, চলে যাও তবে!

জানিবে। জগৎ নিত্য কি অনিত্য, যে গৃহদ্বারে পিঞ্জরে বসিয়া শুকাঙ্গণাগণ এ সমুদায় আলোচনা করে সেই মণ্ডন পণ্ডিতের গৃহ জানিবে"। দাসীদিগের নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি মণ্ডনের বহির্ব্বাটিতে যাইয়া দেখিলেন দ্বাররুদ্ধ, প্রবেশের সুবিধা নাই। তিনি যোগ বলে গগণপথে উঠিয়া অঙ্গনান্তে অবতরণ করিলেন। দেখিলেন গৃহ যেন ইন্দ্রধাম। মণ্ডনেরও মুখচ্ছবি ব্রহ্মার তুল্য তেজস্বী, তিনি তপস্যার প্রভাবে সজৈমিনি ব্যাসদেবকে সাক্ষাৎ আনিয়া যথাবিধি তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, এমন সময় শঙ্কর তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ সূত্রকার ভাষ্যকারকে দেখিয়া অভ্যর্থনা

তখন [illegible] শিখো-
গেল মেঘ, এল উষা, আকাশের আঁখি হতে
মুছে দিলে বৃষ্টি বারি কণা।
সেত রহিল না!
কোকিল ভাবিছে মনে,"শীত যাবে কতক্ষণে,
গাছপালা ছাইবে মুকুলে,
তখন গাহিব মন খুলে!"
কুয়াশা কাটিয়া যায়—বসন্ত হাসিয়া চায়,
কানন কুসুমে ভ'রে গেল।
সে যে ম'রে গেল!

(Hid.)

এত শীঘ্র ফুটিলি কেনরে!
ফুটিলে পড়িতে হয় ঝ'রে;
মুকুলের দিন আছে তবু,
কোটা ফুল ফোটেনাত আর!

মুণ্ডী অর্থাৎ তোমার 'মাথা কোন পর্য্যন্ত নেড়া?'

এই অর্থ করিয়া লইয়া বলিলেন গলদেশ পর্য্যন্ত (নেড়া)।

মণ্ডন ভাবিলেন হয়ত এ আমার প্রশ্ন বুঝিতে পারে নাই। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন

"পন্থান্তে পৃচ্ছ্যতেময়া"। অর্থ এই, তোমার পথের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

কিন্তু শঙ্কর অর্থ করিলেন তোমার পথকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই অর্থ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

পথ তোমায় কি বলিল?

মণ্ডন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন

[illegible]ণ্ডতি"। তুমি (শঙ্কর) মাতা-

[illegible]বে খুঁজি[illegible]
বেলা নাই কথা কহিবারে
যে কথা কহিতে ফাটে প্রাণ;
দেবতারে ফুট কথা বলে
পূজার সময় অবসান!
কাঁদিতে রয়েছে দীর্ঘদিন,
জীবন করিতে মরুময়,
ভাবিতে রয়েছে চিরকাল,
ঘুমাইতে অনন্ত সময়!

(Victor Hugo)

বেঁচেছিল, হেসে হেসে,
খেলা ক'রে বেড়াত সে,

শঙ্কর। আমার সুরার বর্ণজ্ঞান আছে তাহাতে দোষ হয় না, একবার দেখিবামাত্র বর্ণজ্ঞান লাভ হয়; কিন্তু তুমি যখন সুরা-পানের কথা বলিয়াছ, অবশ্য তোমার সুরার রসজ্ঞান আছে, যাহা পান ভিন্ন জন্মে না। তবে তুমি অব্রাহ্মণ।

মণ্ডন ক্রোধাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন "মত্তোজাতঃ কলঞ্জাশী বিপরীতানি ভাষতে।" অর্থাৎ এব্যক্তি অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া পাগল হইয়াছে, তাই প্রতি কথার বিপরীত অর্থ করিতেছে। কিন্তু শঙ্কর তাহার অর্থ করিলেন আমা হইতে-এক অভক্ষ্য ভক্ষণ শীল পুত্র জন্মিয়াছে, সে অনুচিত ভাষা ব্যবহার করে।

শঙ্কর। ঠিক হইয়াছে, যেমন —
তেমনই — [illegible] ক মণ্ড
[illegible] প্রয়াগ
[illegible] পণ্ডিত
[illegible] করিয়া গগণপথে [illegible]
কে জয় করিতে চলিলেন। [illegible] যাইতে মাহিষ্মতী নামে এক অপূর্ব্ব পুরী দেখিতে পাইলেন; তথায় মণ্ডন পণ্ডিতের নিবাস। আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন চারিদিকে রত্ন খচিত অট্টালিকা। কোথাও পদ্মবন, কোথাও বা সারি সারি শালবৃক্ষ বাত্যায় আন্দোলিত; গন্ধ-বহ পদ্ম-গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিয়াছে। নিকটে প্রসন্নজলা নর্ম্মদা প্রবাহিত। নদীতীরে বসিয়া ভগবান্ ভাষ্যকার সুশীতল বায়ু সেবনে পথশ্রান্তি দূর করিলেন। বিশ্রামান্তে আহ্নিক সমাপন করিয়া তিনি দ্বিপ্রহর বেলায়

শঙ্কর। গুরু শুশ্রূষার ভয়ে গুরু কুল-পরিত্যাগ করিয়া যে তুমি স্ত্রী শুশ্রূষায় রত হইয়াছ, তাহাতেই তোমার কর্ম্ম নিষ্ঠতার পরিচয় হইয়াছে।

মণ্ডন। স্ত্রীর গর্ভে তোমার জন্ম, স্ত্রী কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছ, হে মূর্খ, তুমি কি অকৃতজ্ঞ, যে তাহাদেরই নিন্দা করিতেছ।

শঙ্কর। যাঁহাদের স্তন্যে তুমি পোষিত, যাঁহাদের গর্ভে তোমার উৎপত্তি হে অতি মূর্খ কোন্ লজ্জায় তুমি তাহাদের পশুর চক্ষে দেখিতেছ।

মণ্ডন। গার্হ-পত্য প্রভৃতি অগ্নির রক্ষণে যত্ন না করিয়া তুমি ইন্দ্রবধের পাতকী হইয়াছ।

শঙ্কর। পরমাত্ম-স্বরূপ না জানিয়া তুমি আত্ম-বাধ[illegible]ত গৃহীত।)

মণ্ডনের গৃহোদ্দেশে চলিলেন। যাইতে যাইতে পথে মণ্ডন মিশ্রের বাড়ীর দাসীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা জল আনিতে যাইতেছিল; দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'মণ্ডনের গৃহ কোথায়'? দাসীগণ শঙ্করের অপূর্ব্ব মুখজ্যোতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উত্তর করিল,—"বেদ স্বতই প্রমাণ, না প্রত্যক্ষাদি অপর প্রমাণাপেক্ষী, যে গৃহদ্বারে পিঞ্জরে বসিয়া শুকাঙ্গনাগণ এ সমুদায় আলোচনা করে, তাহাই মণ্ডন পণ্ডিতের গৃহ জানিবে। ফলদাতা স্বকৃত কর্ম্ম, না ফলদাতা ঈশ্বর, যে গৃহদ্বারে পিঞ্জরে বসিয়া শুকাঙ্গনাগণ এ সমুদয় আলোচনা করে সেই মণ্ডন পণ্ডিতের গৃহ

'অহো প্রকটিতং জ্ঞানং যতিভঙ্গেন ভাষিনা', কথা বলিতে ছন্দ ভঙ্গ করিয়া কি বিদ্যারই পরিচয় দিয়াছ।

কিন্তু মণ্ডন অর্থ করিলেন যতি-ভঙ্গ অর্থাৎ সন্ন্যাসী পরাজয় করিয়া কি বিদ্যারই পরিচয় দিয়াছ।

মণ্ডন। যতি ভঙ্গই আমার লক্ষ্য আমার পক্ষে যতি ভঙ্গে কি দোষ!

শঙ্কর। তবে-যতি ভঙ্গ, এই পদে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস কর। যতি ভঙ্গ অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইতে পরাজয়।

মণ্ডন। কোথায় বা বেদ আর কোথায় বা এ দুর্ব্বুদ্ধি, কোথায় বা সন্ন্যাস আর কোথায় এ কলি যুগ, বোধ হয় এব্যক্তি নিষিদ্ধ ভুক্ষণের লোভে যতিবেশ ধারণ করিলেন। মণ্ডন সহসা এক... উপবীত-বর্জ্জিত অপরিচিত সন্ন্যাসীকে ব্যাস-জৈমিনির সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। শ্রাদ্ধকালে ক্রোধ নিষিদ্ধ, হইলে কি হইবে। একে পণ্ডিত তাহাতে আবার তাঁহার সৎকর্ম্মের অভিমান, বিধিনিষেধের ধার ধারে কে? মণ্ডন ও শঙ্করের মধ্যে তৎকালের পরস্পর প্রশ্নোত্তর অতি রহস্য পূর্ণ, একদিকে গৃহস্থাশ্রমীর অভিমান অপর দিকে সন্ন্যাসীর রসিকতা! প্রয়োজন বোধে স্থলে স্থলে মূল সংস্কৃতই অনুবাদসহ দেওয়া গেল;—

মণ্ডন। "কুতোমুণ্ডী"? অর্থাৎ, মুণ্ডী, অর্থাৎ নেড়ামাথা সন্ন্যাসী কোন পথে আসিলে?

কিন্তু শঙ্কর অর্থ করিলেন, কুতো- জানিয়া শীঘ্র তাঁহার অভ্যর্থনা কর।' ব্যাসের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মণ্ডন পণ্ডিত লজ্জিত হইলেন। শান্তভাবে আচমন করিয়া শঙ্করকে ভিক্ষা গ্রহণে সবিনয় অনুরোধ করিলেন। শঙ্কর উত্তর করিলেন 'হে সৌম্য বিবাদ ভিক্ষা ইচ্ছা করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। যিনি পরাজিত হইবেন তিনি জেতার শিষ্য হইবেন, এই পণে বিচার করিব; এই মাত্র ভিক্ষা করি। অপর কোন ভিক্ষায় আমার স্পৃহা নাই। যদিও সন্ন্যাসীর পক্ষে তর্ক দ্বারা কোন পক্ষ আশ্রয় করা নিষিদ্ধ হয়, আমার বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, কোনরূপ যশের বাসনা করি না। সংসার তাপের শান্তি স্বরূপ, সেই একমাত্র পথের তুমি নিন্দা করিয়াছ। সকল মুণ্ড। ...পত্তি খণ্ডন করিলা আমি জগতে

কিন্তু শঙ্কর অর্থ করিলেন, পথ মণ্ডনকে বলিয়াছে তুমিই (মণ্ডন) মাতামুণ্ড।

শঙ্কর। বেশ বলিয়াছে। হে মণ্ডন, তুমি প্রশ্ন করিয়াছ, উত্তর তোমাকেই লক্ষ্য করিবে। আমি জিজ্ঞাসাও করি নাই, উত্তরও আমাকে লক্ষ্য করে না।

মণ্ডন। "অহো পীতাকিমুস্বরা"

মণ্ডনের অভিপ্রায়, আঃ, তুমি কি সুরাপান করিয়াছ? কিন্তু শঙ্কর তাহার অর্থ করিলেন—সুরা কি পীত বর্ণ?

শঙ্কর। না, শ্বেত বর্ণ, স্মরণ করিয়া দেখ।

মণ্ডন। তোমার কি সুরার বর্ণ-জ্ঞান আছে। তবে তুমি সুরাপায়ী ভণ্ড যোগী।

হইবে, এই কুতূহল আমার মনে সর্ব্বদা জাগরুক। অহো, আমার জয়োৎসব অদ্য স্বয়ংই উপস্থিত হইয়াছে। হউক আমাদের মধ্যে বিচার, আমাদের শাস্ত্রাভ্যাসের শ্রম অদ্য সফল হউক। তোমার বাক্যরূপ নবসুধা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত, সংসারবাসী লোকে কি তাহা গ্রহণ করিবে না? এই আমি স্বয়ং কৃতান্তান্তক ঈশ্বরকেও পলকে উড়াইয়া দিতে পারি; হউক তোমায় আমায় বিচার, তুমি আমার বাক্‌চাতুরী কদাপি শোন নাই। তাহা প্রতিপক্ষের অহঙ্কার কানন বিনাশে কঠোর কুঠারবৎ। তুমি যে বাদ-দান ভিক্ষা করিয়াছ, এ অতি সামান্য কথা; শুনিবামাত্র আমি তাহা করিতে প্রস্তুত, ইহাতে আমার চির আনন্দ; তবে কি না প্রতিযোগী ত্রাদৃক্কর্ত্তা কেন [illegible] তোমার [illegible] গান জন্মিয়াছে।

মণ্ডন। হে দুর্ব্বুদ্ধে গর্দ্দভের ন্যায় দুর্ব্বহ কন্থা ভার বহন করিতেছ, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে তোমার কি এমন অধিক ভার হইত।

শঙ্কর। হে দুর্ব্বুদ্ধে, তোমার পিতার ও দুর্ব্বহ কন্থা ভার বহন করিতেছি বটে; কিন্তু যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে স্বয়ং শ্রুতির পক্ষেই তাহা দুর্ব্বহ হইত।

মণ্ডন। ভার্য্যার রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে তুমি কতকগুলি শিষ্য আর পুস্তকের ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহাতেই তোমার শ্রুতি নিষ্ঠতার পরিচয় হইয়াছে।

কল্য বাদ কথা হইবে, এখন আমি মধ্যাহ্নিক ক্রিয়া করিতে যাই।

"হউক, কল্যই বিচার হইবে," শঙ্কর এই কথা বলিলে পর, মণ্ডন, ব্যাস ও জৈমিনিকে মধ্যস্থ হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা মণ্ডন-পত্নী-দ্বয় ভারতীকে মধ্যস্থপদে নিয়োগ করিতে বলিলেন। মণ্ডনও তাহাতে স্বীকৃত হইয়া মুনিত্রয়ের বিধিবৎ পূজা করিলেন। হে শিক্ষাভিমানী যুবক যদি প্রকৃত স্ত্রী স্বাধীনতা দেখিতে চাও, তবে একবার নিজ ঘরের দিকে চক্ষু ফিরাও; আর সেই বিলাতি বৈটকখানার পুতুল পূজা করিয়া বিলাসের স্রোতে দেশ ভাসাইও না। পার্শ্বস্থ শিষ্যদ্বয় তাঁহাদের [illegible] [illegible] জন্য [illegible] াতকী হইয়াছ।

মণ্ডন। দ্বারপাল দিগকে বঞ্চনা করিয়া চোরের মতন আসিলে কি রূপে?

শঙ্কর। ভিক্ষুক দিগকে বঞ্চনা করিয়া কোন প্রাণে তুমি চোরের মতন একাকী ভোগ কর?

মণ্ডন প্রত্যুত্তর দানে অসমর্থ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কর্ম্ম কালে ন সম্ভাষ্য অহং মূর্খেন সম্প্রতি'। কার্য্য কালে এখন আমার তোমার মতন মূর্খের সহিত আলাপ করা উচিত হয় না।

'সম্ভাষ্যঃ' এবং 'অহং' সন্ধি করিলে হয় সম্ভাষ্যোঽহং, কিন্তু এরূপ পদ করিলে যতি (ছন্দ) ভঙ্গ হয়। যথা, কার্য্য-কালেন সম্ভাষ্যোঽহং মূর্খেন সম্প্রতি। তাই শঙ্কর বলিলেন,

পারমাণবিক সিদ্ধান্ত।

পদার্থ জগৎ পরমাণু দ্বারা গঠিত এইরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা-পদার্থদিগের গঠন, যোগ, ও বিয়োগ সম্বন্ধীয় সমুদয় ঘটনা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছি। প্রায় সমুদয় পরমাণুদিগেরই এক আয়তন, অর্থাৎ কোন এক পরমা

যে আয়তন প্রায় অন্য কোন এক পর

সেই আয়তন; পরমাণুদিগের

... সে ...

করিয়াছে।

শঙ্কর। কে

এ দুরাচার, কোথায় বা অগ্নিহোত্র আর কোথায় এ ঘোর কলি, মনে হয় যেন এ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির আশয়ে কর্ম্মীর বেশ ধারণ করিয়াছে।

বিশ্বরূপ এইরূপে সরোষে দুর্ব্বাক্য সকল প্রয়োগ করিলে পর, এবং শঙ্করও সকৌতুকে তাহার অতি সুন্দর উত্তর প্রদান করিলে পর, জৈমিনি বিশ্বরূপের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ব্যাসদেবও তাহাকে বলিতে লাগিলেন 'বৎস অনাসক্ত তত্ত্বজ্ঞানী যোগীর প্রতি এইরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা সাধুজনের কর্ত্তব্য হয় না। বিষ্ণু স্বয়ং এই যতির বেশে তোমার নিকট আসিয়াছেন, ইহা

পদার্থ বিচ্ছিন্ন করা যায় (যেমন উত্তপ্ত লৌহের উপর দিয়া উষ্ণজলীয় বাষ্প লইয়া গেলে ঐ বাষ্পের অক্‌সিজেন লৌহের সহিত

... হয় আর হাইড্রোজেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে) তাহা হইলে ঐ মৌলিক পদার্থের পরমাণুগণ হয় অন্য কোন মৌলিক পদার্থের

প্রকার আপত্তি খণ্ডন করিয়া আমি ... বেদান্ত পথ প্রচার করিব। হয় তুমি সেই পথ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বীকার করিয়া গ্রহণ কর, না হয় আমার সহিত বিচার কর, না হয় বল যে পরাজিত হইয়াছ।

যোগীর কথায় মণ্ডনের অভিমানে আঘাত লাগিল; স্বীয় পূর্ব্বকৃত পরাভবে বিস্মিত হইয়া মণ্ডন নিজের গৌরব সূচক বাক্যে বলিতে লাগিলেন "যদি স্বয়ং শেষও আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, বিজিত হইয়াছি এরূপ কথা এ মণ্ডন বলিবে না। অথবা বৈদিক কর্ম্ম মার্গ পরিত্যাগ করিয়া তোমার মত গ্রহণ করিবে না। কবে পণ্ডিতদিগের সহিত সমাগম হইবে, কবে তাঁহাদের সহিত নানা রসযুক্ত বাদকথা

একটা রেখা টানি, যেমন হ—, তাহা হইলে যখন দুই পরমাণু হাইড্রোজেন যুক্ত হয় তখন তাহাদিগের যোগ এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে হ—হ, অর্থাৎ এক পরমাণুর এক মুখিত্ব অপর পরমাণুর এক মুখিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে। সেইরূপ আবার অ=অ এই চিহ্ন দ্বারা এই বুঝিতে হয় যে অক্সিজেনের দুই পরমাণু যুক্ত হইয়া তাহাদিগের একের দুই মুখিত্ব অপরের দুই মুখিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে; ৬. ন≡ন এইরূপ চিহ্ন দ্বারা দুইটী ত্রিমুখী নাইট্রোজেন পরমাণুর. আর ক=ক এই

এই দুই হাইড্রোজেন পরমাণু একটী অক্সিজেন্ পরমাণু দ্বারা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধিত হয় (হ—অ—হ)। পরমাণুদিগের মুখিত্ব কিরূপে পরস্পর সম্বন্ধিত থাকে তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আর কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

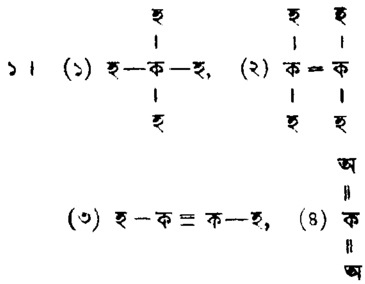

=ন, (২) হ—ন—হ,

শ্রীম ...

করিতে লা-

... শঙ্কর পরস্পর কিয়ৎকাল আলাপ করিলেন। অনন্তর সকলে মণ্ডনের গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র ব্যাস ও জৈমিনির অদর্শন হইল। শঙ্কর নর্ম্মদাতীরে কোন এক দেবালয়ে অবস্থান করিলেন। এইরূপে যতি-রাজ দৈবযোগে ইতর-জন-দুর্লভ ব্যাস-জৈমিনির দর্শন লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বীয় শিষ্যদিগকে তাঁহাদের কথিত কথা সকল শুনাইয়া সেই রাত্রি যাপন করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিজয়দাস দত্ত।

... মেলে না। বাদ করিব, কিন্তু আমাদের জয় পরাজয় স্থির করিবে কে? কেবল কণ্ঠশোষণের জন্য না হইয়া পরস্পর জয়েচ্ছায় বিবাদ করিতে হয়। আমাদের মধ্যে কিরূপ প্রতিজ্ঞা হইবে? কেইবা আমাদের মধ্যস্থ হইবে?

আমি গৃহীদিগের প্রধান, আপনিও যোগীদিগের প্রধান, জয় অথবা পরাজয়ে কোন পণ স্থির করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইব। আজ আমি কৃতার্থ হইলাম যে আর্য্যপাদ আমার সহিত বাদ প্রার্থনা করিতেছেন,

ড্রোজেন পরমাণুর চার এক মুখিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে ; তৃতীয়টীর নাম অ্যাসেটিলীন্ গ্যাস (যখন প্রদীপ নিবাইয়া দেওয়া যায়, তখন যে এক প্রকার গন্ধময় গ্যাস সলিতা হইতে উঠে তাহা এই অ্যাসেটিলীন্ গ্যাস,) ইহাতে দুই কার্ব্বণ পরমাণুর একের ত্রিমুখিত্ব অপরের ত্রিমুখিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে ; আর উভয়ের অবশিষ্ট একমুখিত্ব এক পরমাণু হাইড্রোজেনের একমুখিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে ; আর চতুর্থটীর নাম কার্ব্বণিক অ্যাসিড্ গ্যাস (যখন কাঠ পোড়ান যায়, তখন এই গ্যাস উৎপন্ন হয় ; আম[illegible]াণুরও [illegible] যোগ দ্বারা [illegible]

যে অণু গঠ[illegible] অণু যে কয় পরমাণু দ্বারাই গঠিত হউক না কেন, তাহার আয়তন দুই পরমাণুর আয়তনের সমান। পরমাণু শব্দে ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ বুঝিতে হইবে, এই ক্ষুদ্রতম অংশ আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু আমরা যুক্তি দ্বারা তাহার অস্তিত্ব প্রস্তাব করিয়া থাকি ; মৌলিক পদার্থে পরমাণুগণ পৃথক্ পৃথক্ থাকে না, এক পরমাণু অপর এক পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া একটী অণু উৎপাদন করে, এইরূপে দুই দুই পরমাণুতে যে সকল অণু উৎপন্ন হয় তাহারা আবার পরস্পর একত্রিত হইলে পদার্থখণ্ড উৎপন্ন হয়। এই অণুও আমাদিগের ইন্দ্রিয় গোচর নহে, ইহারও অস্তিত্ব যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করা হইয়াছে। যদি কোন যৌগিক পদার্থ হইতে একটী মৌলিক

ওজন এক ভাগ হাইড্রোজেন্ আর এক ভাগ জল, সমান পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে হইলে দেখা যায় যে তাহাতে জলের অপেক্ষা হাইড্রোজেনের ৩·৪ গুণ অধিক উত্তাপের প্রয়োজন, অর্থাৎ এক সের হাইড্রোজেন উত্তপ্ত করিতে যত উত্তাপের প্রয়োজন, ৩·৪ সের জল সেই পরিমাণে উত্তপ্ত করিতেও তত উত্তাপের প্রয়োজন। সমান ওজন এক ভাগ অক্সিজেন আর এক ভাগ জল সমান পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে জলের যত উত্তাপ লাগিবে, অক্-[illegible] উত্তাপ লাগিবে।

[illegible] পরমাণুর সহিত যুক্ত হয় আর তাহ। হইলে তাহাদিগের মধ্যে দুইটী দুইটী যুক্ত হইয়া ঐ মৌলিক পদার্থের একটী একটী অণু উৎপাদন করে। মৌলিক পদার্থের অণুর ন্যায় যৌগিক পদার্থের অণুও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যুক্তি দ্বারা তাহারও অস্তিত্ব প্রস্তাব করা হইয়া থাকে। আমরা অণু ও পরমাণু সম্বন্ধে এ সকল কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তবে যাহাতে আমরা কথাগুলি মনের মধ্যে স্পষ্টরূপে ধারণা করিতে পারি সেই উদ্দেশ্যে পুনর্ব্বার তাহাদিগের উল্লেখ করা হইল। আমরা পূর্ব্বে পরমাণুদিগের মুখিত্বের কথা বলিয়াছি, এখন দেখা যাউক এই মুখিত্ব দ্বারা পরমাণুদিগের যোগ বিয়োগ কিরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ; হাইড্রোজেন পরমাণু এক মুখী, আমরা যদি হ এই অক্ষর দ্বারা হাইড্রোজেনের এক পরমাণু বুঝাই আর হাইড্রোজেন পরমাণু এক মুখী ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত হ'য়ের পাশে

করিতে সমান উত্তাপের প্রয়োজন, অর্থাৎ এক পরমাণু হাইড্রোজেন উত্তপ্ত করিতে যত খানি উত্তাপের প্রয়োজন এক পরমাণু অক্সিজেন সেই পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে ততখানি উত্তাপের প্রয়োজন। এইরূপ যুক্তি দ্বারা দেখা গিয়াছে যে হাইড্রোজেন গ্যাসের এক পরমাণু উত্তপ্ত করিতে যত উত্তাপের প্রয়োজন, অন্য কোন মৌলিক গ্যাসের এক পরমাণু সেই পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে তত উত্তাপের প্রয়োজন। এই বিষয় প্রকাশ করার নিমিত্ত এই কথা বলা [illegible]

দ্বারা দুইটী চতুর্মুখী কার্বন পরমাণুর যোগ প্রকাশিত হইতেছে। যখন এক অণু অক্সিজেন আর দুই অণু হাইড্রোজেন হইতে দুই অণু জল হয়, তখন যে যোগ ও বিয়োগ ঘটে তাহা এইরূপে দেখান যাইতে পারে, (অ — অ) + (হ — হ) + (হ — হ) = (হ — অ — হ) + (হ — অ — হ), অর্থাৎ এক 'অ' এর দ্বিমুখিত্ব অন্য 'অ' এর দ্বিমুখিত্বের সহিত যুক্ত হইয়া এক অণু অক্সিজেন হয়, সেইরূপ দুইটী একমুখী হাইড্রোজেন পরমাণুর যোগে এক অণু হাইড্রোজেন হয়। যখন এক অণু অক্সিজেন ও দুই অণু হাইড্রোজেনের যোগে দুই অণু জল হয় তখন দুই 'অ' পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকে দুই 'হ' এর সহিত যুক্ত হয়; 'অ' এর দ্বিমুখিত্ব দুই 'হ' এর দুই এক মুখিত্বের সহিত মিলিত হয়। হাইড্রোজেন অণুতে দুইটী হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পর অব্যবহিত ভাবে যুক্ত থাকে (হ—হ); জলের অণুতে অণুর মধ্যে তিনটি পরমাণু আছে), অর্থাৎ এক অণু জলীয় বাষ্প কোন পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে যে উত্তাপ লাগিবে সমআয়তন জল সেই পরিমাণে উত্তপ্ত করিতে তাহা অপেক্ষা ১০·২ গুণ অধিক উত্তাপের প্রয়োজন। যখন পরমাণুগণ পরস্পর যুক্ত হয়, তখন উত্তাপের আবির্ভাব হয়। আর যখন পরমাণুগণ পরস্পর হইতে বিযুক্ত হয় তখন উত্তাপের তিরোভাব হয়। এক কি তাহার অধিক সংখ্যক পরমাণু যখন অন্য এক কি তাহার অধিক সংখ্যক পরমাণুর সহিত যুক্ত হয়, তখন এক নির্দ্দিষ্ট … উত্তাপ আবির্ভূত হয়; আবার

২। (১) ন্ অ

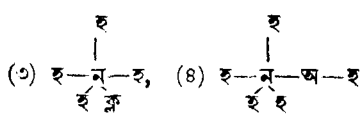

প্রথম বিভাগে যে চারিটী পরমাণু বর্গ দেখা যাইতেছে, তাহা দ্বারা কার্বণের চারিটী যৌগিক বস্তু বুঝান হইতেছে; প্রথমটীর নাম মার্শ গ্যাস (এই গ্যাস 'ডোবা' আয়গায় গাছের পাতা প্রভৃতি পচিয়া উৎপন্ন হয়,) ইহাতে কার্ব্বণের চতুর্মুখিত্ব চার হাইড্রোজেনের চার এক মুখিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে; দ্বিতীয়টীর নাম এথিলীন গ্যাস (আল্‌কোহল নামক মদ হইতে ইহা পাওয়া যায়,) ইহাতে দুই কার্ব্বণ পরমাণুর একের দ্বিমুখিত্ব অপরের দ্বিমুখিত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে, আর উভয়ের অবশিষ্ট দুই দ্বিমুখিত্ব চার হাই-

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

নারীনীতি, শ্রীঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত। আজ কাল অনেকেই আক্ষেপ করিয়া এইরূপ বলিয়া থাকেন যে উচ্চ আদর্শনীয় প্রাচীন বঙ্গ রমণী হইতে, নবীনাগণ ক্রমেই নামিয়া পড়িতেছেন। না ইঁহারা গৃহকার্য্যে সুদক্ষ, রমণীর কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ়, না ইঁহাদের বিদ্যাশিক্ষার দিকে বিশেষ অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। নভেল পড়িয়া, গল্প করিয়া দিন কাটাইতে পারিলে ইঁহারা আর কিছু চাহেন না। এ কথা কতদূর সত্য কে জানে, তবে সম্পূর্ণ সত্য হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলে যদিও এখন বুঝিয়াছেন, রমণীগণ বিদ্যাশিক্ষা পাইতে যদিও আরম্ভ করিয়াছেন,—কিন্তু যে শিক্ষায় এতকাল বঙ্গ রমণী দেশের গৌরব রূপে পূজনীয়া হইয়া আসিতেছিলেন—যে সকল নৈতিক ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহারা অতুলনীয় হৃদয় লাভ করিতেছিলেন—সেই সকল শিক্ষার প্রতি দারুণ অবহেলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফল যদি না ফলে তাহাই ত আশ্চর্য্য।

নারীনীতি রচয়িতা এই অবহেলার অপকারিতা হৃদয়ের সহিত বুঝিয়া ইহার

মরা মনের সহিত তাহা. উপহার দিতেছি। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া যে আমরা কতদূর সুখী হইয়াছি বলিতে পারি না।

যেরূপ ভাব, যেরূপ ব্যবহার, যেরূপ কর্ম্ম রমণীদের পক্ষে শোভন, যাহাতে স্ত্রীলোকদের মনের সৌন্দর্য্য একটুখানিও ফুটিয়া উঠে—তাহাই নারীনীতি বিশেষ রূপে শিক্ষা দিতেছে। এমন কি নারীদের গুরুতর কর্ত্তব্য, সন্তান পালন, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, এই সকল হইতে কাহার সহিত কিরূপ করিয়া কথা কহিলে শোভা পায় তাহা পর্য্যন্ত নারীনীতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে,—এক কথায় যে উৎকৃষ্ট হৃদয়ের জন্য বঙ্গ রমণী পুরাকাল হইতে আদরণীয় সেই

গৌরব তাঁহারা চিরকাল রক্ষা করুন নারী নীতি তাহাই চাহিতেছে।

উপদেশ হইলেই সচরাচর তাহা পড়িতে বিরক্তিকর লাগে, কিন্তু নারীনীতির উপদেশ গুলি অতি সুখপাঠ্য। ইহার ভাষা যেমন সরল, ভাবগুলি কথা গুলি তেমনি হৃদয় স্পর্শ করে। উপদেশ হইতে নিম্নে কয়েকটি এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

৩৩

"গৃহই নারীদিগের রাজ্য। সেখানে তাঁহারা ঈশ্বরীরূপে আপনার শাসন বি-

[illegible]

থাকুন [illegible] গৃহের ঈশ্বরীর কর যোগাইতে হয়। বাহিরে যিনি মন্দ আচরণ করেন গৃহে তাঁহাকে সাধু হইতে হয়। "দরবারের" কত অন্যায় আচরণ অন্তঃপুর হইতে সংশোধিত হইয়া যায়। সমগ্র মনুষ্য জাতি নীতিতন্ত্রের প্রথম আদর্শ গৃহাভ্যন্তরে মাতার ক্রোড় হইতে প্রাপ্ত হয়। পরন্তু এক প্রকার বিবেচনায় নরপতিরাও নরদাস; যেহেতু তাঁহাদিগকে স্বস্ব রাজ্যের লোকগণের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিবিধ উপায়ে যোগাইতে হয়। সেরূপ বিচারে স্ত্রীরাও দাসী, যেহেতু তাঁহাদিগকে আপন আপন পরিবার-স্থিত পুরুষদিগের, স্ত্রীদিগের, ও শিশুদিগের প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য দ্রব্য সকল যোগাইতে হয়।

৩৪

গৃহ রাজ্যেশ্বরীগণ আপনাদের রাজ্যের পরিবারের নিয়ম সকল আপনারা স্থাপন করিবেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে পরিবারস্থ সকলের মতামত গ্রহণ করিবেন; যেহেতু রাজারাও সেরূপ করিয়া থাকেন। রাজাগণ যাহাদিগকে শাসন করেন, তাহাদের বাধ্য হইয়াই তাহাদের শাসন করেন, নতুবা তাহাদের শাসন স্থায়ী হয় না। স্ত্রীরাও তাহাই করিবেন। পরস্পর অবাধ্য হইলে কাহারো সহিত কাহারো কর্ম্ম চলে না।

৩৫

আপনাকে শাসন করিতে না পারিলে অন্যকে শাসন করা যায় না। আপনাকে বশে রাখিতে না পারিলে অন্যকে বশে রাখিবার শক্তি থাকে না। আপনি ভাল না হইলে অন্যকে ভাল করা যায় না। অতএব যদি গৃহিণী এমন ইচ্ছা করেন যে তাঁহার পরিবারস্থ সকলে তাঁহার বশে থাকিবে, তবে তিনি আপনাকে আপনার সৎচিন্তার বশীভূত করুন। সদ্বিবেচনায় সকলের মিল থাকিবে। অসদ্বিবেচনায় কাহারো সহিত কাহারো ঐক্য হয় না। যথেচ্ছাচারীর বশে কেহ থাকিতে পারে না।

৩৬

পৃথিবীতে সুখের বসন্ত সমীরণ চিরদিন

প্রবাহিত হয় না,—বসন্ত অল্পকাল থাকে, পরে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্র, বর্ষার প্রবল ঝঞ্ঝা, শীতের দারুণ পীড়ন সহ্য করিতে হয়। পৃথিবীতে মনুষ্যের এইরূপ সুখ দুঃখের লক্ষণ জানিবে। এখানে যাহার নিকট যে প্রত্যাশা কর তাই যে পাইবে এমন নিশ্চয় নাই। হয় ত তাহার ঠিক বিপরীত ঘটিয়া বসে, এখানে গুরুজনের অনুচিত শাসন, স্বজনের পরভাব, বন্ধুর ঔদাসিন্য বা শত্রুতা, উপকৃত ব্যক্তির কৃতঘ্নতা—এ সকল বিচিত্র নহে। এখানে আপনার কোন ক্লেশ হইবে না, এমন আশা করিয়া থাকা যাইতে পারে না। অতএব ক্লেশ নিবারণের বিবিধ উপায় ও প্রক্রিয়া জানা প্রয়োজনীয়। ক্লেশ নিবারণ করিতে না পারি—অপরাজিত চিত্তে তাহা সহ্য করিব, এইরূপ সহিষ্ণুতা আবশ্যক। তাড়া তাড়ি করিলে অনেক কর্ম্ম সাধনের ব্যাঘাত হয়। সকল বিষয়ের সিদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। যে কিছু বিষয় তোমার ইচ্ছার প্রতিকূল, তাহা তখনি বিদূরিত হইবে,—যে কেহ তোমার বিরুদ্ধ আচরণ করে—অমনি দণ্ড দিতে হইবে, এ প্রবৃত্তি শ্রেয়স্কর নহে। ইহা বুঝিয়া রাখিবে এ সংসার এমন রচিত যে এখানে মিথ্যার ফল হয় না; অত্যাচারীর জয় হয় না; বক্রপথে সিদ্ধি লাভ হয় না। যদি হয়; তাহা কিছু দিনের জন্য এবং অধিকতর শাস্তির জন্য। কালেতে সত্যেরি জয় হয়; সৎ ও সাধুভাবেরি প্রতিষ্ঠা হয়! তুমি দেখ যে ব্যক্তি লোকের অহিতাচারী যে ব্যক্তি বক্রপথগামী, ইহারা কালেতে সংসার-চক্রে আপনারাই গোজা হইয়া পড়িবে। যদি তুমি সেই কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পার তাহাতে তোমারি দোষ। এমন হইলে হয় ত তুমি অপথে পদার্পণ করিবে। কিন্তু এ সকল স্থলে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাতেই প্রচুর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাহারো প্রতি বিদ্রোহাচরণ না করিয়া আপনার অনিষ্ট নিবারণ ও ইষ্ট সাধন চেষ্টা করিবে। তোমার যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রমের উপর বিধাতা যখন যে ফল দিবেন, তাহাই গ্রহণ জন্য আপনার অন্তঃকরণকে প্রস্তুত রাখিবে। যে সংসারে মৃত্যুতে মানব লীলার অবসান সে স্থলে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সূত্রেই যে জীবনের মালা গ্রথিত হইবে ইহাতে সন্দেহ কি।"

উপরের এই কয়টিই আত্ম-সংযম সম্বন্ধে উপদেশ; স্ত্রীলোকের রূপ অলঙ্কার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন—তাহা হইতেও একটি তুলিয়া দিতেছি।

১১৪

স্ত্রীলোকদের অলঙ্কার নানা বিধ। শরী-

রের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উপর স্বাভাবিক অলঙ্কারও আছে। নয়নের বিনম্র দৃষ্টি, হস্ত পদের মৃদু সঞ্চালন, বসনের সম্বরণ, এ গুলির দ্বারা অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য সাধন হয়। বিনয় সংযুক্ত সুস্বর সুমিষ্ট কথায় স্ত্রী প্রকৃতি লোকের দ্বিগুণ প্রিয় বোধ হইয়া থাকে। পুত্তলবৎ যখন তুমি দাঁড়াইয়া থাকিবে তখনি তোমাকে সুন্দর দেখা যাইবে এমন হইলে মানুষের গুণ কি হইল? যখন চাহিবে, কথা কহিবে, চলিবে, কর্ম্ম করিবে, সে সকলেতেও যেন তোমার সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হয়।"

এইরূপ উপদেশ গুলি সকলই সুন্দর সকলেই হৃদয়গ্রাহী, উদ্ধৃত করিতে গেলে আর ফুরায় না। বঙ্গের প্রতি রমণীর হাতে হাতে পুস্তক খানি শোভিত হউক, কেবল তাহাই নহে, সকল রমণীগণের মনে মনে ইহার নীতি গুলি গ্রথিত হউক, নারীনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হউক, এই আমাদের একান্ত অভিলাষ।

প্রকৃতি বিজ্ঞান; মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ শ্রী সূর্য্যকুমার অধিকারী প্রণীত। বঙ্গভাষায় প্রকৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক অতি বিরল। এ সম্বন্ধে অন্য দুই একখানি পুস্তক যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে তাপ,আলোক,তড়িত প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় একেবারেই আলোচনা হয় নাই; সূর্য্যকুমার বাবু তাঁহার পুস্তকে এ সকল কিছুই বাদ দেন নাই। যাহা কিছু প্রকৃতি বিজ্ঞানের অন্তর্গত মোটামুটি তাহার সকলগুলিই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে "জড় ও জড়ের গুণ, বল ও গতির নিয়ম, কঠিন, তরল, বায়বীয় এই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন জড়ের ধর্ম্ম ও কার্য্যাদি, শক্তির সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ, শব্দ, তাপ, আলোক, তাড়িত প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সমূহের স্থূল স্থূল বিবরণ" সন্নিবেশিত হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়গুলির কারণ, ধর্ম্ম, নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করিয়াই লেখক ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টান্তের দ্বারা, স্থানে স্থানে প্রতিকৃতি দ্বারা পুস্তকখানি অতি সুখবোধ্য করিয়াছেন। ইহার ভাষা সুস্পষ্ট, লিখনপ্রণালী সুন্দর, প্রতিকৃতিগুলিও বাছা বাছা। প্রকৃতিবিজ্ঞান-রচয়িতা পুস্তকখানি যে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত লিখিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা অতি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে সে যত্ন ও পরিশ্রম তাঁহার বিফল হয় নাই, পুস্তকখানি অল্পের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। ছাত্রবৃত্তি—ইংরাজি মধ্যবৃত্তি ও নর্ম্মালস্কুলে এই

পুস্তকখানির অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত দেখিতে আমরা ইচ্ছা করি।

তপস্বিনী। মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। ইহাতে সম্পাদকের নাম নাই। বর্ত্তমান বৈশাখ হইতে "শ্রী জীবনচন্দ্র ভক্ত" কর্ত্তৃক চিৎপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের দুই খানি তপস্বিনী আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। দুই সংখ্যাতে পড়িবার মত অনেক গুলি বিষয় আছে। বিশেষ দ্বিতীয় সংখ্যায় ম্যাকবেথের একটি অনুবাদ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। অনুবাদটি করিয়া উঠিতে পারিলে একটি কাজ করা হয়। আষাঢ় মাসের তপস্বিনী এখনও হস্তগত হয় নাই। তপস্বিনীর জীবন যদি এই খানেই শেষ হইয়া থাকে ত বড় দুঃখের বিষয়। তপস্বিনী দীর্ঘায়ু হইয়া অভিলষিত উন্নতি পথে অগ্রসর হউন এই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

বস্তু বিদ্যা। মাসিক পত্রিকা। শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রহায়ণ মাস হইতে ইহা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়া এপর্য্যন্ত মোট দুই খানি বাহির হইয়াছে। দুই খানিই আমরা পাইয়াছি এবং অন্যান্য গুলিও শীঘ্র পাইবার আশা করিতেছি। বস্তু বিদ্যার উদ্দেশ্য বিশেষ প্রশংসনীয়। বস্তুর গুণাগুণ সাধারণে যতই জানিতে পারে ততই ভাল। আজ কাল এ সম্বন্ধে যে অভাব দেখিতে পাওয়া যায় বস্তু বিদ্যা তাহা ঘুচাইতে সক্ষম হইলে বিশেষ উপকার করিবে। সেই জন্য পত্রিকা খানি স্থায়ী দেখিতে আমাদের বিশেষ ইচ্ছা। এই দুই সংখ্যক বস্তু বিদ্যা পড়িতে বেশ লাগিল। তবে একটি কথা, সত্যের সহিত মিথ্যা মিশাইলে বস্তু বিদ্যার মর্য্যাদার হানি হইবে। ইন্দ্রজাল শীর্ষকে বস্তুদিগের যেরূপ গুণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সাধারণের নিকট সত্য বলিয়া মনে হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা, লেখকও যেন সত্য বলিয়াই তাহা বুঝাইতে চাহেন। সম্পাদক ঐদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

উত্তর।

—:০:—

কেহ কতকগুলি প্রশ্ন, মীমাংসার অভিপ্রায়ে, ভারতীর জন্য পাঠাইয়া সেই সঙ্গে জানিতে চাহিয়াছেন, পূর্ব্বে ভারতীতে জিজ্ঞাসা শীর্ষকে যেরূপ প্রশ্ন সন্নিবেশিত করিবার নিয়ম ছিল—এখন তাহা আছে কি না।

এইখানে তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। না, সে নিয়ম একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হয় নাই। তবে প্রশ্ন কারী যেরূপ প্রশ্ন লিখিয়া ভারতীর জন্য পাঠাইয়াছেন, তাহা ভারতীতে স্থান দিয়া মস্তিষ্ক রোগের অপবাদ ঘাড়ে লইতে আমরা প্রস্তুত নহি।

কেহ ভুল নাবুঝেন সেই জন্য পরিশেষে বক্তব্য এই,

যেরূপ প্রশ্নের মীমাংসা যথার্থ প্রার্থনীয়, যাহার মীমাংসায় এক জনেরও একটু জ্ঞানবৃদ্ধি হইবার কথা, সেইরূপ প্রশ্ন ও তাহার উপযুক্ত উত্তর পাইলে আদরের সহিত ভারতীতে গৃহীত হইবে।

—:০:—

সরোজিনী প্রয়াণ।

আবার কেমন হৃদয়ের মধ্যে মেঘ করিয়া আসে—লেখার উপ.র গম্ভীর ছায়া পড়ে,—মনের কথাগুলি শ্রাবণের বারিধারার মত অশ্রুর আকারে ঝরঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে চায়। কিন্তু এ লেখার বাদ্‌লা কাহারো ত ভাল লাগিবে না। আমার মনের মধ্যে যাহাই হউক, আমি নিজের মেঘে পাঠকের সূর্য্যকিরণ রোধ করিয়া রাখিতে চাই না—সুতরাং নিশ্বাস ফেলিয়া আমি সরিয়া পড়িলাম, আর সমস্ত প্রকাশ হউক্! এই জন্যই ত বলি, লেখা ব্যাপারটা বড় সামান্য নয়। জাহাজটা বন্দরে বন্দরে পৌঁছাইয়া দেওয়াই যে নাবিকের একমাত্র কাজ তাহা নহে, পথের মাঝে মাঝে জলের মধ্যে নানা বিঘ্ন শিং তুলিয়া আছে, তাহাদের সকলগুলিকে এড়াইয়া যাওয়া বড় 'সামান্য কারখানা নহে। বলিবার কথা ঢের আছে, আবার না বলিবার কথা ততোধিক—তাহারা আপনাকেই মস্ত করিয়া তুলিবার আশায় হৃদয়ের মাঝে মাঝে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। যেমন করিয়াই চালাইতে চাই, স্রোতের বেগে লেখা তাহাদেরই ঘাড়ে গিয়া পড়ে পাঠকেরা নাবিককে গাল পাড়িতে থাকেন।

জাহাজী তুলনা দিতে গিয়া জাহাজের কথা ফের মনে পড়িল। জাহাজে ত উঠা গেল। আমাদের যাত্রার অভিমুখ দক্ষিণে। শাস্ত্রমতে সকল যাত্রারই মুখ সেই দিকে; কেবল যে পাঠক আমার এই লেখা আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন এবং লেখকের কবিত্ব শক্তি ও রচনা-পারিপাট্যের ভূয়সী প্রশংসা করিবেন—তাঁহার ভাগ্যে এই ঘোরা দাক্ষিণাত্য যাত্রা কিছু রহিয়া-বসিয়া বিলম্বে শেষ হয় যেন, লেখকও স্বয়ং সেই চালে তাঁহার সঙ্গ লইতে প্রস্তুত আছেন। যদিও স্রোত এবং বাতাস প্রতিকূলে ছিল, তথাপি আমাদের এই গজবর উর্দ্ধশুণ্ডে বৃংহিতধ্বনি করিতে করিতে গজেন্দ্রগমনের মনোহারিতা উপেক্ষা করিয়া চত্বারিংশ তুরঙ্গ-বেগে ছুটিতে লাগিল। আমরা ছয়জন এবং জাহাজের বৃদ্ধ কর্ত্তাবাবু এই সাতজনে মিলিয়া জাহাজের কামরার সম্মুখে খানিকটা খোলা জায়গায় কেদারা লইয়া বসিলাম। আমাদের মাথার উপরে কেবল একটি ছাত আছে। সম্মুখ হইতে হু হু করিয়া বাতাস আসিয়া কানের কাছে সোঁ সোঁ করিতে লাগিল, জামার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অকস্মাৎ ফুলাইয়া তুলিয়া ফর্ ফর্ আওয়াজ করিতে লাগিল, কুপরামর্শ দিয়া আমার ভ্রাতৃজায়ার সুদীর্ঘ চুলগুলিকে বারবার অবাধ্যতাচরণে উৎসাহিত করিতে লাগিল। তাহা[illegible]না কি

জাত-সাপিনীর বংশ, এই নিমিত্ত বিদ্রোহী হইয়া বেণী-বন্ধন এড়াইয়া পূজনীয়া ঠাকুরাণীর নাসাবিবর ও মুখরন্ধ্রের মধ্যে পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল; আবার আর কতকগুলি উর্দ্ধমুখ হইয়া আস্ফালন করিতে লাগিল, মাথার উপর রীতিমত নাগলোকের উৎসব পড়িয়া গেল, কেবল বেণী নামক অজগর সাপটা শত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া শত শেলে বিদ্ধ হইয়া শত পাক পাকাইয়া নির্জ্জীব ভাবে খোঁপা আকারে ভক্তিভাগিনীর ঘাড়ের কাছে লুটাইয়া রহিল। আমার দাদার দীর্ঘ আলপাকার জোব্বাটা পরের গলগ্রহ হইয়া থাকা অপমান জ্ঞান করিয়া পতপতঃ শব্দে নিতান্ত পরাধীন চাপকানের প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আকাশে লেজ উড়াইতে লাগিল, ও বাঙ্গালী আর্য্যরক্তবান্ বক্তাদের মত পশ্চাতে থাকিয়া স্বাতন্ত্র্য অভিমানে ভারি ফুলিয়া উঠিল। আমরা সকলেই আপনাপন হৃদয়ের ভার লইয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অবশেষে দাদা মাথাটি কাঁধের দিকে নোয়াইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন, বৌঠাকুরাণীও চুলের দৌরাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া চৌকির উপরে চক্ষু মুদিলেন। জাহাজ অবিশ্রাম চলিতেছে। ঢেউগুলো চারিদিকে লাফাইয়া উঠিতেছে—তাহাদের মধ্যে এক-একটা শুভ্রফণা ধরিয়া হঠাৎ জাহাজের ডেকের উপর যেন ছোবল মারিতে আসিতেছে—শব্দ করিতেছে, পশ্চাতের সঙ্গীদের মাথা তুলিয়া ডাকিতেছে—স্পর্দ্ধা করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া চলিতেছে—মাথার উপরে সূর্য্যকিরণ দীপ্তিমান্ চোখের মত জ্বলিতেছে—নৌকাগুলাকে কাৎ করিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্য উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেছে, একবার এ দেখে একবার ও দেখে, একবার এ ধারে কাৎ হয় একবার ও ধারে কাৎ হয়—মুহূর্ত্তের মধ্যে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিয়া নৌকাটাকে ঝাঁকানী দিয়া আবার কোথায় তাহারা চলিয়া যাইতেছে! আপিসের ছিপ্‌ছিপে পান্সীগুলি পালটুকু ফুলাইয়া আপনার মধুর গতির আনন্দ আপনি যেন উপভোগ করিতে করিতে চলিতেছে, তাহারা মহৎ মাস্তল-কিরীটী জাহাজের গাম্ভীর্য্য উপেক্ষা করে, ষ্টীমারের পিনাক ধ্বনিও মান্য করে না, বরঞ্চ বড় বড় জাহাজের মুখের উপরে পাল দুলাইয়া হাসিয়া রঙ্গ করিয়া চলিয়া যায় জাহাজও তাহাতে বড় অপমান জ্ঞান করে না। কিন্তু গাধাবোটের ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাহাদের নড়িতে তিনঘণ্টা, তাহাদের চেহারাটা নিতান্ত স্থূলবুদ্ধির মত—তাহারা নিজে নড়িতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে জাহাজকে সরিতে বলে—তাহারা গায়ের কাছে আসিয়া পড়িলে সেই স্পর্দ্ধা অসহ্য বোধ হয়। এমনকি একটি গাধাবোট জাহাজের অত্যন্ত কাছে আসিয়াও কোন মতে ধাক্কা এড়াইয়া গেল দেখিয়া আমার সহৃদয় ভ্রাতুষ্পুত্রটি অতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগিল, সে বলিল মজা হইল না। এমন সময়ে শুনা গেল আমাদের জাহাজের কাপ্তেন নাই। জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বরাত্রেই সে গা-ঢাকা দিয়াছে। শুনিয়া আমাদের ভাব ঠাকুরা

ণীর ঘুমের ঘোর একেবারে ছাড়িয়া গেল—তাঁহার সহসা মনে হইল যে, যে-জাহাজের কাপ্তেন নাই সে জাহাজের চলা অপেক্ষা নোঙর করিয়া থাকাই ভাল। দাদা বলিলেন তাহার আবশ্যক নাই, কাপ্তেনের নীচেকার লোকেরা কাপ্তেনের চেয়ে কোন বিষয়ে ন্যূন নহে। কর্ত্তা বাবুরও সেই রূপ মত। বাকী সকলে চুপ করিয়া রহিল কিন্তু তাহাদের মনের ভিতরটা আর কিছুতেই প্রসন্ন হইল না। তবে দেখিলাম নাকি জাহাজটা সত্য সত্যই চলিতেছে, আর, হাঁক-ডাকেও কাপ্তেনের অভাব কিছুমাত্র টের পাওয়া যাইতেছে না, তাই চুপ মারিয়া রহিলাম। হঠাৎ জাহাজের হৃদয়ের ধুক ধুক শব্দ বন্ধ হইয়া গেল—কল চলিতেছে না—নোঙর ফেল নোঙর ফেল বলিয়া শব্দ উঠিল—নোঙর ফেলা হইল। কলের এক জায়গায় কোথায় একটা জোড় খুলিয়া গেছে—সেটা মেরামত করিলে তবে জাহাজ চলিবে। মেরামত আরম্ভ হইল। এখন বেলা সাড়ে দশটা, দেড়টার পূর্ব্বে মেরামৎ সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে! গাছ পালা,ছায়া, কুটীর—নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুইধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাওবা একেবারে নদীর জল পর্য্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে, কতকগুলি সূর্য্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিকমিক করিতেছে আর বাকী কতকগুলি, গাছ পালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে চিকচিক করিয়া উঠিতেছে। একটা বা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে, মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড় আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর এক পাশে বড় বড় গাছের অতি ঘনচ্ছায় র মধ্য দিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঁকা একটা পথের মত জল পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গাঁয়ের মেয়েরা কলসী কাঁকে করিয়া জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙ্গা ঘাটগুলির কি শোভা! নূতন অস্ত ঘাটগুলির যে কোন শোভা নাই তাহা বলিতেছি না। কিন্তু প্রাচীন ভাঙ্গা ঘাটগুলি অনেক দিন একত্রে বাস করাতে চারিদিকের আশপাশের সঙ্গে কেমন ভাব করিয়া লইয়াছে, তাহাদের এক পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছে। মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা এক রকম ভুলিয়া যাইতে হয়, এও যেন গাছপালার মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব সম্পত্তি। ইহার বড় বড় ফাটলের মধ্য দিয়া অশথগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইঁটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে—বহু বৎসরের বর্ষার

জলধারায় গায়ের উপরে শেয়ালা পড়িয়াছে—এবং তাহার রং চারিদিকের শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে। মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রং লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সগর্ব্ব ধবধবে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া, ভাঙ্গাচোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য্য স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকৃতি গৃহস্থ ঘরের শাশুড়ি, তিনি বড় মানুষের ঝিকে ঘরে আনিয়া, তাহাকে নিজের ঘরকন্নার উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। এখন এ পাষাণ ঘাটের মুখেও একটা কেমন কোমল স্নেহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে! গ্রামের যে সকল ছেলেমেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতান আছে—কেহ ইহার নাতনী, কেহ ইহার ভাগ্নে, কেহ ইহার মা মাসী। তাহাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌড়ী রাগিণীতে "গেল গেল দিন" গাহিত ও গাঁয়ের দুই চারি জন লোক আশেপাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনেও নাই। গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কি মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজুটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মত অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। জীর্ণদেহ অতীতের কিয়দংশ যেন বর্ত্তমানের মাঝখানে বসিয়া আছে। তাহার কি গভীর বিষাদপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য! তাহার সেই সন্ধ্যাচ্ছায়াময় বিষাদের, তাহার সেই প্রাচীনতাবেষ্টিত স্বাতন্ত্র্যের কি একটি পবিত্রতা আছে—এই গঙ্গার তীরে শ্মশানের পার্শ্বে তাহার যেমন উপযুক্ত স্থান এমন আর কোথায়! এক এক জায়গায় কতকটা লে.কালয়ের মত—জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙ্গায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে তাহাদের পাঁজ্‌রা দেখা যাইতেছে। কুঁড়ে ঘর গুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি—কোন কোনটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া—দুই চারিটি গরু আপন মনে চরিয়া বেড়াইতেছে—গ্রামের দুই একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্ম্মার মত গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—একটা উলঙ্গছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া বেগুনের ক্ষেতের সমুখে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসাইয়া লাটি-বাঁধা ছোট ছোট জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়ি মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে তাহারা আমাদের প্রতি বড় একটা দৃক্‌পাতও করিল না। সুমুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নীচে হইতে নদীস্রোতে

মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে—ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্ম্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ি তাহার দুই চারিটি হাঁড়িকুড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারি মধ্যে বাস করে। আবার আর-একদিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশ বন—শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যে কারণেই হউক, গঙ্গার ধারের ইঁটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ লাগে—প্রায় তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না—চারিদিক পোড়ো জায়গার মত দেখিতে—এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো—ইতস্ততঃ কতকগুলি ইঁট খসিয়া পড়িয়াছে—অনেকগুলি ঝামা ছড়ান—স্থানে স্থানে মাটি কাটা—এই অনুর্ব্বরতা বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মত দাঁড়াইয়া থাকে। গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে; সমুখে ঘাট, নহবৎখানা হইতে নহবৎ বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট। কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তাল গাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধান'। আরও দক্ষিণে কুমারদের বাড়ি—চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ়া কুটীরের দেয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গন পরিষ্কার তক্‌তক্‌ করিতেছে—কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউ লতাইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে তুলসী-তলা। সূর্য্যাস্তের সময় নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না। এই স্বর্ণচ্ছায়া ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপরে লাবণ্যের মত সন্ধ্যার আভা—সুমধুর বিরাম, নির্ব্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি—সে সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মত, ছায়াপথের পরপারবর্ত্তী সুদূর শান্তি-নিকেতনের একখানি ছবির মত পশ্চিম দিগন্তের ধার-টুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে ওদিকে এক একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিতে থাকে—সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে—পাতা ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ আঘাতে ছল্‌ছল্‌ করিয়া শব্দ উঠিতে থাকে—আর কিছু ভাল দেখা যায় না শোনা যায় না—কেবল ঝিঁঝি পোকার শব্দ—আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে নিবিতে থাকে। আরো রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকার অশথ গাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার, আর উপরে ম্লান চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো অন্ধকার গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া রহিল

তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ও-পারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর খানিকটা আলো পড়িল—সেইটুকু আলোতে ভাল কিছুই দেখা গেল না। কেবল ও-পারের সুদূরতা ও অস্ফুটতাকে মধুর রহস্যময় করিয়া তুলিল—এ-পারে নিদ্রার রাজ্য আর ও-পারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। গভীর রাত্রে ও-পারে অনেক দূরে একখানি নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে দাঁড় টানিতেছে না, একটু একটু দেখা যাইতেছে।

এই যে সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই ইএবারকার ষ্টীমার যাত্রার ফল? তাহা নহে। এ সব কতদিন-কার কত ছবি মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা সব বড় সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারিদিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমনতর শোভা আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না। এখন যাহা-কিছু দেখিব সেইগুলি কেবল মনে করাইয়া দিবে—এখনকার সৌন্দর্য্য সেই সকল স্মৃতির ছায়ায় সুন্দর হইয়া উঠিবে। কিন্তু লিখিতে লিখিতে মনের মধ্যে এক-একবার সংশয় উপস্থিত হইতেছে পাছে এ ছবিগুলি আর কাহারও ভাল না লাগে—এই ভয়ে এই খানেই আত্মসম্বরণ করিলাম।

এমন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি যে পুনশ্চ এই জাহাজটার কল-কারখানার মধ্যে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করিতেছে না। কিন্তু এতদূর আসিয়া জাহাজত ছাড়া যায় না। সুতরাং ফিরিতে হইল। যেরাপৎ শেষ হইয়া গেছে—যাত্রীদের স্নানাহার হইয়াছে, বিস্তর কোলাহল করিয়া নোঙর তোলা হইতেছে। জাহাজ ছাড়া হইল। বামে মুচিখোলার নবাবের প্রকাণ্ড খাঁচা। নবাবের জেনানা, নবাব স্বয়ং, মনুষ্য পশু পক্ষী সকলে মিলিয়া এই একটা খাঁচার মধ্যে সমস্ত দিন কতভাবে কত কিচিমিচি করিতেছে, রুদ্ধদ্বারগুলির বাহির হইতে তাহার শব্দও ভাল শুনা যাইতেছে না। ডান দিকে শিবপুর বটানিকেল গার্ডেন। একপারে রুদ্ধগবাক্ষ দেয়ালের মধ্যে শত শত মনুষ্য-হৃদয়ের আমরণ সমাধি—আর-এক পারে সুশ্যামল বনের মধ্যে হৃদয়ের অবারিত স্বাধীনতা, গঙ্গার দুই পার হইতে দুই জনের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছে। দুই পার্শ্বের নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আমরা, অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত দক্ষিণে যাইতে লাগিলাম, গঙ্গা ততই চওড়া হইতে লাগিল। এদিকে আমরা সকলে মিলিয়া মহানন্দে কাপ্তেনী করিতে আরম্ভ করিলাম। কতকগুলি নিরীহ কাপ্তেনী গৎ শিখিয়া লইয়া গলাভারি করিয়া জাহির করিতে লাগিলাম। কেহ বলিতেছি—কয়লা ভাঙ্গো. কেহ বলিতেছি হাবেষ হাবেষ, কেহ চেঁচাইতেছি দফরা দফরা। নানা-প্রকার গল্পগুজব হাসিতামাসা চলিতে লাগিল। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রটি তাঁহার জ্যেষ্ঠের পিঠের উপর চড়িয়া গলার ভিতর হইতে পাঁচ রকম আওয়াজ বাহির করিতে লাগিল। বেলা দুটো তিনটের সময় নানাবিধ ফলমূল সেবন করিয়া আজ সন্ধ্যা বেলায়

কোথায় গিয়া থামা যাইবে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। আমাদের দক্ষিণে বামে নিশান উড়াইয়া অনেক জাহাজ গেল আসিল—তাহাদের সগর্ব্ব গতি দেখিয়া আমাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল। বাতাস যদিও উল্টা বহিতেছে, কিন্তু স্রোত এখন আমাদের অনুকূল। ভাঁটা পড়িয়াছে, তরঙ্গ অনেক কমিয়া আসিয়াছে—আমাদের উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের বেগও অনেক বাড়িয়াছে। মাঝের এক জায়গায় আসিয়া অত্যন্ত তুফান দেখা দিল। জাহাজ বেশ দুলিতে লাগিল। আমাদের দুইপার্শ্ববর্ত্তিনী তরীতে দুটো একটা ঢেউ উঠিতে লাগিল। আমাদের প্রাণের মধ্যেও দোলা দিতে লাগিল। দূর হইতে দেখিতেছি এক-একটা মস্ত ঢেউ ঘাড় তুলিয়া আসিতেছে, আমরা সকলে আনন্দের সঙ্গে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি—তাহারা জাহাজের পাশে নিষ্ফল রোষে ফেনাইয়া উঠিয়া গর্জ্জন করিয়া জাহাজের লোহার পাঁজরায় সবলে মাথা ঠুকিতেছে, হতাশ্বাস হইয়া দুই পা পিছাইয়া পুনশ্চ আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমরা সকলে মিলিয়া তাহাই দেখিতেছি। হঠাৎ দেখি কর্ত্তাবাবু মুখ বিবর্ণ করিয়া কর্ণধারের কাছে ছুটিয়া যাইতেছেন। হঠাৎ আর্ত্তনাদ উঠিল, এই এই—রাখ্ রাখ্, থাম্ থাম্। গঙ্গার তরঙ্গ অপেক্ষা প্রচণ্ডতর বেগে আমাদের সকলেরই হৃদয় একতালে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখি সম্মুখে আমাদের জাহাজের উপর সবেগে একটা লোহার বয়া আসিতেছে, অর্থাৎ আমরা বয়ার উপরে ছুটিয়া চলিতেছি। কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছি না। তখন যে কে কি করিতেছিল ঠিক ঠাহর হয় না—সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত বয়াটার দিকে চাহিয়া আছি। সে জিনিষটা মহিষের মত ঢুঁ উদ্যত করিয়া আসিতেছে। আর বড় দেরি নাই। আর দুই এক মিনিট বাকী আছে। বয়া আসিয়া ঘা মারিল।

হায়।

রাগিণী ললিত।

তোরা বসে, গাঁথিস মালা,
　তা'রা গলার পরে।
কখন্ যে শুকায়ে যায়
　ফেলে রেখে অনাদরে।

তোরা সুধা করিস্ দান,
তা'রা শুধু করে পান,
সুধায় অরুচি হ'লে
　ফিরেও যে নাহি চায়;

হৃদয়ের পাত্রখানি
ভেঙ্গে দিয়ে চলে যায়।
তোরা শুধু হাসি দিবি,
তারা কেবল ব'সে আছে,
চোখের জল দেখিলে তারা
আর ত রবে না কাছে!

প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে,
প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে
পরাণ ভেঙ্গে মধু দিবি
অশ্রু-ছাঁকা হাসি হেসে,
বুক-ফেটে কথা না ক'য়ে
শুকায়ে পড়িবি শেষে।

সংস্কৃত ভাষায় "সংযম" আর ইংরাজী ভাষায় WILL FORCE.

পতঞ্জলির যোগ শাস্ত্রে, সংযম নামক মানস-ক্রিয়াকে সিদ্ধিলাভের উপায় বা মূলতত্ত্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সংযম কি? তাহা উত্তম রূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে, "সংযম" একটী পারিভাষিক শব্দ এবং তাহার অর্থ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,—এই তিন মানসক্রিয়া। প্রথমতঃ ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে ধারণা, ধারণা হইতে ধ্যান অর্থাৎ ধ্যেয়াকার বৃত্তির প্রবাহ,—অনন্তর তাহারই পরিপাকে সমাধি। কোন এক ঈপ্সিত বিষয়ের উপর, উত্তরোত্তর ক্রমে বা পর পর সংলগ্ন ক্রমে, ঐ তিন মানস ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইলে তাহার এমন এক অদ্ভুত অসীম প্রভাব আবির্ভূত হয়—যাহার বর্ণনা বাক্‌পথাতীত। সেই অদ্ভুত প্রভাবের সাহায্যে পূর্ব্বকালের যোগীরা অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করিতেন, এরূপ শুনা যায়; এবং আধুনিক থিয়োসফিষ্ট লোকের মুখেও উইল্ ফোর্স নামক শক্তি বিশেষের অস্তিত্ব থাকার কথাও শুনা যায়। ঐ দুই শক্তির অর্থাৎ যোগীদিগের সংযম শক্তি আর থিয়োসফিষ্টদিগের ইচ্ছাশক্তি, এই দুই শক্তির মধ্যে কোন সমঞ্জস-ভাব আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলাম। ইহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, উক্ত উভয়ের কি প্রভেদ আছে। প্রথমতঃ দেখুন, মহর্ষি পতঞ্জলি কিরূপ ক্রিয়া প্রবাহকে সংযম-সংজ্ঞা দিতেছেন। মহর্ষি পতঞ্জলি স্বকৃত যোগ-দর্শনের বিভূতি পাদের ১ম সূত্রে প্রথমতঃ ধারণা কি, তাহা নির্ণয় করিয়া, পশ্চাৎ ২য় সূত্রে তাহা হইতে ধ্যান প্রবাহ,—এইরূপ উল্লেখ করিয়া, অনন্তর ৩য় সূত্রের দ্বারা তাহারই উৎকর্ষ ভূমিকে সমাধি আখ্যা প্রদান করিয়া, অবশেষে এক বস্তু বিষয়ক উক্তবিধ প্রক্রিয়াত্রয়কে সংযম

শব্দে ব্যবহার করিবার উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম "ধারণা"। রাগদ্বেষাদি শূন্য হইয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মৈত্র্যাদি ভাবনার দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া, যমনিয়মাদিতে সিদ্ধ হইয়া, কোন এক যোগাসন আয়ত্ত করিয়া, প্রাণগতি অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস বশীভূত করিয়া, শীতগ্রীষ্মাদি-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইয়া, কোন এক অনুদ্বেগজনক প্রদেশে, কোন এক যোগাসনে, ঋজুভাবে অর্থাৎ অভুগ্নভাবে উপবেশন কর। অনন্তর ইন্দ্রিয়দিগকে তাহাদের স্ব স্ব বিষয় (রূপাদি) হইতে বা স্ব স্ব গন্তব্য স্থান হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া (টানিয়া আনিয়া বা আকর্ষণ করিয়া) চিত্তের নিকট সমর্পণ কর। অর্থাৎ চিত্তের মধ্যে মিশাইয়া দাও। অনন্তর তাদৃশচিত্তকে হয় নাসাগ্রে, ভ্রূমধ্যে, হৃৎপদ্মমধ্যে, কিংবা নাড়ীচক্র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রদেশে, না হয় ভূত-ভৌতিক, কিংবা কোন সুন্দরতম মূর্ত্তি প্রভৃতি বহির্বস্তুতে ধারণ কর। এরূপ প্রযত্নে ধারণ করিবে যে, চিত্ত যেন তাহা হইতে না প্রচ্যুত হয়। তাহা হইলেই চিত্তকে বাঁধা হইবে, এবং চিত্তকে বাঁধিতে পারিলেই তোমার "ধারণা" নামক যোগাঙ্গটী আয়ত্ত হইবে।

ধারণ করার নাম ধারণা। সেই ধারণা যদি স্থায়ী হয় ত ক্রমে তাহাই তোমার ধ্যান হইয়া দাঁড়াইবে। যথা—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

সেই ধারণীয় পদার্থে যদি প্রত্যয়ের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির একতানতা এক প্রবাহ জন্মে, তাহা হইলে তাহা "ধ্যান" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে বস্তুতে তুমি বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধ-পূর্ব্বক অন্তরিন্দ্রিয় ধারণ করিয়াছ, সেই বস্তুর জ্ঞান যদি তোমার অনন্তরিত ভাবে বা অবিচ্ছেদে অর্থাৎ প্রবাহাকারে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে, তাদৃশ বৃত্তিপ্রবাহ ধ্যান নামে কথিত হয়।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

ক্রমে সেই ধ্যান যখন কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্তুকেই উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিবে, আপনার স্বরূপ অর্থাৎ (আমি ধ্যান করিতেছি ইত্যাদি জ্ঞান) লুপ্ত করিয়া দিবেক, তখন তাহা "সমাধি" আখ্যা প্রাপ্ত হইবে।

ধ্যান গাঢ় হইলেই তাহার পরিপাকদশায় অন্য জ্ঞান থাকা দূরে থাকুক, ধ্যান জ্ঞানও থাকে না। তাহার কারণ এই যে, চিত্ত তখন সম্পূর্ণরূপে ধ্যেয়-বস্তুতে লীন হয়, ধ্যেয়স্বরূপ বা ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং চিত্ত তখন স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থাৎ না থাকার ন্যায় হইয়া যায়। সুতরাং তৎকালে অন্য কোন জ্ঞান থাকে না। তাদৃশ চিত্তাবস্থা উপস্থিত হইলেই সমাধি হইল, স্থির করিবে।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

কোন এক আলম্বনে উক্ত তিন প্রকার মানস-ব্যাপার অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,—এই ত্রিবিধ মানস প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার নাম "সংযম"। সংযম শব্দের উল্লেখ

দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, গ্রন্থকার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই ত্রিবিধ প্রয়োগের কথাই বলিতেছেন।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

উহাকে অর্থাৎ উক্তবিধ সংযমকে জয় অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসাদির ন্যায় স্বাভাবিক বা সম্পূর্ণায়ত্ত করিতে পারিলে তাহা হইতে প্রজ্ঞা নামক উৎকৃষ্ট বুদ্ধির আলোক অর্থাৎ সমধিক নৈর্ম্মল্যজনিত শক্তিবিশেষ প্রাদুর্ভূত হয়।

সংযম, তাহার জয়, এবং তাহা হইতে প্রজ্ঞা নামক জ্ঞানের আলোক,—এই তিন কথার মধ্যে অনেক গুপ্ততথ্য বিদ্যমান আছে। বস্তুতঃ উহার প্রকৃত তথ্য এবং উহার শিক্ষাকৌশল যোগীরাই জানেন অন্য কেহ জানেন না। সুতরাং বিনা উপদেশে উহার যথার্থ স্বরূপ এবং উহার শিক্ষাকৌশল কিরূপ, তাহা জানা যায় না। অনুমান-শক্তির সাহায্যে আমরা হদ্দমুদ্দ এই বলিতে পারি যে, প্রাচীন যোগ-ভাষার "সংযম" আর আধুনিক ইংরাজি ভাষার concentration প্রায় তুল্যানুতুল্য অর্থের দ্যোতক।

কেন? তাহা বিবেচনা কর। অগ্রে ধারণা, পরে ধ্যান, ক্রমে তাহার পরিপাক দশায় তদ্বিষয়ক সমাধি। এই প্রক্রিয়াত্রিতয়ের মূলে উত্তেজক ও বুদ্ধিপরিষ্কারক ইচ্ছা শক্তি বিদ্যমান আছে। যোগীরা শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, ঐ তিন প্রক্রিয়াকে জয় অর্থাৎ স্বাত্মীকৃত করিয়া থাকেন। স্বাত্মীকরণ কি? না উহাকে স্বাভাবিক-কার্য্যের ন্যায় আয়ত্ত করা। মনুষ্যের শ্বাস প্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক বা সাত্মীকৃত,—অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহ করিতে যেমন কোনরূপ প্রযত্ন বা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না,—উল্লিখিত সংযম কার্য্যটী যদি সেইরূপ সাত্মীকৃত হয়,—অর্থাৎ উহাকে যদি শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সহজে ও বিনা ক্লেশে নির্ব্বাহ করা যায়,—তাহা হইলেই জানিবে যে, সংযম জয় হইয়াছে। এতদ্বিধ সংযমজয়ী যোগীদিগের সংকল্প বা ইচ্ছাপ্রয়োগ অমোঘ। তাঁহারা যখন যাহা ইচ্ছা করেন, সঙ্কল্প করেন, সংযম প্রয়োগ করিয়া তাহা তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ করিতে পারেন। "সংযমজয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।" এই চতুর্থ সূত্র দেখিয়া, সংযমের বলে কেবল জ্ঞানবিকাশই হয়, অন্য কিছু হয় না, এরূপ মনে করিও না। ইহার পরের সূত্রগুলি দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে, উহার দ্বারা সকল সঙ্কল্পই সুসিদ্ধ হয়। জ্ঞানবিকাশ হইলে, অর্থাৎ প্রকাশ শক্তি বাড়িলে ক্রিয়াশক্তিও বাড়ে, ইহা অব্যভিচারী নিয়ম। সুতরাং ভূতজয়, প্রকৃতিবশিত্ব, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য,—এ সমস্তই একমাত্র সংযমের প্রভাবে (অজ্ঞাত-শক্তিতেই) সাধিত হইয়া থাকে। কিরূপ সংযমের দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধিত হয়, ও না হয়, তাহা পাতঞ্জলের তৃতীয় পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সমস্তযোগশাস্ত্রের সারসংগ্রহ বা ফলিতার্থ এই যে, সিদ্ধিলাভের প্রতি একমাত্র সংযমই মূল কারণ। সংযমের দ্বারা সমস্ত ইচ্ছাক্রিয়াই

পূর্ণ হয়। সংযমের দ্বারা সিদ্ধ না হয় এমন কার্য্যই নাই। সংযমের মধ্যে যে কত প্রভূত ক্ষমতা লুক্কায়িত আছে, তাহা যোগীরাই জানেন, অন্যে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না। যোগীরা কিরূপে সংযম-বল জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝি না। বুঝিবার চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিব কি না, সন্দেহ। তথাপি আমাদের এবিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য আছে। একজন পুরাতন যোগী বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"পিঙ্গলা কুররঃ সর্পঃ সারঙ্গান্বেষকোবনে।
ইষুকারঃ কুমারী চ ষড়েতে গুরবোমতাঃ ॥"

পিঙ্গলা নামক বেশ্যা, কুরর নামক পক্ষী, অজগর নামক সর্প, মৃগান্বেষী ব্যাধ, শরনির্ম্মাতা শিল্পী, অবিবাহিতা কুলনারী,—এই ছয় ব্যক্তি আমাদের গুরু অর্থাৎ উক্ত ছয় ব্যক্তির নিকট আমরা অনেক গুহ্যতত্ত্ব জানিয়াছি।

মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন "অনারম্ভেঽপি সুখী সর্পবৎ।" (সাঙ্খ্যের ৪ অধ্যায় ১২'সূত্র) অর্থাৎ এমন কতকগুলি সর্প আছে, তাহারা আহারের জন্য কিছু মাত্র আরম্ভ বা উদ্যোগ করে না, অথচ তাহারা ইচ্ছানুরূপ আহারাদি লাভ করে। অতএব এতদ্দৃষ্টান্তে যোগীরাও অনারম্ভপর হইবেন। যোগীদিগের এই সকল কথার ভাবভঙ্গী পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা অজগর সর্পের বহির্নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া তাহাদের অভ্যন্তরের বা অন্তরাত্মার স্তিমিতভাব, দৃঢ়সঙ্কল্প ও দৃঢ়সঙ্কল্পের প্রবল ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহারই অনুকরণে সংযম নামক যোগাঙ্গটী আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

রাজ সাপ-নামক এক প্রকার সর্প আছে। তাহারা ভ্রমণ করিয়া আহার করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ব্বিষ সর্প এবং বৃশ্চিকাদি ক্ষুদ্র জীব তাহাদের মুখ সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজ সাপ তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। এ সম্বন্ধে অজ্ঞ মানবদিগের নিকট এরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে, "উহারা সাপের রাজা, সেই জন্যই উহারা আহারার্থ ভ্রমণ করে না। ক্ষুদ্র সর্প সকল উহাদের ভয়ে আপনা আপনিই আহারীয় হইয়া উহাদের নিকট গমন করে।" কিন্তু সাপুড়েরা বলে, "তাহা নহে। রাজ সাপেরা আহারের পূর্ব্বে কোন এক নিভৃত স্থানে (মনুষ্য শূন্য অথচ সর্পাদি জীব জন্তুর গতিবিধি স্থানে) গিয়া নিঃসাড়ে পড়িয়া থাকে এবং তন্মনা হইয়া বা একমন একচিত্ত হইয়া শীস্ দিতে থাকে। উহাদের সেই শীস্ শব্দের এমন এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, এমন এক আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি আছে, এমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে যে, তৎপ্রভাবে তাহাদের মুখসন্নিধানে আহারোপযুক্ত ক্ষুদ্রজীবদিগকে যাইতে হইবেই হইবে। তাহাদের সেই শীস-শব্দ যতদূর যাইবে,—ততদূরের মধ্যে যে-কোন ক্ষুদ্রসত্ত্ব (বৃশ্চিকাদি)—ক্ষুদ্রজীব থাকিবে—তাহাদের সকলকেই শীস্-শব্দে মোহিত হইয়া, হতজ্ঞান হইয়া, তৎসন্নিধানে যাইতে হইবে। তাহাদের সেই শীস-শব্দের আকর্ষণী শক্তি অতীব অদ্ভুত ও অচিন্ত্য!" এতজ্জাতীয় সর্প এ

দেশে আছে কি না এবং যদি থাকে ত কোন প্রদেশে আছে, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। ইংরাজী ভাষায় এতজ্জাতীয় সর্পকে Rattling Serpant (This word is pronounced from the word Rattle) বলে, এবং এরূপ সর্প নাকি আফ্রিকা দেশে আছে।* আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে অন্য এক প্রকার বৃহৎকায় সর্প আছে, শাস্ত্রীয় ভাষায় তাহাদিগকে অজগর বলে। অপভাষায় তাহাদের কি নাম আছে তাহা জানি না। কেহ কেহ ইহাদিগকেই রাজসাপ কেহ বা বোড়াচিতি ও নাওদোড়া বলিয়া উল্লেখ করেন। যাহাই হউক, এই অজগর সর্পেরাও আহারার্থ উদ্যম করে না। বৃহৎকায়তা নিবন্ধন নড়িতে চড়িতে পারে না বলিয়াই হউক, আর অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হউক, আহারের পূর্ব্বে ইহারা কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলনিস্পন্দভাবে পতিত থাকে। কিছুকাল তদ্রূপ থাকার পর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু সকল তাহাদের সম্মুখে আগত হয়। বনচর মনুষ্যদিগের মধ্যে কিম্বদন্তী আছে যে, উহারা নিঃশ্বাসের দ্বারা আহারীয়-জন্তুদিগকে টানিয়া লয়। বস্তুতঃ তাহা ঠিক্ নিঃশ্বাসের আকর্ষণ না হইলেও পারে। যাহাই হউক, অজগরদিগের তাদৃশ কার্য্যের মূল কারণ কি, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। কিন্তু যোগীরা বোধ হয় উহার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া ছিলেন, এবং জানিতে পারিয়াও ছিলেন। কেন না পাতঞ্জলের চতুর্থ পাদের প্রথম সূত্রে এ সম্বন্ধে অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। সেই আভাসিত ভাবটী স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে "রাজ সাপেরা অথবা অজগর সর্পেরা জন্ম সিদ্ধ সংযমী" এইরূপ বিস্পষ্ট কথায় পরিণত হয়। অর্থাৎ উহারা জন্ম সিদ্ধ সংযমী। উহাদের সেই স্বতঃসিদ্ধ সংযমশক্তির প্রভাব বা ক্ষমতা এত অধিক যে তাহার ইয়ত্তা অবধারণ করা যায় না। উহারা আপন আপন সংযমশক্তির, ইচ্ছাশক্তির, সঙ্কল্পশক্তির বা ধ্যানশক্তির পরিচালন বা প্রয়োগ করিয়াই নিজ নিজ ভক্ষ্য আকর্ষণ করে। ঐ কার্য্য করিবার সময় তাহাদিগকে অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল রুদ্ধ করিতে হয়, সুতরাং আমাদের দৃষ্টিতে উহারা তখন কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দরূপে প্রতীয়মান হয়।

সাপুড়েদিগের "ক্ষুদ্র সর্প সকল রাজসাপের মত শীস্ বা সোঁ সোঁ শব্দ শুনিয়া হতচৈতন্য ও অবশপ্রায় হইয়া তাহাদের নিকট আইসে" এই প্রবাদ বোধ হয় অসত্য নহে। কেন না শীস্ শব্দের বা সোঁ সোঁ ইত্যাকার শব্দের ও অন্যান্য শব্দবিশেষের তাদৃশ বশীকরণ সামর্থ্য (Mesmeric power) থাকা অসম্ভব নহে।

---

* এ দেশে এখন রাজসাপ বলিলে "বোড়াচিতি" বুঝায়। বস্তুতঃ "বোড়াচিতি" রাজসাপ নহে। বোড়াচিতির অন্য এক জাতিকে বরং অজগর বলিলেও বলা যায়। কেহ কেহ সাপিনী সাপকে রাজসাপ বলিয়া উল্লেখ করেন। বোধ হয়, তাহাদের কথাও সত্য নহে। যাহাই হউক, যাহাদের উক্তবিধ ক্ষমতা আছে, আমাদের মতে তাহারাই রাজসাপ।

জীব যে শব্দ শুনিয়া রূপ, বা, রং দেখিয়া, রস বা আস্বাদ গ্রহণ করিয়া, গন্ধ আঘ্রাণ ও স্পর্শ গ্রহণ করিয়া বিবিধ মানস বিকারের বশতাপন্ন হয়, তাহা বোধ হয় কোন ব্যক্তিরই অবিদিত নাই সুতরাং শব্দের, স্পর্শের, রূপের, রসের ও গন্ধের প্রবল প্রভাপান্বিত বশীকরণ সামর্থ্য থাকা বিষয়ে অধিক কথা বলিতে হইবে না। * কেবল মাত্র পুরাতন যোগীরাই যে, রাজসাপের অদ্ভুত আহারচেষ্টা দেখিয়া তাহার তথ্য অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে সংযম শক্তির বা তাহার অতুল্যক্ষমতা জ্ঞাত হইয়া ছিলেন, এরূপ নহে। আমরা শুনিয়াছি,ইয়ুরোপবাসী জনৈক আধুনিক ডাক্তারও অজগর-সর্পের অদ্ভুত আহারচেষ্টা দেখিয়া তাহার তথ্যানুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে তাহা হইতে বশীকরণ বিদ্যা অর্থাৎ (Mesmerism) অথবা এক প্রবল আশ্চর্য্য চেতনাশিল্প আবিষ্কার করিয়াছেন। "মেস্‌মার" নামক জনৈক জর্ম্মাণ পণ্ডিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি একদা পোতারোহণে বিদেশ গমন করি। ছিলাম। জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায় কেবলমাত্র আমিই বিধাতার কৃপায় সে বিপদে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম। জাহাজের ভগ্ন মাস্তুল অবলম্বন করিয়া আমি ধীরে ধীরে তীর প্রাপ্ত হইলাম। উপরে জঙ্গল ও পাহাড়। হিংস্র জন্তুর ভয়ে বৃক্ষারোহণপূর্ব্বক রাত্রিযাপন করিলাম। প্রাতে অবতরণ কালে দেখিলাম, নীচে একটা বৃহৎকায় সর্প মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া আমি ভয়প্রযুক্ত নামিতে সাহস করিলাম না। বেলা অনেক হইল, তথাপি সে সেইরূপেই থাকিল। অনুমান ৪ ঘণ্টা পরে দেখিলাম, আকাশ হইতে ২।৩ টা পক্ষী তাহার মুখনিকটে পতিত হইল। সাপ্ তাহা ভক্ষণ করিল। ক্রমে দুই চারিটী ক্ষুদ্রজন্তুও তাহার মুখের নিকট আসিল। সাপ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল। এতক্ষণের পর সে শরীরসঞ্চালন আরম্ভ করিল, ক্রমে সে অল্পে অল্পে সরিয়া গেল। আকাশের পাখী কেন তাহার মুখে পড়িল ? কি কারণে তাহার মুখনিকটে, দূরের জন্তু আগমন করিল ? ইহা ভাবিতে লাগিলাম। তখন আমার মস্তিষ্ক ভাবিতে ভাবিতে বিকল হইয়াছিল বটে, পরন্তু এখন দেখিতেছি যে, সেই ব্যাপার তাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। তজ্জাতীয়-সর্পদিগের উইলফোর্স অত্যন্ত তীব্র, এবং সেই প্রবল প্রভাপান্বিত ক্ষমতার সাহায্যেই উহারা ঐরূপ করিয়া আহার সংগ্রহ করে।"

মেস্‌মার সাহেব যেমন সাপের আহার চেষ্টা দেখিয়া তাহা হইতে মিস্‌মেরিজম্ আবিষ্কার করিয়া ছিলেন, তদ্রূপ, বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ভারতীয় যোগীরা হয় ত অজগরদিগের আহার ও তাহার মূল তথ্য অনুসন্ধান করিয়া সংযম নামক যোগাঙ্গটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং

* সিদ্ধান্তটি মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে ব্যাস কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে সে সকল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল না।

যোগীদিগের পরিভাষিত "সংযম" আর মেস্মার সাহেবের পরিভাষিত উইল্‌ফোর্স প্রায় তুল্যানুতুল্য অর্থের দ্যোতক বলিয়া প্রতীত হয়।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল।

যে সময়ে কবিকুলরত্ন শেলি, বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, স্কট, ক্যামবেল, সাদে প্রভৃতি মহাত্মাদিগের দ্বারা ইংলণ্ডভূমি উজ্জ্বলতর হইয়াছিল সেই তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে মনুষ্যকুল-কেশরী জনষ্টুয়ার্ট মিল ১৮০৬ খৃঃ-ষ্টাব্দের মে মাসে বিশে তারিখে ভূমিষ্ঠ হয়েন। ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণেতা বিখ্যাত দার্শনিক জেম্‌স্‌মিল ইঁহার পিতা। মিলের অদ্ভুত বিদ্যা উপার্জ্জন হইতে যাহা কিছু ফল উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা ইঁহার পিতার অতুল ধৈর্য্যশালিতা এবং অপরিমেয় অধ্যবসায়ের পরিণাম। মনুষ্যগণ যখন বাল্যাবস্থায় থাকে তখন যে পিতা মাতার সাহায্য তাহাদিগের কি পর্য্যন্ত আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পিতা মাতা হইতেই বালকদিগের হৃদয়, মন, প্রাণ, শরীর যাহা কিছু সকলই গঠিত হয়, অতএব পিতা মাতার চরিত্র এবং শিক্ষা অতি উৎকৃষ্ট থাকাই প্রার্থনীয়, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের বঙ্গদেশে তাদৃশ পিতা মাতার অভাব। ষ্টুয়ার্ট মিল সৌভাগ্যক্রমেই বাঞ্ছনীয় পিতা পাইয়াছিলেন, এবং জগতের বাঞ্ছনীয় ফল উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন।

আজ আমরা তাঁহার সেই অপরিসীম বিদ্যাশিক্ষার বিষয় এই প্রস্তাবে বর্ণনা করিতে যত্নবান হইব, যদি কোন ব্যক্তির পড়িতে আস্থা হয় ত পড়িবেন, নচেৎ কাহাকেও এলেখা পড়িতে অনুরোধ করি না। মিল নিজ-জীবনী লিখিবার প্রারম্ভেই এক-স্থলে বলিয়াছেন যে "The reader whom these things do not interest has only himself to blame if he reads farther, and I do not desire any other indulgence from him, than that of bearing in mind that for him these pages were not written.

মিলের জীবনের আর কিছু পড়িতে ভাল নাও লাগিতে পারে, কিন্তু তাহার অদ্ভুত বিদ্যাশিক্ষার বিষয় পড়িতে মনুষ্য মাত্রেরই কৌতূহল জন্মে ইহা আমার বিশ্বাস। মিল

পিতার নিকট অতি শৈশবকাল হইতেই বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন, এবং তিন বৎসর বয়স হইতেই বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা লাভ করিতে অগ্রসর হয়েন, একস্থলে তিনি বলিতেছেন "আমি যে কত ছেলে বেলায় গ্রীক ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি, তাহা আমার স্মরণ হয় না; তবে শুনিতে পাই যে বাবা আমাকে আমার তিন বৎসর হইতেই গ্রীক ভাষা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।" মিলের পিতা ছোট ছোট টুকরা কাগজে সচরাচর চলিত গ্রীক কথা গুলি লিখিয়া তাঁহাকে অভ্যাস করিতে দিতেন, এবং তিনিও অতিশয় একাগ্রতা ও যত্ন সহকারে সেই গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লইতেন। সর্ব্বপ্রথমে উক্ত ভাষা হইতে ঈসপের গল্প এবং আনাবেসিস নামক এই দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করেন, তৎপরে কিয়দ্দিবসের মধ্যেই ব্যাকরণের কিয়দংশে বিশিষ্টরূপে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার সহিত এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া গ্রীকভাষা পাঠ করিতেন, এবং বুঝিতে না পারিলেই পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেন। যদিও তাঁহার পিতা সেই সময়ে ভারত-ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তত্রাচ তাঁহার পুত্রের পাঠ বলিয়া দিতে অসন্তুষ্ট হইতেন না। এই সময়েই মিল প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। মিলের বয়স যখন চারি-বৎসর তখন মিল ও তাহার পিতা "নিউইংটন" নামক গ্রামে বাস করিতেন, এই স্থানে ইহাঁরা তিন বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। ইতিহাস গ্রন্থপাঠে মিল যাহা কিছু শিক্ষা করিতেন.প্রতিদিন প্রাতঃকালে পিতার সহিত হরিত-প্রান্তর সমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহা তাঁহাকে গল্প করিয়া শুনাইতেন। মিলের জীবনে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহার পিতাই এই সংসাররূপ মরুভূমিতে তাঁহার একমাত্র সঙ্গী, একমাত্র বন্ধু ও একমাত্র হিতৈষী। নিম্নলিখিত গ্রীক ও ইংরাজী পুস্তকগুলি মিল সবে মাত্র সাত বৎসর বয়সের মধ্যেই পড়িয়াছিলেন।

"The whole of Herodotus;

The whole of Xenophon's Cyropoedia and Memorials of Socrates;

Some of the lives of the philosophers by Diogenes Laertius;

Part of Lucian and Isocrates ad demonicum and Ad Nicoclem;

The first six dialogues of Plato."

Robertson's Histories;

Hume's history,

Gibbon's history;

Watson's Philip the second and third;

Hookes History of Rome;

Rollin's ancient History beginning with philip of Macedon,

Langhorne's Translation of Plutarch;

Burnet's History of his own time,

Millar's historical view of the English government.

Mosheim's Ecclesiastical history,

Mc. Crie's life of John Knox;

Sewell and Rutly's histories of the Quakers ;

Beaver's African Memoranda ;

Collin's account of the first settlement of New Sonth Wales.

Arsor's voyages round the World in four volumes, beginning with Drake and ending with Cook and Bouganville,

Robinson Crusoe,

Arabian nights,

Cazotte's Arabian Tales,

Don Quixote,

Miss Edge worth's Popular Tales;

Brooke's' fool of Quality."

উপরোক্ত গ্রন্থ কয়েক খানির মধ্যে দুচারিখানি ব্যতিরেকে এখনকার অক্সফোর্ড কলেজের বি এ পাস করা ছেলেরাও বুঝিতে সঙ্কুচিত হন তা আমাদের ছেলেদের কথা দূরে থাকুক। সবে মাত্র আট বৎসর বয়সেই মিল লাটিন ভাষা শিক্ষা এবং গ্রীক কবিদিগের লেখা পড়িতে আরম্ভ করেন, এই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহার হস্তে অন্য পুত্রদিগের শিক্ষকতার ভারার্পণ করেন এবং তাহাদিগকে এতসুন্দর রূপে শিক্ষা দিতে বলেন, যে, যেন তাহারা কখনো পাঠ দিবার কালে অযথারূপে ভুলিয়া না যায়, তন্নিমিত্ত মিলকে বিশেষ যত্ন সহকারে পড়াইতে হইত। মিল এ সময়ে বহুসংখ্যক ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, বীজগণিত এবং ইউক্লিড্ প্রণীত জ্যামিতি তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষা করেন। আমাদিগের দেশীয় অনেকানেক ষোড়শ বয়স্ক বালকদিগের পক্ষে সমস্ত জ্যামিতি পাঠ করা একটি কঠিন ব্যাপার কিন্তু মিল আট বৎসর বয়সেই এই গ্রন্থখানি চূড়ান্তরূপে পড়িয়াছেন, মিল যে গ্রন্থই পড়িতেন তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। মিলের মত অদ্বিতীয় লোক যে সকলেই হইবে ইহা কিছু সহজ কথা নহে, কিন্তু মিল তাহা মনে করিতেন না। মিল নিজে আপনার বুদ্ধি ও শক্তির বিষয় যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম "What I could do, could *assuredly be done by any boy or* girl of average capacity and healthy phisical constitution

এই সময়ে মিল যে কি পর্য্যন্ত যত্ন সহকারে এবং কত সারগর্ভ ও কঠিন পুস্তক সমূহ পাঠ করেন তাহার বিষয় লিখিতে হইলে প্রবন্ধ এত বিস্তৃত হইয়া পড়ে যে অগত্যা আমরা তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলাম। তবে এই পর্য্যন্ত সংক্ষেপে বলিয়া রাখি যে গ্রীক এবং লাটিন ভাষায় যত কিছু কঠিন এবং দার্শনিক পুস্তক আছে মিল তাহা পড়িতে কিছুই বাকি রাখেন নাই। মিল যখনই কোন কঠিন পুস্তক পাঠ করিতেন, তখনই ইহাকে উপর্য্যুপরি বিশ ত্রিশ বার না পড়িয়া ক্ষান্ত হইতেন না, আমাদের দেশীয় এণ্ট্রেন্স ফেল হতভাগ্যেরা যদি তাঁহাদের দুচারিখানি পুস্তক এই প্রথা অবলম্বনে পাঠ করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে আর পাস হইবার বিষয়ে মস্তকে হাত দিয়া অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে হয় না। মিলের পিতা এরূপ

দার্শনিক ছিলেন বলিয়া, পুত্রকে একজন প্রধান কবি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এই জন্য মিলকে তিনি হোমরের ইলিয়ড্ নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে দেন। মিল পিতার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কবিতা লিখিতে যত্নবান এবং কবিত্বশক্তি না থাকিলেও, চেষ্টা দ্বারা যতদূর লিখিতে পারা যায়, তাহা তিনি লিখিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের কবিকুলগুরু সেক্সপিয়র এবং জোয়ানাবেলি কৃত নাটক পাঠে তাঁহারও নাটক লিখিবার দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মে, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি একেবারেই কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তিনি যাহা কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহাদিগের ভালমন্দের বিষয় নিজেই স্পষ্টতররূপে বুঝিতেন, তজ্জন্য নিজেই একস্থলে বলিয়াছেন "আমার কবিতাগুলি রবিস্ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে"। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গদেশে যে কতকগুলি কষ্টকবি আছেন তাঁহারা যদি আপনাপন ক্ষমতা যথার্থরূপে বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে আমাদিগের দেশের লোকের পক্ষে অনেক মঙ্গল হইত।

মিল চৌদ্দবৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতার ছাত্র ছিলেন, যদিও এই সময়ের পরে তিনি পিতার নিকট হইতে অনেকানেক বিষয় বলিয়া লইতে ত্রুটি করেন নাই, তত্রাচ তাঁহার পিতার নিতান্ত অধীনে থাকিবার তাঁহার আর প্রয়োজন হয় নাই। এখন তিনি নিজেই চূড়ান্ত করিয়া দার্শনিক পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, এবং কিছু কিছু লিখিবারও সূত্রপাত করেন; আবার নিজেই সেগুলিকে অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে যদি কোন বালক সমবয়স্ক বালক হইতে কয়েকখানি পুস্তক অধিক পাঠ করেন, অমনি তাঁহার মন আত্মশ্লাঘায় পূরিয়া উঠে, মিলের পিতা এই বিষয় হইতে মিলকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি মিলকে একজন মানুষের মত মানুষ হইতে গেলে কি প্রকার বিদ্যা উপার্জ্জন করা উচিত ইহারই বিষয় শিক্ষা দিতেন, তন্নিমিত্ত মিল যখনই কোন ব্যক্তিকে আপনার অপেক্ষা অল্পজ্ঞ দেখিতেন, তখনি বুঝিতেন যে সে হতভাগ্য ব্যক্তির মিলের পিতার মত পিতা ছিল না অথবা মিলের মত বিদ্যা শিক্ষার সম্যক সুবিধা হয় নাই। মিল যখনই আপনার বিদ্যার বিষয়ে আলোচনা করিতেন তখনই দেখিতেন যে তাঁহার যতদূর শিক্ষা করা উচিত ছিল ততদূর শিক্ষা করা হয় নাই, এবং তাঁহার সমক্ষে নিজের সহিত তুলনা করিবার লোক তাঁহার অদ্বিতীয় পিতা ব্যতিরেকে আর কেহই ছিলেন না, এই জন্য পিতার সহিত তুলনায় আপনাকে মিল সতত অজ্ঞ ভাবিতেন। ইহা তাঁহার পক্ষে বড় কম সুবিধার হয় নাই। এবং মিলের আরো একটি প্রধান সুবিধা হইয়াছিল, যে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে কদাচ কোন বালকের সহিত অধিক মিশিতে দিতেন না, এই নিমিত্ত মিল বাল্যসুলভ কোন কুকাজে কখনও প্রবৃত্ত হয় নাই; এবং ইহার নিমিত্ত প্রৌঢ় বয়সে পিতাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

মিল কখনও আপনার অপেক্ষা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সহিত তর্ক করিতে বিমুখ হইতেন না, তন্নিমিত্ত ইহাঁর পিতা ইহাঁকে কখনো নিষেধ করেন নাই। আমাদের দেশে যদি কোন পিতা আপনার পুত্রকে অধিক বয়স্ক লোকের সহিত তর্ক করিতে দেখেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কপালে হাত দিয়া ছেলেটির পরিণাম চিন্তা করেন, এবং জ্যেষ্ঠতাত, তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি নানা খেতাব দিয়া সেই স্থান হইতে পুত্রকে বিদায় করেন, তাহার কারণ আমাদের দেশে মিলের মত ছেলেও দেখা যায় না, আর জেম্‌স মিলের মত পিতাও বিরল। মিল দেখিতে বিশেষ বলিষ্ঠ ছিলেন না, তিনি কখনও কুস্তিগিরি করেন নাই, কেবল মাত্র চরিত্র পবিত্র রাখিয়াছিলেন, ও প্রত্যহ যথাসময়ে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ইহাই তাঁহার শরীর পালনের যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছিল।

মিলের পিতা মিলকে শৈশব কাল হইতে কখনও কোন ধর্ম্মবিশেষ অবলম্বন করিবার প্রস্তাব করেন নাই, ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস না থাকাই ইহার কারণ, তিনি বলিতেন জগতের উৎপত্তির যদি কোন কারণ থাকে তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। এরূপ সত্বেও তিনি চিরকালই সত্যের পূজা ও অসত্যের অনাদর করিয়া আসিয়াছেন। নিজ পুত্রকে সততই সত্যবাদী ন্যায়বান্, দৃঢ়ব্রত, জগতের উপকারক, এবং সৎগুণানুসন্ধায়ী হইতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মনুষ্যগণ স্বইচ্ছায় উপরোক্ত গুণগুলির অধিকারী হইতে পারেন, এবং প্রত্যেকেই এই গুণ গুলির অধিকারী হইতে পারিলে পৃথিবীর যথেষ্ট উপকারে আইসে।

এরূপ শিক্ষায় যে প্রকার পরিণাম সম্ভবে তাহাই হইয়াছিল, মিলের অন্যান্য নানা গুণ সত্বেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁহার মনকে স্পর্শ করে নাই। ষ্টুয়ার্ট মিল বলিতেছেন "Who made me ? cannot be answered, because we have no experience or authentic information from which to answer it, and that any answer only throws the difficulty a step further back, since the question immediately presents itself "who made God" ?

(যদিও মিলের মতামত আমরা সমালোচনা করিতেছি না, তথাপি একটি কথা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোন স্রষ্টা ব্যতিরেকে প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে ইহা মিল কল্পনা করিতে পারেন— কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব ধারণা করিবার সময় তাঁহার আর একজন স্রষ্টার আবশ্যক মনে হয়! জড় প্রকৃতি স্বতঃ উৎপন্ন ইহা মনে করিতে গোল বাধে না আর জ্ঞানময় ঈশ্বরকে আদিকারণ স্বয়ম্ভু ভাবিতেই যত সন্দেহ আসিয়া আক্রমণ করে।)

সে যাহা হউক মিল ও তাঁহার পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া, কেহ যেন মনে না করেন যে তাঁহারা সৎ বা উদারস্বভাব বিশিষ্ট লোক ছিলেন না। ষ্টুয়ার্ট মিলের

চরিত্র বিষয়ে লিখিতে হইলে তিনি দেবতাদিগের অপেক্ষাও সচ্চরিত্র এবং ধীশক্তি বিষয়ে অদ্বিতীয় ও ক্ষণজন্মা ছিলেন।

মিল কিম্বা ইহাঁর পিতা উভয়েই চিরকাল ধীশক্তির পূজা করিয়া আসিয়াছেন এবং ধীশক্তির পরিচালনা হইতে যে রূপ বিমল আনন্দ উৎপাদন করা যাইতে পারে, এমন আর কিছুতেই পাওয়া যায় না, ইহা তাঁহাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। প্রগাঢ় চিন্তানিমগ্ন মহর্ষি দার্শনিকগণ যে রূপ উদারতম এবং পবিত্র ও শ্রেষ্ট সুখ লাভ করেন, তাহার সহিত সাধারণ লোকের কর্দ্দমময় পৈশাচিক আনন্দের কি প্রকারে তুলনা হইতে পারে? সে সুখ কেবল মনুষ্যচর্ম্মাবৃত দেবতাদিগেরই ভোগ্য, নচেৎ সে সুখের তুলনা কোথায়?

মিল ষোড়শ বৎসর বয়ক্রম কালে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, এই প্রবন্ধটি পাঠে ইঁহার পিতা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই বয়সে তিনি এবং আর গুটিকত বালকে মিলিয়া একটি সমিতি স্থাপনা করেন। এই সমিতি তিনবৎসর ছয়মাস কাল চলিয়াছিল, ইহাতে অনেক গুলি বালক ইহাঁর শিষ্য হইয়াছিলেন।

পুত্রকে কবি হইতে দেখা ব্যতীত জেম্‌স মিলের আরো একটি সাধ ছিল—সে সাধটি পুত্রকে ব্যারিষ্টর করা; কিন্তু বিধাতা বোধ হয় ইহাঁকে ইহা অপেক্ষা অধিক সুখভোগী করিবেন বলিয়াই ইহাঁর এ বাসনাটীও পূর্ণ করেন নাই।

মিল সপ্তের বৎসর বয়ক্রম কালে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটি কেরানীগিরি কর্ম্ম পান, এবং শীঘ্রই পিতার সাহায্যে ও নিজ বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে উক্ত কোম্পানির সর্ব্বনিম্নপদ হইতে সর্ব্বোচ্চ আসন গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কর্ম্মে প্রবেশ করিয়া মিল বলিতেছেন যে "আমার এই কর্ম্মস্থল বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হইতে বিশ্রাম লইবার প্রধান উপায়-স্থল হইয়াছিল।" ইঁহার এই অপরিসীম কার্য্য শক্তির বিষয় ভাবিয়া দেখিলে কাহার না হৃদয় স্তম্ভিত হয়. নিজের অজ্ঞতা দর্শনে কাহার না মুখ লজ্জায় অবনত হয়?

ইতিমধ্যে পিতৃবন্ধু জেনারেল সার সামুয়েল্ বেস্থামের সহিত ফ্রান্সে এক বৎসর কাল অবস্থান করেন, এবং সুবিধাক্রমে ফরাসী ভাষাজ্ঞ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতেও তাঁর যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। ফরাসী ভাষা হইতে বিস্তর গ্রন্থ পড়িতে সক্ষম হইতেন, এবং উক্ত ভাষা হইতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে উৎকৃষ্ট পুস্তক সমূহ বাছিয়া দিতেন।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে মিলের ষোড়শ বৎসর বয়স হইতেই লিখিবার সূত্রপাত হয়; প্রথমে তিনি "ট্রাভেলর" নামক পত্রিকায় দুইখানি পত্র প্রেরণ করেন, এই পত্র দুইখানি উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সমাদৃত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত তিনি অপরাপর লেখাও প্রকাশ করেন। প্রথম বয়সে মিল আপনার রচনার নিম্নে নিজনাম সাক্ষরিত না করিয়া

"উইকৃলিফ্' এই কল্পিত নামটি সাক্ষর করিতেন। মিলের হৃদয়ে চিরকালই জনসমাজে বিখ্যাতি লাভ করিবার অতিশয় বাসনা ছিল, এবং এই বাসনা পূর্ণ করিতে হইলে যে প্রকার পরিশ্রম ক্ষমতা এবং বুদ্ধিশক্তি থাকা আবশ্যক মিলের তাহা যথেষ্টই ছিল। মিল নিজের ভাষার সৌন্দর্য্য ও সরলতা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত গোল্ডস্মিথ্, ফিল্ডিং, পাস্কাল্, ভল্টেয়র ও কুরিয়ের প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ সমূহ বিশেষ যত্নসহকারে পড়িতেন, তন্মধ্যে গোল্ডস্মিথের "The vicar of Wakefield" নামক গ্রন্থখানি অসংখ্যবার পড়িয়াছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি জর্ম্মণ ভাষা শিক্ষা করিলেন। তিনি এই সময়ে কর্ম্মস্থলে দিবসের অধিকাংশকাল অতিবাহিত করিয়া, নিজবুদ্ধি প্রসূত রচনা সমূহ লিখিতেই বা কখন অবকাশ পাইতেন, আর ইতিমধ্যে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষাই বা কখন করিতেন, ইহাই আশ্চর্য্য। মিল বলিতেছেন "While thus engaged in writing for the public, I did not neglect other modes of self cultivation. It was at this time that I learnt German."

বিদেশীয় ভাষায় শীঘ্র অধিকার লাভ করিতে সার উইলিয়ম্ জোন্সের ন্যায় অদ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ, তথাচ মিলের এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা দর্শনে আমাদের মন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়। যখনই আমরা মিলের রচনা পাঠ করি, ইহাঁর বুদ্ধিশক্তির বিচিত্র অভিব্যক্তি দর্শনে স্তম্ভিত হই এবং ইহার ভাষার সারল্য দর্শনে মুগ্ধ হই, কিন্তু তত্রাচ বক্তৃতা কালে ইহাঁর বাগ্মিতার অভাব হইত, তাহা বলিয়া কেহই ইহাঁর বক্তৃতা শ্রবণে অসন্তুষ্ট হইতেন না, বরং ভাবের প্রগাঢ়তা দর্শনে নিস্তব্ধ হইয়া মনঃসংযোগ পূর্ব্বক সকলেই শ্রবণ করিতেন। ইনি যাহা কিছু বক্তৃতা করিতেন বা রচনা লিখিতেন তাহার অধিকাংশ গুলিই "ওয়েষ্টমিনিষ্টর" এবং "এডিনবরা রিভিউ" নামক এই দুই খানি বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হইত, এবং এই নিমিত্ত উক্ত পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকট হইতে টাকা লইতেন। এতদ্ব্যতিরেকে তিনি সংবাদ পত্রেও তৎকালীন আবশ্যকীয় বিষয় সমূহ লিখিতেন, এবং প্রত্যেক লেখাতেই ইহাঁর বুদ্ধি বৃত্তির ঔদার্য্য ও তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পাইত।

বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এক প্রকার অন্ধকারাবৃত কি-যেন কি-ময় ভাব আসিয়া মিলের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আর তাহার সেই আগেকার মত উৎসাহ নাই, জনসমাজে প্রাধান্য লাভের দারুন আকাঙ্ক্ষা নাই, এখন তিনি অনেকটা উদাস হইয়া পড়িয়াছেন, জীবনের আর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছেন না, কে যেন দূর হইতে তাঁহাকে বলিতেছে, যে, তিনি যাহা কিছু পাইবার নিমিত্ত এ জগতে আশা করিয়া আছেন, যদি সেই মুহূর্ত্তেই তাহা সম্যক্‌রূপে পূর্ণ হয় তাহা হইলেই তিনি কি সুখী হয়েন? মিল এই

কথাগুলি হৃদয়ে আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাহাতেই বা তাঁহার সুখ কি ? তাঁহার হৃদয় অন্ধকারে আবৃত হইল, মন মনের ভিতর বসিয়া গেল, জীবনের একমাত্র উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, যাহা হইতে তিনি পূর্ব্বে সুখী হইবেন ভাবিয়াছিলেন, এখন সেই আকাঙ্ক্ষা কোথায় লুকাইয়া গেল। মরুময় এই জীবনধারণের কি প্রয়োজন তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, কয়েক দিবসের মধ্যেই তাঁহার এইরূপ ঔদাস্যের ভাব মন হইতে বিদূরিত হইবে, দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি আসিতে লাগিল, এমন করিয়া কিছু দিন চলিয়া গেল, তত্রাচ তাহার হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচিল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতরই হইতে লাগিল। জগতে মিল এমন একজনকেও দেখিতে পাইলেন না, যে, যাঁহার নিকট হৃদয় খুলিয়া দুই দণ্ড কথা কহেন, কথা কহিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়েন, এমন কোন বন্ধু নাই যে তাঁহার মনের ভাব বুঝে; তাহাকে ভুলাইয়া রাখে। অবশেষে মিলের একমাত্র বন্ধু পিতার নিকটে মিল হৃদয়ের তৎকালীন অবস্থা খুলিয়া বলিবেন কি না ভাবিতে লাগিলেন, অবশেষে পিতাকে অনর্থক কষ্ট দিবার ভয়ে তিনি তাঁহাকে না বলাই স্থির করিলেন। এখন তিনি আর তাঁহার সেই প্রিয়পুস্তকগুলি সেরূপ উৎসাহ ও যত্নের সহিত পড়িতে পারিতেন না, তবে অদ্ভুত অভ্যাস শক্তির বলে তিনি পুস্তকগুলিকে উল্টাইতেন, কিন্তু আর তাহারা তাঁহাকে আগেকার মত আনন্দ দিত না। এই রূপ অন্ধকারাবৃত ভাব তাহার হৃদয়কে প্রায় এক বৎসরকাল ব্যাপিয়া রাখিয়াছিল। এমন সময়ে একদিন তিনি "মারমণ্টেল্" প্রণীত "মেমোরিস্" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে সহসা একস্থল এমন করুণরসাত্মকভাবে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলেন, যে তিনি আর্ সেই নিদারুণ বৃত্তান্ত পাঠে অশ্রুবারি সংবরণ করিতে পারিলেন না। এতদিন পরে মিলের শুষ্ক অবসন্ন হৃদয়ের ঘনান্ধকার অশ্রুবারিধারায় পরিণত হইল, এখন তিনি আপন হৃদয় দিয়া পরের হৃদয়ের সহিত মমতা করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার মন হইতে নিবিড় কুজ্ঝটিকা সরিয়া যাইতে লাগিল, অমানিশার অবসানে উষার আকাশে প্রভাত তারাটি যেমন হাসিতে হাসিতে উদয় হয়, সেইরূপ তাহার হৃদয়ে আশালোক ধীরে ধীরে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, আবার তিনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার সুখের নিমিত্ত সোনার তারকাপূর্ণ সুনীল আকাশ মাথার উপর বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার নিমিত্ত সূর্য্য উঠে, তাঁহার নিমিত্ত চন্দ্রমা মধুর কিরণ ধারা বর্ষণ করে, কুসুমরাজি কানন সুশোভিত করিয়া হাসিতেছে, এবং মধুর নিনাদিনী নির্ঝরিণী কল্লোলমালায় বহিয়া যাইতেছে। এখন তাঁহার সেই প্রিয়পুস্তকগুলি তাঁহার নিকট প্রিয়তর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এই দুর্লভ মানবজীবনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বাসের সঞ্চার হইতে লাগিল, এখন তিনি আর জড়ের ন্যায় পড়িয়া

রহিলেন না, এখন তিনি বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি কবিগণের লেখাসমূহ পড়িতে লাগিলেন, তন্মধ্যে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতাগুলিই তাঁহার চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইয়াছিল। এইরূপে তিনি সেই মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বাঁচিলেন, এমন যন্ত্রণা ইহজীবনে তাঁহাকে আর কখনও সহ্য করিতে হয় নাই।

এই যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তাঁহার বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন ও আগ্রহ সহকারে তিনি নানাবিধ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

বলিতে গেলে মিলের জীবনে অনর্থক এক দিনও কাটে নাই, এই সামান্য এবং ক্ষুদ্রতম প্রস্তাবে সকল দিনের বিবরণ লিখা অনুকূল নহে এই বিবেচনায় অগত্যা তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলাম। জগদ্বিখ্যাত "লজিক নামক গ্রন্থখানির প্রথম পত্তন মিলের চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই আরম্ভ হয়, পৃথিবীতে এমন কোন দেশই নাই যে স্থলে এই পুস্তকখানি সমাদৃত না হইয়া থাকে, অবশ্য তাহা বলিয়া বানরের গলায় মুক্তার যথার্থ ব্যবহার কোন কালেই হয় না এবিষয় আর কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। এই সময় হইতে মিলের পিতার সহিত মিলের মতের কিছু কিছু অনৈক্য হইতে আরম্ভ হয়, মিল বলিতেছেন যে সকল বিষয় লইয়া তাঁহার পিতার সহিত মতের ঐক্য না হইত সে সকল বিষয়ে পিতার সহিত তিনি তর্ক বিতর্ক করিতে ভালবাসিতেন না; তবে তাহার পিতা তাহার মতের নিতান্ত বিপরীত কোন কথা কহিলে, তিনি অগত্যা তর্ক না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যেমন পিতা তাঁহার সেই রূপই সন্তান হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? বরং না হওয়াই আশ্চর্য্য।

ক্রমশঃ।

নীরব নিশীথে।

১

ঘুমায় নীরব ধরা,
তারকা আকাশ-ভরা,
চৌদিকে বিষম নীরবতা!
সুদূর শ্মশান হ'তে
সমীর আনিছে ব'য়ে
জগতের মরণ-বারতা!

২

পাশরি মায়ার খেলা,
চেতনা জাগিছে প্রাণে,
মহাযোগে যোগী নিমগন ;
অনিমেষ স্থনয়নে,
চাহিয়া গগন পানে,
নিরখেন মহান্ স্বপন।

৩

পবিত্র জাহ্নবী-জল,
নিকম্প পাদপ দল,
যামিনী ফেলিছে মৃদু শ্বাস ;
নীরব নিস্তব্ধ সব,
উঠিছে ঝিল্লীর রব,
প্রাণ যেন উদাস-উদাস !

৪

শ্মশানের মহামায়া,
প্রাণেতে ফেলেছে ছায়া ;
আবরি রেখেছে প্রাণ মোর—
শ্মশানের সেই চিতা
শ্মশানের সেই আলো
বিজন আঁধার অতি ঘোর !

৫

জগৎ দেখিতে কিগো
এসেছি জগতী তলে,
আর কিছু নাই দেখিবার ?
এ ক্ষুদ্র জীবন ল'য়ে
চোলেছি অনন্ত পথে,
পার হোতে মহা পারাবার !

৬

আসিবে কি কোন দিন
ভাঙ্গাতে ঘুমের ঘোর,
চিরকাল রবে কি আঁধার !
এ মায়া কাহার্ মায়া,
বুঝিতে না পারে হিয়া
প্রাণ বলে—"এযে কারাগার" !

তোমাকে।

১

নীরব তটিনী বুকে,
মৃদু বায়ু মন সুখে
ধীরি ধীরি করে বিচরণ ;
চম্পক চামেলি বেলা,
ফুটেছে মালতী মেলা,
সৌরভে পুলকে ত্রিভুবন !

২

ওই বুকে রাখি মাথা,
ওই মুখ পানে চেয়ে,
প্রাণ মোর ঘুমাইতে চায় ;

দূরে দূরে হাসে ফুল,
দূরে দূরে নাচে লতা,
দূরে দূরে পাখী গান গায়।

৩

তটিনী জ্যোৎস্না মাখা,
আকাশ তারকাময়,
দশদিশি হাসিছে কেমন!
এহেন সময় প্রিয়ে
কেন লো কিসের দুখে
ম্লানমুখ, নত দুনয়ন!

৪

অয়ি সোহাগিনী লতা,
কে বল দিয়েছ ব্যথা,
কেন বল এত অভিমান!
সে মধুর হাসিখানি,
দেখাও আমায় রাণি,
কেন হেরি বিরস বয়ান!

৫

আমরা দুটিতে মিলি,
আছি হেথা নিরবিলি,
এস সখি মন কথা কই;
গেছে চলে কত কাল,
আরো বল কত কাল,
দুজনে দুজন মোরা রই!

৬

জগতের প্রান্ত দেশে,
ওই আকাশের শেষে,
যেথায় তারারা চেয়ে আছে;
সুধামুখী মেয়ে গুলি,
কাননে কুসুম তুলি
বেড়ায় মন্দার কাছে কাছে!

৭

ওই দেখ হাত তুলে,
হেসে হেসে দুলে দুলে,
ওই ওরা ডাকিছে তোমায়;
আকাশ খুলেছে দ্বার,
কোন বাধা নাহি আর,
আয় সখি আয় তবে আয়!

উ—

স্ত্রী-আচার।

আজ কাল অনেকেই স্ত্রী আচারের কোন অর্থ দেখিতে পান না; এই অনুষ্ঠান তাঁহারা অর্থশূন্য কুসংস্কার মাত্র বলিয়া হাস্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে যে সকল আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, দেশের অসভ্যতর অবস্থার পরিচয় দেয়—স্ত্রী আচার তাহার মধ্যে একটী; সুতরাং আধুনিক সভ্যতারউন্নতি-সহকারে ইহা অবশ্য পরিত্যজ্য। কিন্তু ইহা বলিবার আগে বাস্তবিক সেই সকল আচারের অর্থ আছে কি না ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়।

প্রথমতঃ—সমাজের উপযোগিতা বু-

থিয়া আচার ব্যবহার সৃষ্টি হয়। সুতরাং সেই আচার ব্যবহারের নূতন সৃষ্টির সময় তাহার যেরূপ প্রয়োজনীয়তা থাকে কালে সমাজের পরিবর্ত্তন সহকারে তাহা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িলে তখন তাহা অর্থ শূন্য বলিয়া মনে হইতে পারে—কিন্তু এইরূপ অর্থাভাব দৃষ্ট হইলেই যে সে রীতি অসভ্য সমাজের এমন অনুমান কিরূপ যুক্তি সঙ্গত? কেন ঠিক কি তাহার বিপরীত হইতে পারে না? যে সকল আচার-অনুষ্ঠান—সমাজের উন্নতির অবস্থার গঠিত, সমাজের অবনতি-অবস্থায় তাহার কিছুই উপযোগিতা থাকেনা, কাজেই তাহা অর্থশূন্য মনে হইতে পারে। সুতরাং কোন রীতির অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হইলেই তাহা অসভ্য সমাজের এরূপ বলা যাইতে পারে না।

সভ্য অসভ্য যে কোন জাতির রীতিই হউক না কেন বহু কারণে কাল সহকারে তাহার অর্থ লোপ পাইতে পারে। এমন কোন বিষয় যাহার উর্দ্ধে আমার জ্ঞান উঠিতে পারে না তাহাত অর্থ হীন মনে হইবেই—একজন অন্ধ যদি চন্দ্র সূর্য্যের অস্তিত্ব ধারণা করিতে না পারে তাই বলিয়া কি বাস্তবিক চন্দ্র সূর্য্যের অস্তিত্ব থাকিবে না?

তাহার পর দ্বিতীয়তঃ— আচার যদি নির্দ্দোষ হয়, তাহাতে যদি সমাজের কোন ক্ষতি না করে, তাহা হইলে সে আচারের অর্থ বোধ গম্য না হইলেও পুরাতন বলিয়া তাহার একটি গৌরব আছে; তাহা অর্থময় না হইলেও ভাবময়। আমি সেই পুরাতন আচারের অতি সূক্ষ্ম-সূত্রে আমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের সহিত গ্রথিত, সেই আচারের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের ধারাবহ স্মৃতি পরম্পরা আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ ঢালিয়া দেয়—এই জন্যই সে আচার অতি আদরে রক্ষণীয়।

আমার কোন বিশেষ বন্ধু যদি একদিন আদর করিয়া একটি সামান্য উপহার দিয়া যান তবে কি তাহা অতি মহামূল্য বস্তু অপেক্ষা আমার নিকট অধিক আদরের হইবে না? সে সামান্য দ্রব্য আমার নিকট অমূল্য ধন,—কেন না—সেই দ্রব্যে আমার বন্ধুর ভালবাসা—তাহার যত্ন, তাহার স্মৃতি সকলি বিজড়িত। যাহাতে প্রাণে এতখানি আনন্দ ঢালিয়া দেয়, যাহার ভিতর আমরা অতীতের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই—কুসংস্কার বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিব? তাহা হইলে কি কুসংস্কার নহে? কি ভ্রান্তি নহে? কে বলিল এ জগৎ আমাদের মনের একটি ভ্রান্তি নহে,—সুতরাং কুসংস্কার নহে? অনেকে ত এরূপ কথাও বলিয়া থাকেন। সেই এক সত্য নিত্য পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ছাড়া ধরিতে গেলে আর সমস্তই ত মায়া। তাহা হইলে ত আমাদের সংসার ত্যাগ করিতে হয়।

সভ্য ইংরাজদিগের ভিতর একটি রীতি দেখা যায়—বিবাহের পর চারিদিক হইতে বরের উপর জুতা বৃষ্টি হইতে থাকে। ইহার যাহা অর্থ পাওয়া যায় তাহাতে বড় একটা সভ্যতার আভাষ দেখা যায় না। অসভ্য অবস্থায় কেহ বাড়ীর কন্যাদিগকে অপরকে

দিতে চাহিত না—যাহারা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারক হইত তাহারাই মাত্র কন্যা পাইত। কিন্তু কন্যাপক্ষীয়েরা শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিয়া কন্যা রাখিতে চেষ্টা করিত—বাড়ীর কন্যা অন্যে লইয়া যাইতে পারিলে তাহারদের দারুন অপমান। ইংলণ্ডে বিবাহের পর বরকে জুতা মারা সেই অসভ্য সময়ের যথার্থ অবস্থার রীতি রক্ষা মাত্র। এই প্রথাতে তাহাদের মান কিছুই নাই—কেন না ইহাতে তাহাদের পূর্ব্ব অসভ্য অবস্থারই পরিচয় দিতেছে;—অথচ ইহা তাঁহারা ত্যাগ করেন না কেন? পুরাতন সম্পত্তির তাঁহাদের নিকট এত গৌরব;—সেই জন্যই তাঁহারা মহা জাতি। তাঁহারা জাতির মান্য জানেন, গুণীর গুণ মর্য্যাদা দিতে জানেন, সেই জন্যই তাঁহারা মহাজাতি। আর আমরা যে তাঁহাদের আদর্শে চলিতে চাই—সে কেবল তাঁহাদের বাহিরের চাকচিক্য অনুকরণ করিতে—যথার্থ গুণের অনুসরণ করিতে নহে;—যত দিন তাহা না পারিব—ততদিন সে অনুকরণে যথার্থ উন্নতি হইবে না। কেহ কেহ বলিবেন;—অতীতের স্মৃতি রাখিবার জন্য অর্থহীন আচার অনুষ্ঠিত হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে উদ্দেশে কোন পুরাতন আচার অনুষ্ঠিত হয় না। কেবল অন্ধভাবেই সে আচারের অনুগামী হওয়া মাত্র সার হইতেছে। আর অন্ধভাবে কোন বিষয়ের অনুগামী হওয়াই কুসংস্কার, ইহাতে মনের স্বাধীনতা স্ফূর্ত্তি পায় না—এইরূপ অনুসরণে উন্নত মানসিক বৃত্তির ক্রমে অবনতিই হইবার কথা।

এ কথা মাননীয় সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহার প্রতিকার ত অতি সহজ। আমাদের পুরাতন আচার ব্যবহারের অর্থ, উদ্দেশ্য যদি আমার একটু বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করি তবে সহজেই ত তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। তবে সেইটুকু শ্রম পর্য্যন্ত যাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না—তাঁহারা কিরূপে তাহার অর্থ পাইবেন। আর তাহা না দেখিয়াই যদি সমস্ত আচার অর্থহীন বলিয়া স্থির করেন—তাহা হইহইলেই বা মনের স্বাধীনতার কি স্ফূর্ত্তি হইল! উহাও কি আর একরূপ কুসংস্কার মাত্র নহে। তাই বলিতেছি কোন বিষয়ের ভাল মন্দ স্থির করিবার পূর্ব্বে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখা উচিত। সেই প্রাচীন উন্নত ভারত যে সকল আচার ব্যবহার নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া না দেখিয়াই তাহাকে হেয় মনে করিলে আমাদেরই মনের অন্ধতা প্রকাশ পাইবে।

এ প্রবন্ধের শীর্ষদেশে যে আচারের কথা বলা গিয়াছে সে আচার যে অর্থহীন নহে বরং তাহা যে বহু জ্ঞানের ফল তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

স্ত্রী-আচার কি? কন্যাগৃহে বর আসিলে বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে বর কন্যাকে লইয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক যে আচার অনুষ্ঠিত হয়—তাহাকেই বিশেষ রূপে স্ত্রী আচার বলে। ইহা বিবাহের একটি অঙ্গ। স্ত্রী

আচারে চারিটি বিশেষ অনুষ্ঠান দেখা যায়—প্রথম-বরণ, দ্বিতীয় প্রদক্ষিণ, তৃতীয় শুভদৃষ্টি, চতুর্থ মাল্য বদল। ইহার মধ্যে বরণ ও প্রদক্ষিণই স্ত্রী আচারের প্রধান অঙ্গ।

বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার মনে শুভ ইচ্ছার সঞ্চালনা করা—অর্থাৎ বরকন্যাকে মেশমেরাইজ করিয়া লওয়াই এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। মেশমেরিজমের বর্ণনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে—সে বিষয়ে অধিক কিছু বলারও ইহা উপযুক্ত স্থান নহে, তবে এ সম্বন্ধে মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে—যে এক জনের ইচ্ছা শক্তি অন্যের উপর প্রয়োগ করাকেই মেশমেরিজম বলে। সচরাচর দৃষ্টি এবং হস্তচালনা দ্বারাই মেশমেরাইজ করা হইয়া থাকে। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপে প্রথম মেশমার এই ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতা আবিষ্কার করেন—তাঁহার নাম হইতে ইচ্ছাশক্তি সঞ্চালন ক্রিয়াকে মেশমেরিজম বলে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—মেশমেরাইজ করিলেই অজ্ঞান হইয়া পড়ে,—তাহা নহে। ঘুম পাড়াইবার ইচ্ছা না করিলে—মেশমেরাইজ দ্বারা কেহ ঘুমাইয়া পড়ে না।

ভাল মন্দ দুই অভিপ্রায়েই ইচ্ছা চালনা করা যায়। শুভ ইচ্ছার দ্বারা বরকন্যাকে পূত করাই স্ত্রী আচারের উদ্দেশ্য।

ইচ্ছা শক্তির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আজ কাল এত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে—যে কেবল অবিশ্বাসের জন্য নহিলে ইহাতে অবিশ্বাস করা যায় না। মানবের ইচ্ছা শক্তি যে বাহ্য জগতের উপর কাজ করিতে পারে—ইহা ইয়োরপও আজকাল বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে, ইয়োরপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা অনেকে মেশমেরিজমকে একটি বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা বলেন উত্তাপ, তাড়িত প্রভৃতি বিজ্ঞানের ন্যায় ইহাও একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান,—অজ্ঞানতাই ইহাকে এতদিন প্রকৃতি ছাড়া অলৌকিক দৈবশক্তি জ্ঞান করিয়া, ইহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিত।* যে বিজ্ঞান এখন ইয়োরপ আবিষ্কার করিতেছে—অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় বহুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ইহা জানিয়াছিল কেবল তাহাই নহে, তাহার জ্ঞান দিয়া সমাজের আচার ব্যবহার পর্য্যন্ত গ্রথিত করিয়াছে।

আমাদের দেশে বিবাহের উৎসব একদিনে শেষ হয় না, বিবাহের দুই এক দিন

* সম্প্রতি ইংলণ্ডে সাইকলজিকেল অর্থাৎ মনস্তত্ব সম্বন্ধীয় একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। মেশমেরিজম, অন্যের চিন্তা পাঠ প্রভৃতি যে সকল ঘটনা মানসিক শক্তির কার্য্য বলিয়া বলা যায়, তাহাদের ভিতর কত দূর সত্য আছে, বিজ্ঞান বলিয়া তাহাদের গ্রহণ করা যায় কি না, তাহাই পরীক্ষা ও অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিতে এই সভা প্রবৃত্ত হইয়াছে। বেলফুর ষ্টুয়ার্ট, ক্রুক্‌শ্ প্রভৃতি ইংলণ্ডের অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ এই সভার সভ্য। ইঁহাদের পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের কিরূপ আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে এবং এসম্বন্ধে ইঁহাদের মত কি, তাহা এই সভার কার্য্য বিবরণ পুস্তক পাঠে জানা যাইবে।

পূর্ব্বে আয়বড়ভাত—বা গায়ে হলুদ, তার পর বিবাহ, বিবাহের পরদিন বাসি বিবাহ, আবার তার পর দিন ফুলশয্যা, তারপর আবার বৌভাত আছে। এই কয়দিনেই বর কন্যাকে বরণ করা হইয়া থাকে। গায়ে হলুদের দিন—বরের বাড়ীতে বরের, কন্যার বাড়ীতে কন্যার বরণ হয়। অন্তঃপুরের একটি বারাণ্ডায় একটি মাটির চতুষ্কোন আল গড়িয়া সেই আল জলপূর্ণ করিয়া সেই আলের চারি কোনে চারিটি কলাগাছ পোতা হয়, এই আলের বাহিরের চারিপাশের স্থানকে কলাতলা বলে। গায়ে হলুদের দিন বর স্নান করিবার সময় বরের বাড়ীতে বরকে এই কলাতলায় নুতন আলপনা পিঁড়াতে দাঁড় করাইয়া বরের মা কি বাড়ীর অন্যকোন সধবা রমণী বরণ করিবার পর সাতজন সধবা মিলিয়া তাহার কপালে—হলুদ ছোঁয়াইয়া দেয়। সেই হলুদ কন্যার জন্য কন্যার বাটীতে আসিলে, তখন কন্যাকে তাহাদের বাড়ীতে আবার সেইরূপ বরণ করিয়া হলুদ মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেয়। বিবাহের দিন, বর, কন্যার গৃহে আসিবার পূর্ব্বে বিকালে কন্যাকে কলাতলায় দাঁড় করাইয়া কন্যার মাতা কি ঠাকুর মা—কি পিতৃস্বসা-কিম্বা অন্য কোন সধবা মহিলা তাহাকে বরণ করেন, বরণের পর গাত্রে জলের ছিটা দিয়া সজ্জিত করিবার জন্য গৃহে লইয়া যান। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার এই বরণের নাম কন্যাস্নান। বোধ হয় পূর্ব্বে এই সময়ে সত্যই কন্যাকে স্নান করান হইত—এখন তাহার পরিবর্ত্তে গাত্রে জলের ছিটা মাত্র দেওয়া হয়। কন্যাকে সজ্জিত করিয়া, যতক্ষণ না বর আসিবে ততক্ষণ একটি নির্জ্জন গৃহে একাকী বসাইয়া রাখিতে হয়।

তাহার পর বর বিবাহ করিতে কন্যাগৃহে আসিলে জামাতারূপে সভায় বরণ পাইবার পর—তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসা হয়। অন্তঃপুরে কলাতলায় যেখানে পূর্ব্বে কন্যার বরণ হইয়া গিয়াছে, সেখানে মঙ্গল ভাঁড়-ধান দূর্ব্বা সজ্জিত বরণ ডালা, শ্রী, জলের ঘটি—প্রভৃতি স্ত্রী আচারের সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত থাকে। বর সেইখানে আসিয়া একখানি আলপনা পিঁড়িতে দাঁড়াইলে তখন বরের বরণ হয়। বরকেও কন্যার মাতা কি ঠাকুর মাতা কি পিতৃ স্বসা—এইরূপ কন্যার একজন বিশেষ আত্মসম্পর্কীয় মহিলা বরণ করেন।

গায়ে হলুদ, বাসি বিবাহ, কিম্বা-অন্নপ্রাশন প্রভৃতি অন্য কোন সংস্কার কার্য্যে স্ত্রীগণ বরণ ইত্যাদি যে সকল অনুষ্ঠান করেন তাহা স্ত্রী আচার নামে উক্ত হয় না এমন নহে, তবে বর আসিবার পর যে বরণ, প্রদক্ষিণ, শুভদৃষ্টি ও মাল্য বদল হইয়া থাকে—তাহাকেই বিশেষরূপে স্ত্রীআচার বলে। এইখানে বরণের একটু বর্ণনা করিয়া মাল্য বদল পর্য্যন্ত কি কি করা হয় দেখা যাউক।

বরণে হাতের নানারূপ চালনা আছে। রমণী সমাজে এই বরণের জন্যই এক একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ। দুই হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলী ও তর্জ্জনীতে ধান দূর্ব্বা ধরিয়া অন্য অঙ্গুলী গুলি প্রসারিত করিতে হয়। সেই প্রসারিত সংলগ্ন হস্ত দুটি [illegible]

পদমূলের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া বরের মস্তকের নিকট তুলিতে হয় তাহার পর সেখান হইতে হাত তুটি আবার ক্রমে তাহার পদমূলে আনিতে হয়। তাহা হইয়া গেলে তখন হাত খুলিয়া হাতের ধান দূর্ব্বা তাহার গাত্রে ফেলিয়া দিতে হয়। মোটা-মুটি ইহাই বরণ—কিন্তু ইহাতে আরো অনেক রকম হাত চালাইবার ভঙ্গী আছে। যাঁহারা মেশামেরাইজ করিতে দেখিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন—বরণও একরূপ মেশমেরাইজ করা ছাড়া আর কিছুই নহে।

ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগে—বরের মন ও কন্যার মনকে একত্র বাঁধা—তাহাদের মন এক হউক্ এই ইচ্ছা করাই বরণের উদ্দেশ্য। স্ত্রী-আচারের সময় কন্যার মাতাই বরণের বিশেষ অধিকারী। কন্যার মঙ্গল কামনা মায়ের মনে স্বতঃ উৎসারিত, এই ইচ্ছা কন্যা জন্ম হইতে মাতার হৃদয়ের শিরায় শিরায় বিজড়িত, সুতরাং বরণ কালে মায়ের মত প্রাণ মন হৃদয়ের সহিত কে আর বর কন্যার শুভ ইচ্ছা করিতে পারে? সেই জন্যই কন্যার মাতা বিশেষরূপে এই সময় বরণের অধিকারী। কোন কারণবশতঃ মাতা না পারিলে ঠাকুরমা পিশিমা ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতি কেহ করিতে পারেন,—কিন্তু বিধবা হইলে কাহাকেই বরণ করিতে নাই।

যিনি বরণ করিবেন—তাঁহার সে দিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয়—এবং বর কন্যাও বিবাহ পর্য্যন্ত উপবাসী থাকা নিয়ম। সকলেই জানেন আহারের পর কোন কাজে যত দূর মনোনিবেশ করা যায় আহারের আগে তাহা অপেক্ষা অধিক মন সংযোগ করা যায়। বিশিষ্টরূপে সংযতমনা হইবার জন্যই বরণকারীর উপবাস আবশ্যক। বর কন্যার উপবাসের কারণ অন্য। যত-ক্ষণ উদর পূর্ণ থাকে ততক্ষণ বাহিরের কোন রূপ ভাল মন্দ শক্তি তাহাকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিতে পারে না—সেই জন্যই কোন কোন ডাক্তারে ম্যালেরিয়া দূষিত প্রদেশে প্রাতঃকালে না খাইয়া বাহিরে গমন করিতে নিষেধ করেন। নিরাহার থাকিলে বর কন্যার উপর ইচ্ছার বল যত অধিক কাজ করিবে--উদর পূর্ণ থাকিলে তাহা হইবার নহে।

ধানদূর্ব্বার বরণ—তিনবার হউক সাত বার হউক হইয়া গেলে তখন অন্য রূপে বরণ করিতে হয়। বরণডালা হইতে মঙ্গল ভাড় লইয়া সেই ভাঁড় বরের পদমূল হইতে ক্রমে মাথার কাছে উঠাইয়া বরের মস্তকে ছোঁয়াইতে হয়। তার পর জল হাতে লইয়া সেই হাত উল্লিখিত রূপে চালনা করিবার পর গাত্রে ছিটা দিতে হয়। জলের পর প্রদীপের বরণ। প্রদীপ-পদমূল হইতে মা-থার কাছে উঠাইয়া তখন বরণকারী তাহার তাপ হাতে ধরিয়া বরের গালে বক্ষে কপালে দিয়া দেন।

উদ্ভিদ, মাটি, জল, উত্তাপ হইতেই সাধারণতঃ লোকে জীবনী শক্তি গ্রহণ করে। ধান দূর্ব্বা, মাটির ভাঁড়—জল ও প্রদীপের তাপ দিয়া বরণ করিবার হয়ত সেই জন্য বিশেষ কোন কারণ আছে। ইহার এমন কোন

রূপ শুভাকর্ষণ থাকিতে পারে, যাহাতে হয়ত এই শুভাকর্ষণ গুণযুক্ত দ্রব্যকে ক্রমে ক্রমে মন্ত্রঃপূত করিয়া তাহা বর কন্যার গাত্র সংস্পর্শ করাইলে বরণকারীর শুভ ইচ্ছা আরো বৃদ্ধি হইয়া বরকন্যার উপর কার্য্য করিতে পারে। পদার্থ বিজ্ঞানের জ্ঞানের জন্য আজ কাল ইয়োরপ মনুষ্য সমাজে প্রধান পদ গ্রহণ করিতেছে কিন্তু এই এক বরণের মধ্যেই প্রাচীন ভারত কতখানি সে জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। বরণের পর প্রদক্ষিণ। বরণ হইয়া গেলে বরকে কলা তলা হইতে সরাইয়া দালানের মধ্যবর্তী একটি প্রশস্ত স্থানে দাঁড় করাইতে হয়। তাহার পর যেদিকে বরের মুখফিরান —সেই দিকের কোন দ্রব্য যাহাতে বর না আর দেখিতে পায় সেই অভিপ্রায়ে দুইজন লোক একখানি পট্টবস্ত্রের দুই প্রান্ত ধরিয়া বরের চোখের সমুখে যবনিকা প্রস্তুত করে। তখন সেই স্ত্রী-আচার স্থলে কন্যা আনীত হয়। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কন্যা পট্টবস্ত্র পরিয়া চন্দনচর্চ্চিত সুসজ্জিত হইয়া মন্ত্রঃপূত প্রাণে একটি নির্জ্জন গৃহে বসিয়াছিল। যাহাতে নির্জ্জন গৃহে এক মনে বসিয়া কন্যা, স্বামীর প্রাণে প্রাণ মিলাইতে সক্ষম হয়, স্বামীকেই একমাত্র প্রভু বিধাতা বলিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্পী হইতে পারে—এই জন্যই বরণের পর কন্যার এই নির্জ্জন বাস সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যে এখনকার মত সাধারণ বাল্য-বিবাহ ছিল না তাহা বিবাহের এই সকল নিয়ম হইতেই বুঝা যাইতেছে।

কন্যা নির্জ্জন স্থান হইতে স্ত্রী-আচার স্থলে আনীত হইয়া এই যবনিকার আড়ালে সপ্ত সধবা মহিলার সহিত বর প্রদক্ষিণ করে। যবনিকার এক পার্শ্বে বর আর অপর পার্শ্বে সপ্ত সধবা মহিলা—কেহ বরণডালা মাথায় করিয়া কেহ জল ছড়াইতে ছড়াইতে কেহ প্রদীপ লইয়া বরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকেন। সপ্ত মহিলাদের একজন কন্যার হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া ঘোরেন। মহিলাগণ বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইবার সময়—বস্ত্র যবনিকাধারী দুই ব্যক্তি—সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলে। সমস্ত প্রদক্ষিণের সময় বর কন্যা সমান যবনিকার আড়ালে থাকেন, কেহ কাহাকেও দেখিতে পান না।

বরণের সময় এখন সাধারণতঃ কন্যাকে পিঁড়ির উপর বসাইয়া এইরূপ প্রদক্ষিণ করান হয়। ইহাকে মেয়েলি ভাষায় সাতপাক বলে। বাল্য বিবাহ প্রথা হইতেই এইরূপ পিঁড়িতে বসাইয়া ঘোরান প্রথা হইয়াছে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে এরূপ হইত না। কন্যা স্বয়ং স্বামী প্রদক্ষিণ করিতেন—রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি যেখানে স্বয়ম্বরার কথা আছে সেই খানেই ইহা দেখা যায়। আর এখনো যেখানে স্ত্রী-আচার আছে অথচ কন্যা নিতান্ত বালিকা নহে, সেখানে বালিকাকে আর পিঁড়ায় করিয়া ঘোরান হয় না।

বরণেরও যে উদ্দেশ্য প্রদক্ষিণেরও সেই উদ্দেশ্য। সপ্ত সধবা সুলক্ষণাক্রান্ত সুশীলা সাধ্বী মহিলা বরকন্যার শুভাকাঙ্ক্ষা

করিয়া বরকে প্রদক্ষিণ করেন। চারিদিক হইতে তাহাদের শুভ ইচ্ছার তরঙ্গ বরের উপর নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। চারিদিক হইতে ইচ্ছার বলপ্রয়োগ করিলে তাহার কিরূপ কার্য্য হয় তাহা টেবিল জাগান ঘটনাহইতে সকলেই বুঝিতে পারেন। সে ইচ্ছার সমষ্টিভূত শক্তিতে জড়ও জাগিয়া উঠে মানুষের কি কথা!

মাতা, ঠাকুরমা প্রভৃতি বরণের বিশেষ যাঁহারা অধিকারিণী তাঁহারা যদি কোন কারণে বরণ করিতে না পারেন তবে অন্য যে সে সধবাই বরণ করিতে পারে না। বরণের জন্য প্রদক্ষিণ করিবার জন্য সচরিত্রা সাধ্বী মহিলাদিগকে বাছিয়া লইতে হয়—এমন কি অসচ্চরিত্র মন্দ স্ত্রীলোকদিগের স্ত্রীআচার দালানে থাকাই নিষেধ। যে হিসাবে শুভ ইচ্ছা চালিত হইতে পারে সেই কারণে অশুভ মন্দ ইচ্ছারত ফল আছে। যদি জ্ঞাত ভাবেও কোন অসচ্চরিত্র স্ত্রী বরকন্যার অশুভ ইচ্ছা না করে, তাহা হইলেও তাহাদের স্বভাবের দূষিত ভাব অজ্ঞাত ভাবে অন্য মহিলাদের শুভ ইচ্ছার ফলকে কতক পরিমাণে বিফল করিতে পারে।

এইরূপ বিশ্বাসকে কেহ কেহ কুসংস্কার মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক পবিত্র ভাবের পবিত্রতা, ও অপবিত্র ভাবের মলিনতা, যে সঙ্গগুণে অদৃশ্য ভাবে ক্রমে আমাদের উপর আসিয়া পড়ে ইহাত আমরা দৈনিক জীবনেই দেখিতে পাই। ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব বিশ্বাস করিলে ইহা ফলদায়ক বিবেচনা করিলে, ভাল মন্দ দুই ইচ্ছারি ফল আছে, এরূপ বিশ্বাস কেনই বা অসঙ্গত হইবে।

প্রদক্ষিণের পর শুভদৃষ্টি। সাতবার প্রদক্ষিণ হইবার পর—কন্যাকে বরের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তখন পট্টবস্ত্রের যবনিকা সরাইয়া, পট্টবস্ত্র খানি বর কন্যার মাথার উপর দিয়া ফেলিয়া দিতে হয়,—তাহাতে বর কন্যার নেত্রপথে বাহিরের আর কিছু পড়িতে পায় না—কিম্বা বাহিরের কেহ বর কন্যাকে দেখিতে পায় না,—এইরূপে শত শত লোক বেষ্টিত হইয়াও বর কন্যার বিজন-শুভদৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রথম বরণ ও প্রদক্ষিণ দ্বারা যখন বর কন্যার হৃদয় মন্ত্রঃপূত হইল,—চারিদিকের শুভ ইচ্ছায় দুই জনের হৃদয় শুভভাবে পূর্ণ হইল—প্রেমের ভাবে উথলিয়া উঠিল—দুই হৃদয় এক করিতে দুজনকে দুজন সুখী করিতে—পরস্পরের প্রেমে বন্দী হইতে দুজনের উৎসুক হৃদি আকুল ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল—তখন শুভদৃষ্টি। শত শত রমণীর আশীর্ব্বাদ মধ্যে, সুমঙ্গল হুলুধ্বনির মধ্যে সেই কবিতাময় শুভলগ্নে—সজন বেষ্টিত অথচ নির্জ্জন কুঞ্জ মধ্যে বর কন্যার শুভদৃষ্টি—তাহাদের চারিচক্ষের মিলন। এই মিলনে এই দর্শনে—জানিনা কোন যুবক যুবতীর হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ—সুখের উচ্ছ্বাস উথলিয়া না উঠে,—নিতান্ত অপ্রেমিক হৃদয়কেও এ সময় কবিতাময় ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেলে।

সেই শুভলগ্নে মন্ত্রঃপূত প্রাণে সেই যে বর, কন্যার মুখখানি কি চোখে দেখিয়া লন,—সেই দেখা, সেই ভাব পরে জীবনের শত সহস্র বিপ্লবেও একেবারে মুছিয়া যাইবার নহে,—নানা অবস্থা চক্রে হৃদয় সে হৃদয় না থাকিলেও অন্ততঃ মনের চক্ষে এক একবার সে ভাব জলন্তভাবে জাগিয়া উঠিতে চাহিবেই চাহিবে;—অন্ততঃ একবারের জন্যও আকুল ভাবে সেই পুরাতন কাল সেই পুরাত ভাবকে পাইতে মন ব্যগ্র হইবে। এরূপ যাহার একেবারে হয় না সে পাষাণ হইতেও পাষাণ, মানুষ হইয়াও পশুর অধম, —তাহার কথা এখানে মনে না করাই ভাল।

সেই শুভলগ্নে কবিতাময় মুহূর্ত্তে বর কন্যা উভয়ে উভয়কে মুগ্ধনেত্রে মুগ্ধ পরাণে দেখিয়া মনে মনে একজন আমার হৃদয়-রাণি বলিয়া অভিবাদন করিলেন,—আর একজন তুমি আমার দেবতা বলিয়া মনে মনে প্রণাম করিলেন—উভয়ের প্রাণে প্রাণে যে কি ভাব বহিয়া গেল কি নীরব কথা চলিতে লাগিল—তাহা সে অবস্থায় যে না পড়িয়াছে তাহার বুঝিবার ক্ষমতা নাই। শুভ দৃষ্টি হইয়া গেল, বর কন্যার হৃদয় সম্পূর্ণ রূপে মিশিয়া এক হইল, তাহার পর ভবিষ্যতে আবার সে হৃদয় স্বতন্ত্র করিতে কে পারে কে জানে!

ইহার পর মাল্য বদল। হৃদয়ে হৃদয়ে বিনিময় হইয়াছে, ইহার বাহিরের প্রকাশ মাল্য বদল। মাল্য বদল হইয়া গেলে তখন বর কন্যা লোক সমাজে উভয়ে উভয়কে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইলেন, তখন জগতের সমক্ষে দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

বিবাহের পর দিন বর কন্যাকে বরের ঘরে আনা হইলে তখন বরের মাতা বর কন্যা দু জনকে একত্রে বরণ করেন। বিবাহের রাত্রে বর কন্যাকে পৃথক পৃথক যেরূপ বরণ করা হইয়াছে বিবাহের পর দিন তাহাদের এক সঙ্গে দাঁড় করাইয়া সেইরূপ জল, প্রদীপ, ধান, দূর্ব্বা মঙ্গলভাঁড় ইত্যাদি সকলরূপ উপকরণ দিয়া দু জনকে একসঙ্গে বরণ করিতে হয়। তাহার পর বৌভাতে ফুলশয্যায় ইহাতেও বরণ আছে। এইরূপে ক্রমাগত শুভ ইচ্ছার চালনা দ্বারা বর কন্যার মনকে এক করা, শুভ আশীর্ব্বাদ দ্বারা উহাদের সুখ কামনা করা হইয়া থাকে।

শুভ ইচ্ছার ফল, আশীর্ব্বাদের ফলের উপর যে আমাদের দেশেরই বিশ্বাস তাহা নহে, সকল দেশেই আশীর্ব্বাদের নিয়ম দেখা যায়। আশীর্ব্বাদ মাতা পিতা প্রভৃতি স্নেহময় হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। কিন্তু আমাদের দেশে এই আশীর্ব্বাদও অধিকতর ফলপ্রদ করিবার ইচ্ছায় এই উচ্ছ্বাস মনের যথা শক্তি বলের সহিত প্রয়োগিত হইয়া থাকে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাই স্ত্রী আচার—ইহার মধ্যে কি কোন অর্থ নাই? ইহার মূল কি আমরা বিজ্ঞানের গভীর প্রদেশে প্রোথিত দেখিতেছি না?

স্ত্রী আচার যে কেবল বিজ্ঞানময় এমনও

নহে, সরস কবিতাময় ভাবে ইহা পূর্ণ। যদি ইহার মূলে কোন রূপ বিজ্ঞান না থাকিত—তাহা হইলেও কেবল ইহার কবিতাময় ভাবে অমর হইয়া ইহা ভারতবাসীদিগের ঘরে ঘরে বিরাজ করিত।

আমিত বলি স্ত্রী আচারই বিবাহের উৎসব। চারিদিকে শত শত সুসজ্জিত সুন্দরী, চারিদিকে হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি—চারিদিকে ফুল চন্দন সুগন্ধির পরিমল—তাহার মধ্যে একটি বালিকার নবপ্রেমে হৃদয় বিনিময়। বিবাহ করিয়া এ, আনন্দ যিনি অনুভব না করিয়াছেন তিনি কৃপা পাত্র অতিদীন। বিবাহ করিয়া তাঁহার শৃঙ্খল পরাই সার।

তখনকার মুনি ঋষিরা যে কেবল বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন এমন নহে—যথার্থ কবিও ছিলেন। বিজ্ঞানের চক্ষে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিতেন, এবং তাহা পারিয়া অন্যকেও সেই সৌন্দর্য্য অনুভব না করাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। সেই জন্যই তখনকার পুস্তক সকল অমন প্রহেলিকাময়,—যে স্থানে গভীর বিজ্ঞান লুক্কায়িত তাহাও কবিতা দ্বারা আবরিত। তাঁহারা জানিতেন সকল বিষয়ের অন্তর নিহিত বিজ্ঞান লোকের দুর্ব্বোধ্য, সেই জন্য সেই বিজ্ঞানকে তাঁহারা কবিতার সাজ পরাইয়া সেই ছবি দেখাইয়া লোককে সুখী করিতে যত্ন করিতেন। যে তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিত সে বিজ্ঞানও বুঝিত, যে না পারিত সে কবিতাটুক লইয়াই সুখী হইত।

তাঁহারা মহানু চেতা—আপনারা যে আনন্দ লাভ করিতেন সে আনন্দের ভাগ অন্যকে না দিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন না।

প্রবন্ধটি শেষ করিবার আগে এইখানে আরো দু একট কথা বলিব।

অনেক কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী মহোদয়গণ আমাদের ভগ্ন সমাজের সংস্কারে আজ কাল যত্নবান হইয়াছেন। কিন্তু কিরূপ করিয়া সংস্কার করা উচিত ইহা লইয়া দুই দল লোকে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এক দল বলেন—যাহা কিছু নূতন মসলা—তাহাই মন্দ, তাহা দিয়া সমাজ সংস্কার অনুচিত—বিদেশীয় ভাষা বিদেশীয় ভাব এমন কি জ্ঞান পর্য্যন্ত বিদেশীদিগের নিকট লইব না।

আর এক দল বলেন যাহা কিছু পুরাতন তাহাই অজ্য, দেশীয় রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, কিছুই তাঁহাদের ভাল লাগে না—সকলি অর্থ শূন্য কুসংস্কার বলিয়া বোধ হয়। আমরা বলি এই প্রান্ত সীমাস্থিত দুই মতের মধ্যস্থানে থাকিয়া চলিতে পারিলেই যথার্থ দেশের উন্নতি হইবে।

বিদ্যা, জ্ঞানের কুল শীল নাই—তাহা সর্ব্বস্থান হইতেই গ্রহণীয়। এমন কি বিদেশীয় কোন রীতিনীতির অনুকরণ মাত্রেই যে সকল অবস্থাতেই কুফল প্রদ তাহাই বা কি রূপে বলা যায়।

যাহা কিছু পাশ্চাত্য তাহা সমস্তই অবহেলা করিলে যেমন উন্নতির আশা নাই, তেমনি রীতিনীতি যাহা কিছু দেশের

এই গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় লিখিত। লেখক ইণ্ডিয়ান মেডিকেল রিকর্ড নামক পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাই পুনঃ মুদ্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। লেখক এই গ্রন্থে তাঁহার পাণ্ডিত্য, আয়ুর্ব্বেদের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ এবং নিজ পরীক্ষা লব্ধ অভিজ্ঞতার বিষয় সংক্ষেপে অথচ বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে প্রকাশিত কোন কোন বিষয়ের স্থূল মর্ম্ম পূর্ব্বে ভিষক্-দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ক্যাম্বেল হস্পিটালের রেসিডেণ্ট মেডিকেল অফিসার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Important Relation of internal secretion of the testicles to vital Resistance or Natural immunity নামক প্রবন্ধটীর অনুবাদ করিয়া ভিষক্ দর্পণে প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। পাঠক মহাশয় তৎপাঠেই বুঝিতে পারিবেন যে, গ্রন্থ কত উৎকৃষ্ট এবং উপকারী।

লেখক পারদের আয়ুর্ব্বেদীয় প্রয়োগরূপ কজ্জলী, স্বর্ণসিন্দূর, মকরধ্বজ প্রভৃতির আময়িক প্রয়োগ বিষয়ক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন—I bring this to the notice of the profession, so that they may publish their unbiassed opinion about their uses.

আমরা গ্রন্থকারের এই উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করি, পারদের আয়ুর্ব্বেদিক প্রয়োগ রূপ—কজ্জলী ও মকরধ্বজ প্রভৃতির যে বহুল প্রয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, অতি প্রাচীনকাল হইতে পারদ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আজিও চিকিৎসক তাহার সকল ক্রিয়ার বিষয় জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই; অথবা কখন পারিবেন কি না, তাহাও বিশেষ সন্দেহ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে মানব সমাজে সভ্যতার সোপান—চিকিৎসা বিজ্ঞানের অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারদ রোগ নাশার্থ প্রয়োজিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু সেদিন মাত্র আমরা তাহার রোগ জীবাণুনাশক শক্তির বিষয় অবগত হইয়াছি, ঐরূপ আরও কত শক্তি পারদে নিহিত আছে, তাহা কে বলিতে পারে?

চিকিৎসকের সহিত প্রকৃতির পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ—জীব মর ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্তু চিকিৎসক তাহাকে প্রকারান্তে অমর করিতে কল্পনা করে—জীবকে রোগ শোক জরাজীর্ণ গ্রস্ত হইতে না দেওয়া স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের গূঢ় উদ্দেশ্য। জীব রোগ শোক জরা জীর্ণগ্রস্ত হইলে তাহা হইতে মুক্ত করা চিকিৎসা বিজ্ঞানের গূঢ় উদ্দেশ্য। কিন্তু জীব জগতে এই উদ্দেশ্য কখন সফল হইবে না; সুতরাং চিকিৎসা বিজ্ঞানও কখন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না। অথচ পূর্ণত্ব প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদিগকে চিরকাল বালকের ন্যায় অধ্যয়নরত এবং অনুসন্ধানপরায়ণ হইয়া থাকিতে হইবে। পরন্তু তাহার ফলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে থাকিবে কিন্তু তাহার কখনও পরিসমাপ্তি হইবে না।

যে স্থলেতারা যাদি বুঝিতে না পারিতেন তাহা তাহার পিতার নিকট বুঝাইয়া লইতেন। তাঁহার পিতার অন্য কোন সন্তানাদি নাথাকাতে তাঁহাদিগকে দূরে যাইতে না দিয়া আপনাদের সহিত এক আশ্রমেই রাখিলেন। কিন্তু বিবাহের কিছু কাল পরেই কনকের যৌবনকাল প্রস্ফুটিত না হইতেই পতির কাল হইল– স্বামী হীনা হইবার অল্প দিন পরেই জনক জননীও ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পিতামাতা লোকান্তর প্রাপ্তির পর তিনি একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে একদা কোন এক সন্ন্যাসীর মঠে উপস্থিত হন। উক্ত মঠের মোহন্ত মহাশয় তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া, "মাতা মাতা বলিয়া ডাকিতেন। তিনি তাঁহার স্নেহে বশীভূত হইয়া নিরুদ্বেগে উক্ত মঠে যাবজ্জীবন বাস করিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন। মনুষ্যের আশা কখনই পূর্ণ হয় না তাহাতে নানা রূপ বিঘ্ন আছেই আছে।

এক দিন মোহন্ত মহাশয় নত মস্তকে বহু প্রলোভন প্রদর্শন ও বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া কনককে বলিলেন তিনি তাহার চরণে জীবন বিকাইয়াছেন। কিন্তু কনককে কিছুতে নোয়াইতে না পারিয়া মোহন্ত মহাশয় অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া আপন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, এই সন্ন্যাসিনীকে যথেষ্ট প্রহার করিয়া উহার ঝুলি ডাণ্ডা কাড়িয়া লইয়া উহাকে এখনি মঠ হইতে তাড়াইয়া দে। শ্রীযুক্তের মুখারবিন্দ হইতে এই নিষ্ঠুর বচন নিঃসৃত হইবামাত্রই কয়েক-জন ভৃত্য ও কয়েক জন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়া, তাঁহার দ্রব্যাদি বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া গভীর অন্ধকার রজনীতে তাঁহাকে মঠ হইতে তাড়াইয়া দেয়। তথা হইতে তিনি নানা স্থানের তীর্থ দর্শন করিয়া একদা পুষ্করের নিকট কোন এক গ্রাম হইতে দূর গ্রামান্তরে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ক্লান্ত হইয়া, এক ক্ষুদ্রারণ্যের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রামান্তে গাঢ় মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা পাঠ করিতে ছিলেন। ঐ সময় তিনজন জটাজূটধারী নাগাসন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু তিনি গীতা পাঠে নিবিষ্ট থাকা প্রযুক্ত তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। উক্ত নাগাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি কর্কশ স্বরে তাঁহাকে কহিল "** বার বিলাসিনি তুই আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছিস্ না * *।" তাহার রূঢ় অশ্রাব্য বাক্য সকল শুনিয়া তিনি বিনয় ও নম্রভাবে তাহাদিগকে অভিবাদন পুরঃস্বর কহিলেন, "আমি অনন্যমনা হইয়া গীতা পাঠে ব্যাপৃত ছিলাম, এজন্য আপনাদিগের আগমন জানিতে পারি নাই। আপনারা আমার পিতা, আমি আপনাদিগের কন্যার স্বরূপ, আপনারা অতিশয় বিজ্ঞ, মহাত্মা, আমি অজ্ঞান বালিকা, আমি অত্যন্ত অনভিজ্ঞতার কার্য্য করিয়াছি, তাহা নিজ মহদ্গুণে ক্ষমা করুন।" ইত্যাদি প্রকারে তিনি তাহাদিগকে বহু স্তুতি মিনতি করিলেও তাহারা তাহাকে ক্ষমা না করিয়া আক্রমণ করিতে

অগ্রসর হইল। ঈশ্বর চিরকালই অসহায়ের সহায় তাঁহার মনে ইহা উদয় হইবামাত্র তিনি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন, এমত সময় দুই জন বলিষ্ঠ যুবা সন্ন্যাসী উচ্চৈঃস্বরে পাপমতি সন্ন্যাসীদিগকে গালি বর্ষণ করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিতে লাগিলেন, তদৃষ্টে নরপিশাচ সন্ন্যাসীত্রয় সন্ন্যাসিনীর হস্ত পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। পরে তিনি মান ও ধর্ম্মরক্ষক মহাত্মাদ্বয়কে প্রণামান্তে বহু স্তুতি করিলেন। শেষে তাঁহারা তাহাকে পুষ্করতীর্থে পৌঁছিয়া দিয়া চলিয়া যান। সেখান হইতে তিনি নেপাল রাজ্যে আসিয়া সঙ্গী গৃহস্থ সন্ন্যাসীদিগের আশ্রয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিতেছেন। এক্ষণ তিনি কাহাকেও বিদ্যাবতী বলিয়া পরিচয় দেন না, প্রতিবাসী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা কেহই তাহাকে বিদ্যাবতী বলিয়া জানেন না।

তাঁহার পরিচয়ের কথা শুনিতে শুনিতে বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন আমরা দুইজনে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া সঙ্গীদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। ঘোর সন্ধ্যার সময় একটী স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি সঙ্গী মহাশয়েরা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিতেছেন, তাহার অনতিদূরে এক পার্শ্বে অপরিচিত আর তিন জন সাধু একটী ধুনী প্রজ্বলিত করিয়া বসিয়া আছেন। অপরিচিত সাধুদিগের সহিত আমাদের পরিচয়াদি হইল, পরে কনক সঙ্গী মহাশয়দিগকে কহিলেন "আপনারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিয়া আসিয়াছেন।" তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহারা কহিলেন, "আমরা ক্ষণকাল হইল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, খরতর সূর্য্যকিরণে চলিতে অক্ষম হইয়া পথিমধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলাম।" এই সকল কথাবার্ত্তার পর সকলে সায়ং কার্য্য শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার নিদ্রার উদ্রেক হয় নাই। অপরদিকে নব পরিচিত সাধু মহাশয়েরা পরস্পর গল্প করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের বিস্ময়জনক গল্প শুনিবার নিমিত্ত আমি তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া বসিলাম। পূর্ব্বে তাঁহারা কি কথা কহিয়াছিলেন তাহা আমি ভালরূপ শুনি নাই। তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধের নিকট যাহা শুনিলাম তাহা আমি লিখিতেছি। যে দিন কানপুর দুর্গের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেব এই বৃদ্ধের হস্তে ধৃত হন সেই দিন নানাসাহেব উক্ত বৃদ্ধ মহাশয়কে ও তাহার সঙ্গীদিগকে দোসালা, হার, ইত্যাদি পুরস্কার দিয়াছিলেন, আর ঐ সময় তাঁহার অধীনে ইংরাজদিগের অনেকগুলি মেম সাহেব ও বালক বালিকা বন্দী ছিল। এক দিবস তিনি কার্য্যান্তরে যাইবার সময় এক জন মুসলমান কর্ম্মচারীর উপর বন্দীদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যান, দুষ্ট মুসলমান সৈনিকেরা ঐ অবসরে তাহারদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া হত্যা করে। ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে হত্যা করিতেছে, এমত সময় তিনি তথায় আসিয়া উপস্থিত হন, তাঁহাকে দেখিবা-

মাত্র তাহারা উক্ত ভয়ঙ্কর পাপ কার্য্য হইতে নিরস্ত হয়। মুসলমান সৈনিকদিগের ঐ ভীষণ পিশাচ কর্ম্ম দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া পুনঃ পুনঃ রামনাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং পরে তিনি ঐ সংবাদ নানা সাহেবের কর্ণগোচর করাইলে তিনি উক্ত সৈনিকদিগকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া সকলকে কহিয়াছিলেন "সম্মুখ সমরে ইংরাজ কুল ধ্বংশ কর।" আর উক্ত বৃদ্ধ মহাশয়কে কহিয়াছিলেন "জীবিত স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে রুদ্ধ কর ও তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার হিন্দু সেনাদিগের উপর দেও, রাজ্যলোভে স্বধর্ম্ম নষ্ট করিওনা।" ইত্যাদি প্রকারে বহু উপদেশ দিলে সৈনিকেরা তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিল।

ইহা শুনিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম শেষে কি হইয়াছিল? তিনি এতদুত্তরে কহিলেন, "গৃহভেদী দুরাত্মাদের দোষে আমরা পরাস্ত হই।" তদন্তর আমি তাঁহাকে কহিলাম নানা সাহেবের স্ত্রীত নেপাল সহরে আছেন শুনিয়াছি, নানা সাহেব এক্ষণ কোথায় আছেন বলিতে পারেন? তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া উত্তর দিলেন "তিনি স্বর্গে ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতেছেন।" ইহা শ্রবণান্তে ক্ষণকাল পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কোন কোন ব্যক্তি যুদ্ধের সময় আপনাদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন দিল্লির বাদসাহা, নাগপুরের রাজা, ঝাঁন্সির রাণীমাতা, বন্নারাও আর দুই চারি জন ছোট ছোট সর্দ্দার ও ধনী পুত্র।" পুনরায় তাঁহাকে কহিলাম, নানা সাহেব অকারণে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন'? ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন হিন্দু বাঙ্গালীদিগকে হত্যা করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিলনা, আমরা জানি বাঙ্গালিরা অতিশয় বুদ্ধিমান, তাঁহারা সাহেবদিগের গুরু। সুমন্ত্রণা দিয়া আমাদিগকে পরাস্ত করিবেন এই ভয়ে তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়াছিলেন। সাহেব দিগের ন্যায় বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী গোলাম দিগের উপর আমরা কোন রূপ অত্যাচার করি নাই।"

অবশেষে আমি তাঁহাকে কহিলাম আপনার পূর্ব্ব পরিচয় সর্ব্বস্থানে দিয়া থাকেন কিনা? তিনি কহিলেন তখনকার ও এক্ষণকার কোন পরিচয়ই আমি কাহারো নিকট দিই না, তবে মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ব পরিচিত দুই এক জনকে দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা এক্ষণে আমাকে চিনিতে পারেনা, দুই একজন সাধুর আমি পরিচিত।' তাহার সহিত ঐ সকল কথাবার্ত্তার পর তাঁহার পার্শ্বস্থিত একজন বৈরাগী সাধু মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল তাঁহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিতেছি। তিনি পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌর নবাব সরকারে কর্ম্মচারী ছিলেন, নবাব সাহেব বন্দী হইলে তিনি নবাবের বেগমের শরীর রক্ষক হইয়া নেপাল রাজ্যে আসিয়াছিলেন, যুদ্ধে জয়ের আশায় নিরাশ হইলে তিনি গৃহস্থাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া

বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তিনি যে সময়ে বৈরাগ্য পথ আশ্রয় করেন ঐ সময়ে নবাব সাহেবের অনেক হিন্দু কর্ম্মচারীরা সন্ন্যাসী, বৈরাগী, উদাসী, যোগী ইত্যাদি ধর্ম্মমার্গ আশ্রয় করেন, মুসলমান কর্ম্মচারীর মধ্যে অনেকে ফকিরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল বাক্যালাপন শুনিতে শুনিতে তৃতীয় প্রহর যামিনী অতিবাহিত হইল, তখন আমি তাঁহাদিগের নিকট হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সঙ্গীদিগের পার্শ্বে আসিয়া অদ্রিগহ্বরে বহ্নি সেবন করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলাম। প্রভাতে পূর্ব্ব নিশির পরিচিত সাধুমহাশয়েরা একদিকে চলিয়া গেলেন, আমরা অপর দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া প্রায় মধ্যাহ্ন সময়ে একটী নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। ঈশ্বরের অসীম রাজ্যে কোন বস্তুরই অভাব নাই, তিনি হিমালয় পর্ব্বতেও মনুষ্যের বাসোপযুক্ত গহ্বর সকল সৃজন করিয়াছেন, আমরা তথায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ঐ দিবস ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবার কাহারো ইচ্ছা হইলনা। এজন্য ঐ স্থানে সকলেই বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। সায়াহ্ন কালের পূর্ব্বে আমি উক্ত নদীতটে বৃহদাকার একখণ্ড প্রস্তরোপরি উপবেশন করিয়া, প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্য শোভা সন্দর্শনে মোহিত হইয়া, একদৃষ্টে সম্মুখস্থ পর্ব্বতোপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অনন্যমনে জগৎপাতা জগদীশ্বরের অনির্ব্বচনীয় সৃজন কৌশল মনে মনে আলোচনা করিতেছি, এমত সময় পশ্চাৎ দিক হইতে নিঃশব্দ পদ সঞ্চালনে কনক আসিয়া আমার উভয় চক্ষু চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার কোমল হস্ত স্পর্শ মাত্রই অনুভবে বুঝিতে পারিয়া আমি তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলাম। তখন তিনি আমার চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া উচ্চ হাস্যে কহিলেন "আপনি কি ঘরে বউ ফেলে এসেছেন তাই একেলা নির্জ্জনে বসিয়া এত চিন্তা করিতেছেন?" তাঁহার বাক্য শুনিয়া আমি মৃদু হাস্যে কহিলাম মূলেই শূন্য তার আর ভাবনা কি। এই বাক্য আমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইবামাত্রই তিনি কহিলেন তবে একটি বিয়ে করবার ভাবনা ভাবছেন, তার আর ভাবনা কি, কালই এতদ্দেশীয় একটি সুন্দরী থাকালি জাতীয় মেয়ের সঙ্গে আপনার বিবাহ দিয়ে দেব।" তাঁহার বাক্য শুনিয়া আমি হাস্য পূর্ব্বক কহিলাম সন্ন্যাসীকে সুন্দরী কন্যা কে দান দিবে? তিনি হাস্য বদনে উত্তর দিলেন "এই উত্তরাখণ্ডেই পূর্ব্বকালে ভগবান মহাদেবকে হিমালয়রাজ পরমা সুন্দরী গৌরী নামক কন্যা দান দিয়াছিলেন তাতো জানেন। এইজন্য কহিতেছি আপনি সুন্দর যুবা পুরুষ আপনাকে কন্যা দান দিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি, আমি কালই ঘটকালি করিব, কিন্তু ঘটকালির বিদায়টা আমাকে কি দিবেন।" তদুত্তরে কহিলাম তোমার নিমিত্ত আমিও একটি সুপাত্র খুঁজিয়া দিব তাহা হইলেই গায়ে গায়ে শোধ যাইবে"। তিনি বলিলেন

বিধবার কি আর বিয়ে হয়!" আমি কহিলাম বিধবার বিবাহ হয় ইহা শাস্ত্র সঙ্গত, বিশেষ সন্ন্যাসিনী দিগের সচরাচর হইয়া থাকে ইহা কি তুমি জাননা? এতদুত্তরে তিনি বলিলেন ব্রহ্মচারীরও বিবাহ হয় ইহাও শাস্ত্র সঙ্গত, বিশেষ লোক নিন্দাও নাই"। অবশেষে আমি তাঁহাকে কহিলাম এ বাদানুবাদে তোমারি জয়, সে যাহা হউক স্ত্রীকে যে বউ বলে একথা তুমি কোথায় শিখিয়াছিলে, সত্য করিয়া আমার নিকট বল দেখি? তিনি বলিলেন "আপনি বুঝি মনে করেন আমি বাঙ্গালা কথা কিছুই জানিনা, সকল কথা মুখে বলিতে পারি আর না পারি দুই চারটা কথা বুঝিতে পারি। তিনি (স্বামী) আমাকে সামান্য সামান্য কতক গুলি কথা ও চারি পাঁচটা গান শিখাইয়াছিলেন, ঐ সকল কথা প্রায় একণে ভুলিয়া গিয়াছি, গান গুলি স্মরণ আছে কিন্তু তাহার অর্থ আমি জানিনা। আপনি যদি কৃপা করিয়া তাহার অর্থ আমাকে বুঝাইয়া দেন তাহা হইলে আমি বড় সুখী হইব, আমি কহিলাম তুমি গাও আমি অর্থ বুঝাইয়া দিব"।

এই বাক্য শুনিয়া তিনি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ।

উদাসীন।

সংস্কার-রহস্য।

ভারতবর্ষবাসী ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির নিমিত্ত কতকগুলি অবশ্য-অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, সে সকল ক্রিয়া অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হইতেছে। ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যগণ মনে করিতেন, যেমন বস্ত্রে ক্ষারসংযোগ, উত্তাপন, ও নির্ব্বেজনাদি করিলে বস্ত্রের সংস্কার হয়, ভগ্নাংশ নূতন করিলে গৃহের সংস্কার হয়, মার্জ্জন করিলে দেহের সংস্কার হয়, তদ্রূপ যাগ হোম প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেও ক্রমে আত্মার সংস্কার সাধিত হয়। সংস্কার ব্যতীত মানবাত্মা পবিত্র হয় না, পারলৌকিক উন্নতির যোগ্যপাত্র হয় না।

পারলৌকিক উন্নতিকারক সংস্কার দ্বিবিধ। বৈদিক ও স্মার্ত্ত। বেদ-প্রধান কালে অর্থাৎ অতি আদিম কালে আর্য্যগণ যেমন বেদোক্ত যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানরূপ সংস্কারক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন, তৎসঙ্গে

কোন পূজাদি কার্য্য করিতেন না। কিছুকাল পরে বেদমর্ম্ম বজায় রাখিয়া স্মৃতিকার ঋষিরা আরও কতকগুলি অধিকার-বোধক ক্রিয়ার উপদেশ করিলেন। সে সকল উপদেশ ক্রমে স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম বা স্মৃত্যুক্ত সংস্কার বলিয়া অভিহিত হইল। গৌতম ঋষি সর্ব্বসমেত চত্বারিংশৎ অর্থাৎ ৪০ চল্লিশটী মাত্র সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে বৈদিক সংস্কারগুলি লোপ পাইয়াছে, স্মার্ত্ত সংস্কারের মধ্যে দশটী মাত্র সংস্কার অদ্যাপি কৃত হইয়া থাকে। বৈদিক সংস্কার ও স্মার্ত্ত সংস্কার একত্রে গণনা করিলে যে চত্বারিংশৎ সংখ্যক হয় তাহার প্রমাণ এই—

"গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণান্নপ্রাশন, চৌলোপনয়নানি। চত্বারি বেদব্রতানি। স্নানং সহচারিনীসংযোগঃ পঞ্চানাং যজ্ঞানামনুষ্ঠানম্। অষ্টকা পার্ব্বণশ্রাদ্ধং শ্রাবণ্যাগ্রহায়ণী চৈত্রী আশ্বযুজীতি সপ্তপাকযজ্ঞসংস্থা। অগ্ন্যাধেয়মগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ চাতুর্ম্মাস্যানি। আগ্রয়ণেষ্টির্নিরূঢ়পশুবন্ধঃ সৌত্রামনীতি সপ্তহবির্যজ্ঞাসংস্থাঃ। অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম-উকৃথ্যঃ ষোড়শী বাজপেয়োঽতিরাত্র আপ্তোর্যাম ইতি সপ্তসোমসংস্থাঃ। ইত্যেতে চত্বারিংশৎ সংস্কারা ইতি। যস্যৈতে চত্বারিংশৎ সংস্কারা অষ্টাবাত্মগুণাশ্চ স ব্রাহ্মণঃ সাযুজ্যমাপ্নোতি ইতি।"

(গৌতমস্মৃতি।)

অর্থ—গর্ভাধান (১), পুংসবন (১), সীমন্তোন্নয়ন (১), জাতকর্ম্ম (১) নামকরণ (১), অন্ন প্রাশন (১), চূড়াকরণ(১), ও উপনয়ন(১) এই সাতটির শেষ চারিটী বেদব্রত অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইবার জন্যই করিতে হয়। অনন্তর সমাবর্ত্তন-স্নান (১) পরে সহচারিণী-সংযোগ অর্থাৎ বিবাহ (১)। বিবাহের পর প্রতিদিন পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান (১) তিনটী অষ্টকাশ্রাদ্ধ (১) পার্ব্বণশ্রাবণী (১) অগ্রহায়ণী (১), চৈত্রী (১) ও আশ্বযুজী (১) নামক পাক যজ্ঞ। অগ্ন্যাধান (১), অগ্নিহোত্র (১) দর্শযাগ (১), পূর্ণ মাস যাগ (১) ও চাতুর্ম্মাস্য যাগ (১) আশ্রয়ণ ইষ্টি (১) পশুবন্ধ (১), সৌত্রামনী (১),। অগ্নিষ্টোম (১), অত্যগ্নিষ্টোম (১), উকৃথ্য (১), ষোড়শী (১), বাজপেয় (১), অতিরাত্র (১), আপ্তোর্যাম (১)। সর্ব্বসমেত ৪০। যে ব্যক্তির এই ৪০ প্রকার সংস্কার ও ৮ প্রকার আত্মগুণ জন্মে, সে ব্যক্তি ইহলোক ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার সমান ও ব্রহ্মলোকবাসী হয়। *

মহর্ষি হারীত বলেন, দ্বিজবর্ণের সংস্কার দুই প্রকার। ব্রাহ্ম ও দৈব। তন্মধ্যে গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কারগুলি যাহা কেবল স্মৃতির অনুমোদিত বা স্মার্ত্ত-সংস্কার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

---

* বিবাহান্তে ১০ দশ সংস্কার আমরা একটী করিয়া বলিব। পঞ্চ যজ্ঞের কথাও বলিব। তিন্‌মাসের তিনটী অষ্টমী তিথিতে মাংসান্ন দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করার বিধান আছে। সেই শ্রাদ্ধের নাম অষ্টকা। শ্রাবণী প্রভৃতি ও শ্রাদ্ধ। অগ্ন্যাধান প্রভৃতি যজ্ঞগুলি আমাদের "ভারতবর্ষীয় যজ্ঞ" প্রস্তাবে দেখিতে পাইবেন। সর্ব্বভূতে দয়া ক্ষমা, ঈর্ষাত্যাগ, শুচিত্ব, অনায়াস, মঙ্গলানুষ্ঠান, কার্পণ্যত্যাগ ও নিস্পৃহ থাকা, এই দশটী আত্মগুণ বলিয়া খ্যাত।

আছে—সেই সকল সংস্কার ব্রহ্মা এবং পাক যজ্ঞ ও হবির্যজ্ঞ প্রভৃতি অর্থাৎ বেদ প্রতিপাদিত সংস্কারগুলি দৈব। ব্রহ্মা সংস্কারে সংস্কৃত হইলে আত্মা ঋষিলোক প্রাপ্ত হয় এবং দৈব সংস্কার উপপন্ন হইলে জীব দেবলোকে গমন করে।

অঙ্গিরা নামক ঋষি, গৌতমোক্ত ৪০ সংস্কারের মধ্যে ২৫ টা সংস্কারের অবশ্যকার্য্যতা দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ সকল সংস্কারের হউক বা না হউক ব্রাহ্মণদিগের ২৫ টা সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; অন্যগুলি হয় ভালই, না হইলেও হানি নাই। যথা—

"গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো বলিরেবচ।
জাতকৃত্যং নামকর্ম্ম নিষ্ক্রমোহন্নাশনং পরম্॥
চৌলকর্ম্মোপনয়নং তদ্ব্রতানাং চতুষ্টয়ম্।
স্নানোদ্বাহৌ চাগ্রহণমষ্টকাশ্চ যথাযথম্॥
শ্রাবণ্যামাশ্বযুজ্যাঞ্চ মার্গশীর্ষাঞ্চ পার্ব্বণম্।
উৎসর্গশ্চাবুপাকর্ম্ম মহাযজ্ঞাশ্চ নিত্যশঃ॥
সংস্কারা নিয়তা হ্যেতে ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
পঞ্চবিংশতিসংস্কারৈঃ সংস্কৃতা যে দ্বিজাতয়ঃ॥
তে পবিত্রাশ্চ যোগ্যাশ্চ শ্রাদ্ধাদিষু সুমন্ত্রিতাঃ॥
অঙ্গিরা স্মৃতি।

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, বিষ্ণুবলি, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন, উদ্বাহ, আগ্রয়ণ, অষ্টকাশ্রাদ্ধ শ্রাবণী আশ্বিনী ও মার্গশীর্ষীতে পার্ব্বণ, উৎসর্গ, উপাকর্ম্ম, (এই দুইটা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে) ও মহাযজ্ঞ। যে দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) এই পঞ্চ বিংশতি সংস্কার ক্রিয়ায় সুসংস্কৃত হয়, সে পবিত্র হয় এবং শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কার্য্যকরণের যোগ্যতা লাভ করে।

আশ্বলায়ন নামক অন্য এক মুনি লিখিত সংস্কার গুলির সংজ্ঞা ও কর্ত্তব্য ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে—

"নৈমিত্তিকাঃ ষোড়শোক্তাঃ সমুদ্বাহাবসানকাঃ।
সপ্তৈবাগ্রয়ণাদ্যাশ্চ সংস্কারা বার্ষিকা মতাঃ॥
মাসিকং পার্ব্বণং প্রোক্ত মশক্তানাস্তু বার্ষিকম্।
মহাযজ্ঞাশ্চ নিত্যাঃ স্যুঃ সন্ধ্যাবচ্চাগ্নিহোত্রবৎ॥

সংস্কার সমূহের মধ্যে ১৬টী নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্ত বশতঃ করিতে হয়। আগ্রয়ণ—ইষ্টি প্রভৃতি সাত প্রকার পাকযজ্ঞ বার্ষিক অর্থাৎ বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র করিতে হয় এবং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধগুলি মাসিক অর্থাৎ মাসে মাসে করিতে হয়। অশক্ত হইলে বার্ষিক অর্থাৎ বৎসরে একবার করিলেও হয়। মহাযজ্ঞ (পঞ্চ যজ্ঞ) গুলি সন্ধ্যাবন্দনা ও অগ্নিহোত্রের ন্যায় নিত্য অর্থাৎ প্রতিদিনই করিতে হয়।

পূর্ব্বকালে এদেশের ব্রাহ্মণেরা এতগুলি সংস্কার অনুষ্ঠান করিতেন; কিন্তু এক্ষণে ইহার কিছুই নাই বলিলে বলা যায়। এখন আমরা বিবাহ, গর্ভাধান, অন্নপ্রাশন, চূড়া ও উপনয়ন ভিন্ন অন্য কোন সংস্কারের অনুষ্ঠান করিতে দেখি না। ভবদেব ভট্ট, পশুপতি, কালেশী, এই তিন মহাত্মা তিন বেদের ব্রাহ্মণাদির জন্য যে অনুষ্ঠান পদ্ধতি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দশটীমাত্র

সংস্কারের অনুষ্ঠান প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। সেই জন্যই এক্ষণকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা "দশবিধ সংস্কারই" জানেন এবং কেহ বা দশটীই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

সামবেদিদের জন্য ভবদেব ভট্ট, যজুর্ব্বেদীদিগের জন্য পশুপতি, ঋগ্বেদীদিগের জন্য কালেশী পণ্ডিত উক্ত দশবিধ সংস্কারের অনুষ্ঠানপদ্ধতি বঙ্গরাজ আদিশূরের রাজত্বকালে ও লক্ষণসেনের রাজ্যকালে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এদেশের ব্রাহ্মণেরা এই সকল পদ্ধতি অদ্যাপি লইয়া কর্ম্মোপদেশ করিয়া থাকেন। বটতলায় মুদ্রাকরেরা উক্ত গ্রন্থত্রয় মুদ্রিত করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের অনেক উপকার করিয়াছেন বলিতে হয়। এক্ষণে দেখা যাউক, শূদ্র জাতির সংস্কারক্রিয়া বিধিবোধিত কি না, এবং তাঁহাদের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা প্রকাশিত আছে। এসম্বন্ধে যমস্মৃতির অনুমতি এই যে শূদ্রেরাও এই সকল সংস্কারে সংস্কৃত হইতে পারে; কিন্তু অমন্ত্রক অর্থাৎ মন্ত্রপাঠ না করিয়া কেবল নমোনমঃ বলিয়া উক্ত দশ প্রকার সংস্কারের অনুষ্ঠান করিবেক। যথা—

"শূদ্রোঽপ্যেবংবিধঃ কার্য্যো বিনামন্ত্রেণ সংস্কৃতঃ।"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই বিধানের অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন যে,—

"ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিষ্‌শূদ্রা বর্ণা স্ত্বাদ্যা স্ত্রয়োদ্বিজাঃ।
নিষেকাদ্যাঃ শ্মশানান্তা স্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়া॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র,—এই চারি প্রকার বর্ণের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ গর্ভাধানাদি শ্মশানান্ত কার্য্য সকল মন্ত্র পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেক, শূদ্রবর্ণেরা অমন্ত্রক অনুষ্ঠান করিবেক।

শূদ্রের ন্যায় হতভাগিনী রমণীরাও এদেশের ঋষিদিগের ঘৃণার পাত্র ছিলেন, তাই তাঁহাদেরও সংস্কারগুলির শূদ্রের ন্যায় অমন্ত্রক অনুষ্ঠান হইত। কেবল বিবাহ সংস্কারটী তাঁহাদের মন্ত্র পূর্ব্বক হইত যথা—

"তূষ্ণীমেতাঃ ক্রিয়া স্ত্রীণাং বিবাহস্তু সমন্ত্রকঃ।"

[সংস্কার ময়ূখ।

উল্লিখিত সংস্কাররাশির মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত আবশ্যক, কতকগুলি ঐচ্ছিক। অর্থাৎ না করিলেও ক্ষতি নাই। পরন্তু সংগ্রহকর্ত্তাদিগের সিদ্ধান্তে উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কার গুলিই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সন্ন্যাসী হইলে উপনয়নের পর আর কোনও সংস্কার আবশ্যক হয় না; কিন্তু গৃহে থাকিলে হয়। আশ্বলায়ন শাখার উপনিষদ গ্রন্থে গর্ভলম্ভন, ও অনবলোভন নামক আরও দুই সংস্কারের উল্লেখ আছে এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের মধ্যে কর্ণবেধ প্রভৃতি আরও কএকটী সংস্কারের কথা লিখিত আছে।

সংস্কারের প্রয়োজন কি? উদ্দেশ্য কি? শাস্ত্রকারেরা একথার কোন উত্তর দিয়াছেন কি না? এক্ষণে তাহাই অনুসন্ধান করা যাউক।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

'গার্ভৈর্হোমৈ র্জাতকর্ম্মচূড়ামৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ। বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানা মপমৃজ্যতে।' গর্ভাধান, হোম, জাতকর্ম্ম চূড়াকরণ, মৌ-ঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার, এই সকল দ্বারা দ্বিজজাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-জাতির) জন্মকালীন পাপ ও গার্ভিক পাপ মার্জ্জিত হইয়া যায়।

গর্ভাধানাদি সংস্কার ক্রিয়ার দ্বারা উ-পরি উক্ত দোষ নষ্ট হয়—ইহার তাৎপর্য্য কি? তাহা প্রধান প্রধান নিবন্ধকারেরা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রকাশ গ্রন্থকার যাহা বলেন -তাহার অভিপ্রায় এই যে—অযুক্তকালে, অথবা নিষিদ্ধকালে, কিম্বা কোন রূপ দোষসংস্রব সত্ত্বে যদি সন্তান জন্মে তবে তৎ কালের দোষ সকল সেই সন্তানশরীরে আশ্রয় করিবে। সেই সকল দোষের অন্য নাম গার্ভিক ও জন্ম-কালীন দোষ। কালে ইহা এক প্রকার প্রকৃতি বা স্বভাব বলিয়া গণ্য হয়। গর্ভা-ধানাদি সংস্কার করিলে সে সকল দোষ থাকে না,—সুতরাং দ্বিজজাতিরা শুদ্ধ প্র-কৃতি হইয়া থাকেন। জন্মসংক্রান্ত দোষ, ও অশুচি গর্ভবাসজনিত দোষ (ভবিষ্যৎ মনুষ্যের বীজস্বরূপ শক্তি বিশেষ) সংস্কার কার্য্যের দ্বারা উন্মার্জ্জিত হয় বলিয়াই গর্ভা-ধানাদি সংস্কার করিতে হয় এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর নির্ণয় করিয়া-ছেন যে "গোত্র ব্যাধি সংক্রান্তি নিমিত্ত মনো ন তু পতিতোৎপন্নত্বাদি।"

গার্ভিক দোষ প্রভৃতি আর কিছুই নহে, উহা গোত্র সংক্রান্ত ব্যাধির সঞ্চারিত্ব শক্তি প্রভৃতিই মাত্র। সে দোষ সংস্কার কার্য্যের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়।

পুত্র যে পৈতৃক রোগে আক্রান্ত হয়, তাহা সকলেই বোধ হয় জানেন। সেই-রূপ পৈতৃক মনোবৃত্তিও পুত্রে অনুক্রান্ত হইয়া থাকে। মাতৃদোষ কিছু কন্যাতেই অধিক বর্ত্তে। বীজের ও ক্ষেত্রের গুণে ও দোষে যেমন শস্যাদির কি বৃক্ষাদির গুণ ও দোষ ঘটনা হয়, সেই রূপ মাতা-পিতার দোষে ও গুণে তদুৎপন্ন সন্তানেরা দোষী ও গুণী হয়। গুণ প্রার্থনীয় দোষ বর্জ্জনীয়। সেই জন্য, অর্থাৎ পৈতৃক ও মাতৃক দোষ যাহাতে পুত্রে অনুক্রান্ত না হয় তজ্জন্যই উল্লিখিত সংস্কার ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গর্ভাধান হইতে উপনয়ন কাল পর্য্যন্ত যে সকল সংস্কার করিবার অনুজ্ঞা আছে ঐ সকল সংস্কার যথাবিধি কৃত হইলে গোত্রজ ব্যাধি প্রভৃতির অব-শ্যই সঞ্চারিতা শক্তি মার্জ্জিত হইয়া যায়। পিতার কাসরোগ থাকিলেও, শাস্ত্রোক্ত নিয়মে যদি সন্তান জন্মে, যদি মাতা শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন থাকিয়া গর্ভরক্ষা করেন, প্রসবের পর ৮ বৎসর পর্য্যন্ত যে সকল সংস্কার করিবার উপদেশ আছে, সেই সকল সংস্কার যদি যথা নিয়মে কৃত হয়, তাহা হইলে সে পুত্র কখনই পৈতৃক কাস রোগে আক্রান্ত হইবে না। মহর্ষিদিগের এইরূপ জ্ঞান তত্ত্বে যাহার বিশ্বাস থাকে, সে অবশ্যই ইহা প্রতিপালন করিবে।

আট বৎসরের অর্থ উপনয়ন। উপ-

নয়ন ১১ বৎসরেও হইয়া থাকে। ১১ বৎসরেও যাহাদের উপনয়ন না হয়, তাহাদের কালাতিক্রম জন্য পাপ হয়। অর্থাৎ ১১ বৎসরের পরেই পৈতৃক ও মাতৃক রোগাদি হইবার সম্ভাবনা থাকে। তজ্জন্য তাহার সংস্কার ১১ বৎসরের মধ্যেই নির্ব্বাহ করা ভাল।

আর্য্যদিগের উপদিষ্ট সংস্কার তত্ত্বের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইল এক্ষণে সংস্কারগুলির অনুষ্ঠান প্রকার যথাক্রমে বর্ণনা করিব।—

শ্রীরামদাস সেন।

হাতে কলমে।

প্রেমের ধর্ম্ম এই, সে ছোটকেও বড় করিয়া লয়। আর, আড়ম্বর-প্রিয়তা বড়কেও ছোট করিয়া দেখে। এই নিমিত্ত প্রেমের হাতে কাজের আর অন্ত নাই, কিন্তু আড়ম্বরের হাতে কাজ থাকে না। প্রেম শিশুকেও অগ্রাহ্য করে না, বার্দ্ধক্যকে উপেক্ষা করে না, আয়তন মাপিয়া সমাদরের মাত্রা স্থির করে না। প্রেমের অসীম ধৈর্য্য; যে চারা শত বৎসর পরে ফলবান্ হইবে, তাহাতেও সে এমন আগ্রহসহকারে জলসেক করে, যে, ব্যবসায়ী লোকেরা ফলবান তরুকেও তেমন যত্ন করিতে পারে না। সে যদি একটা বড় কাজে হাত দেয়, তবে তাহার ক্ষুদ্র সোপান-গুলিকে হতাদর করে না। প্রেম, প্রেমের সামগ্রীর বসনের প্রান্ত ভাগের চিহ্ন পর্য্যন্ত ভালবাসিয়া দেখে। আর আড়ম্বর ধরাকেও সরা জ্ঞান করেন। ছোট কাজের কথা হইলেই তিনি বলিয়া বসেন, "ও পরে হইবে"। তিনি বলেন এক-পা এক-পা করিয়া চলা ও ত আপামরসাধারণ সকলেই করিয়া থাকে, তবে উৎকট লম্ফ-প্রয়োগ যদি বল তবে তিনিই তাহা সাধন করিবেন, এবং ইতিহাস যদি সত্য হয় তবে ত্রেতাযুগে তাঁহারই এক পূর্ব্বপুরুষ তাহা সাধন করিয়াছিলেন। * তিনি এমন সকল কাজে হস্তক্ষেপ করেন যাহা 'ঊনবিংশ শতাব্দীর" শাস্ত্রসম্মত, ইতিহাসসম্মত, যাহা কনষ্টিট্যুশনল। সমস্ত ভারতবর্ষে যত দুঃখ দুর্দ্দশা দুর্ঘটনা দুর্গ্রহ আছে সমস্তই তিনি বালীর লাঙ্গুলপাশবদ্ধ দশাননের ন্যায় এক পাকে জড়াইয়া একই-কালে ভারতসমুদ্রের জলে ডুবাইয়া মারিবেন, কিন্তু ভারতবর্ষের কোন-একটা ক্ষুদ্র অংশের কোন একটা কাজ সে তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। বিপুলা পৃথিবীতে জ-

* ইহা যদি কেহ "রুচিবিরুদ্ধ" বা গালাগালি জ্ঞান করেন তবে আমি "ঊনবিংশ শতাব্দীর" ডারুয়িনের দোহাই দিব।

ম্মিয়া ২

স্থানাভা

বামনে

করিয়াছিলে

বামনশ্রেষ্ঠের

তিনটে বা

লয় হইতে

ব্রহ্মপুত্রের

একটা বেলু

আস্মানে ...বেন; ...

কুসুমের ফলাও আবাদ করি

পত্র বাহির হইয়াছে। ইনি

উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ ক ...

রকম হয়, আর তা' যদি নিতান্ত না পারেন তবে না হয় খুব ঘটা করিয়া নিদ্রার আয়োজন করুন। হিমালয় নামক উঁচু জায়গাটাকে শিয়রের বালিশ করিয়া কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত পা ছড়াইয়া দিন, দুই পাশে দুই ঘাটগিরি রহিল। স্থানসংক্ষেপ করিয়া কাজ নাই, কারণ আড়ম্বরের স্বভাবই এই, একবার সে যখন ঘুমায় তখন চতুর্দ্দিকে হাত পা ছড়াইয়া এম্‌নি আয়োজন করিয়া ঘুমায় যে, কাহার সাধ্য তাহাকে জাগায়। ...হার জাগরণও যেরূপ বিকট তাহার ঘুমও সেই রূপ সুগভীর।

কেবল আড়ম্বরপ্রিয়তার নহে, ক্ষুদ্রত্বেরই লক্ষণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের প্রতি মন দিতে পারে না। পিপীলিকাকে আমরা যে চক্ষে দেখি ঈশ্বর সে চক্ষে দেখেন না। বড়র প্রতি যে মনোযোগ বা হস্তক্ষেপ করে, আত্মশ্লাঘা, যশ, ক্ষমতাপ্রাপ্তির আ-

...লিয়া মনে করে না। বাস্তবিকপক্ষে কোন্‌টা ছোট কোন্‌টা বড় তাহা স্থির করিতে পারে কে! ইতিহাসবিখ্যাত একটা কুহেলিকাময় দিগ্‌গজ ব্যাপারই যে বড়, আর ঘরের নিকটস্থ একটি রক্তমাংসময় দৃষ্টিগোচর অসম্পূর্ণতাই যে সামান্য তাহা কে জানে! কিসের হইতে যে কি হয়, কোন্ ক্ষুদ্র বীজ হইতে যে কোন্ বৃহৎ বৃক্ষ হয় তাহা জানি না, এই পর্য্যন্ত জানি সহজ হৃদয়ের প্রেম হইতে কাজ করিলে কিছুই আর ভাবিতে হয় না। কারণ, সহজ ভাবের গুণ এই, সে আর হিসাবের অপেক্ষা রাখে না। তাহার আপনার মধ্যেই আপনার নথী, আপনার দলিল। তাহাকে আর চৌদ্দ অক্ষর গণিয়া ছন্দ রচনা করিতে হয় না, সুতরাং তাহার আর ছন্দোভঙ্গ হয় না; আর যাহাকে গণনা করিতে হয়, তাহার গণনায় ভুল হইতেই বা আটক কি! সে বড়কে ছোট মনে

পৌত্রগণের, স্বদেশের উপ...
অত্যন্ত বেশী যে স্বদেশের "লোকের" উপর প্রেম আর বড় অবশিষ্ট থাকে না। এই কারণে, ইহারা স্বদেশের হিতসাধনে অত্যন্ত উন্মুখ, সুতরাং স্বদেশীয় হিতসাধনে সময় পান না। ব্যাপারটা যে কিরূপ হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। ঘোড়াটা না খাইতে পাইয়া মরিতেছে, ও সকলে মিলিয়া একটা ঘোড়ার ডিম লইয়া তা' দিতেছেন, দেশে বিদেশে রাষ্ট্র, তাহা হইতে এক যোড়া পক্ষী-রাজের জন্ম হইবে।)

যে ব্যক্তি দয়া প্রচার করিয়া বেড়ায় অথচ ভিক্ষুককে এক মুঠা ভিক্ষা দেয় না, তাহার প্রতি আমার কেমন স্বভাবতই অবিশ্বাস জন্মে। সে, কথায় কথায় বড় বড় চেক্ কাটে, কেন না কোন ব্যাঙ্কেই তাহার এক পয়সা জমা নাই। পুরাকালে কাঠ-বিড়ালিদের মধ্যে একজন জ্ঞানী জন্মিয়াছিলেন। তিনি কুলবৃক্ষে বাস করিতেন।

...ৎপত্তি
... করেন
...শ্বেতবর্ণ
। কুলফলত্ব
যাবৎ কুল-
...িষ্কারের
...নি ঘৃণা
একেবারে
...রা কিরূপে
...হইতে পারে ...রই অন্বে-
...ষ্ট জীবন ক্ষেপণ করিতে
...ন্তু এই গুরুতর গবেষণার
... অবশিষ্ট জীবন এমনি সং-
ক্ষিপ্ত হইয়া আসিল যে, কুলত্বের চারা আজ পর্য্যন্ত বাহির হইল না। আজিও সেই কুলগাছ তাঁহার সমাধির উপরে মনুমেণ্ট স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে, এবং ভক্ত কাঠবিড়ালীগণ আজিও দূরদূরান্তর হইতে আসিয়া তাঁহাকে স্মরণ পূর্ব্বক সেই বৃক্ষ হইতে পেটভরিয়া কুল খাইয়া যায়। (বিষ্ণুশর্ম্মার অপ্রকাশিত পুঁথিতে এই গল্পটি পাঠ করিয়া আমার মনে হইল, হিতবাদ, প্রত্যক্ষবাদ ...ং অন্যান্য বাদানুবাদের ন্যায় (উক্ত কুলফলত্ববাদও সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই 'বাদ''কে যে কোন অনুষ্ঠান আশ্রয় করে সে উক্ত পূজনীয় কাঠবিড়ালী মহাশয়ের ন্যায় বেশীদিন বাঁচে না। (আমাদের দেশহিতৈষিতাও বোধ করি নিজের মহত্ত্বের অভিমানে স্থূল খাদ্য ভক্ষণ করা নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া হাওয়া ও বাষ্পের মত

খোরাকে জীবনধারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।) এই নিমিত্ত দেখা যায় আমাদের এই দেশহিতৈষিতা পদার্থটা কামারের হাপরের ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যে ফুলিয়া ঢাক হইয়া উঠিতেছে এবং পরের মুহূর্ত্তেই চুপসিয়া শুক্‌না চামচিকার আকার ধারণ করিতেছে। ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি নাই। ইহা হাওয়ার গতিকে হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠে, আবার একটু আঘাত পাইলেই আওয়াজ করিয়া ফাটিয়া যায়, তারপরে আর সে আওয়াজও করে না, ফোলেও না। কিন্তু, খোরাক বদল করা যায় যদি, যদি ইহা ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থের প্রতি দক্ষিণ-হস্ত চালনা করে, তবে আর এমনতর আকস্মিক দুর্ঘটনাগুলো ঘটিতে পায় না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। আজকাল প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই ইংরাজ-কর্ত্তৃক দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী একটা-না-একটা শুনিতেই হয়। কিন্তু কে সেই স্বদেশীয় অসহায়দের সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়! বাঙ্গলার জেলায় জেলায় নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিলিতি উত্তরাধিকারীগণ চাবুক হস্তে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যে রাজত্ব অর্থাৎ অরাজকত্ব করিতেছে, তাহাদের হাত হইতে আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি গরীব অনাথদের পরিত্রাণ করিতে কে ধাবমান হয়! পেট্রিয়টেরা বলিতেছেন স্বদেশের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ তাঁহারা পাকে-প্রকারে জানাইতে চান্ তাঁহাদের হৃদয় নামক একটা পদার্থ আছে; তাঁহারা তাঁহাদের "মাথাব্যথার" কথাটা এমন্‌ই রাষ্ট্র করিয়া দিতেছেন যে, লোকে তাঁহাদের মাথা না দেখিতে পাইলেও মনে করে সেটা কোন এক জায়গায় আছে বা। কিন্তু হৃদয় যদি থাকিবে,হৃদয়ের সাড়া পাওয়া যায় না কেন? চারিদিক হইতে যখন নিপীড়িত স্বদেশীয়দের আর্ত্তস্বর উঠিতেছে, তখন সেই স্বজাতিবৎসল হৃদয় নিদ্রা যায় কি করিয়া? এইত সেদিন শুনিলাম, স্বজাতি-দুঃখকাতর কতকগুলি লোক মিলিয়া একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন, আমাদের দেশীয় ব্যারিষ্টর অনেকগুলি তাহাতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু বোধ করি, উক্ত ব্যারিষ্টরগুলির মধ্যে মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ ব্যতীত এমন অল্পলোকই আছেন যাঁহারা বিদেশীয় অত্যাচারীর হস্ত হইতে স্বদেশীয় অসহায়কে মুক্তি দিবার জন্য প্রাণ ধরিয়া টাকার মায়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। স্বজাতির প্রতি যাঁহাদের আন্তরিক প্রাণের টান নাই, তাঁহাদের "স্বদেশ" জিনিসটা কি জানিতে কৌতূহল হয়! সেটা কি রাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান ও রাবণ বিবর্জ্জিত রামায়ণ? না কলার আত্যন্তিক অভাব বিশিষ্ট কলার কাঁদি! না লাঙ্গুলের সম্পর্কশূন্য কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড! ইতিহাসপড়া স্বদেশহিতৈষিতা এমনিতর একটা ঘোড়া-ডিঙ্গাইয়া ঘাস-খাওয়া। দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত স্বদেশের দুঃখে যাহাদের হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হয়, তাহারা সেই হৃদয়বিদারণ-ব্যাপারটাকে বিশেষ একটা দুর্ঘটনা বলিয়া জ্ঞান করে না। তাহারা সেই বিদীর্ণ হৃদয়-

টাকে সভায় লইয়া আসে, তাহার মধ্যে ফুঁ দিয়া ভেঁপু বাজাইতে থাকে ও উৎসব বাধাইয়া দেয়। আমাদের দেশে সম্প্রতি এই বিদীর্ণ হৃদয়ের রীতিমত কন্সর্ট বসিয়া গেছে, নৃত্যেরও বিরাম নাই। কিন্তু এই অবিশ্রাম নৃত্যের উৎসাহে কিছুক্ষণের মধ্যে নটদিগের শরীর ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে ও তাহারা নাট্যশালার আলো নিভাইয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া গৃহে গিয়া শয়ন করে। (কিন্তু দেশের লোকের সত্যকার ক্রন্দনধ্বনিতে—অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত কাল্পনিক অশ্রুজলে নহে,—মনুষ্য-চক্ষুপ্রবাহিত লবণাক্ত জলবিশিষ্ট সত্যকার অশ্রুধারায় যাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, কেবলমাত্র শ্রোতৃবর্গের করতালি-বর্ষণে তাঁহাদের সে বিদীর্ণ-হৃদয়ের শান্তি নাই। তাঁহারা কাতরের অশ্রু-জল মুছাই-বার জন্য নিজের ক্ষতিস্বীকার অনায়াসে করিতে পারেন। তাঁহারা কাজ করেন।)

যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিরূপ কাজ তাহার উপযোগী তাহা জানিনা। অনেকের মতে মুষ্টিযোগের ন্যায় অত্যাচারের আর ঔষধ নাই—অবশ্য, রোগীর ধাত বুঝিয়া। যাহারা খৃষ্টান সভ্যতার ভান করিয়াও মনে মনে পশুবলের উপাসক, অকাতরে অসহায়দের প্রতি শারীরিক বল প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না এবং তাহা ভীরুতা মনে করে না, খেলাচ্ছলে কালো মানুষের প্রাণহিংসা করিতে পারে, কড়া মুষ্টিযোগ ব্যতীত আর কোন ঔষধ কি তাহারা মানে! স্নিগ্ধ কবিরাজি তৈল তাহাদের চরণে অবিশ্রাম মর্দন করিয়া তাহার কি কোন ফল দেখা গেল! ইহাদের হিংস্র প্রবৃত্তি বোধ করি ব্যাঘ্রের মত ইহাদের হৃদয়ের ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকে, অবসর পাইলেই কাতরের মাথার উপরে অকাতরে লম্ফ দিয়া পড়ে। ইহাদের ধাত ইহারাই বুঝে। তাহার সাক্ষী আইরিষ জাতি। তাহারাও খুণী, এই জন্য তাহারা খুনের মাদার-টিংচার ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহারা তাহাদের দুঃখ নিরাকরণের সহজ উপায় দেখে নাই, এই জন্য ডাকের পরিবর্ত্তে ডাইনামাইটযোগে আগ্নেয় দরখাস্ত ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে প্রেরণ করিতেছে! তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র স্বয়ং তাহাদের রোগীর জন্য অনন্ত অগ্নিদাহ প্রেস্ক্রিপ্শন্ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের আর অল্পে স্বল্পে কি করিবে? Simila Similibus curantur, অর্থাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ, ইহা হোমিওপ্যাথিক বৈদ্যদের মত। (কিন্তু আমরা ত খুণী জাত নহি, এবং ততদূর সভ্য হইয়া উঠিতে আমরা চাহিও না;) মুষ্টিযোগ চিকিৎসাশাস্ত্রে আমাদের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই, এবং সে চিকিৎসা রোগীর পক্ষে আশুফলপ্রদ হইলেও চিকিৎসকের পক্ষে পরিণামে শুভকরী নহে। সুতরাং আমাদিগকে অন্য কোন সহজ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইংরাজের অত্যাচার নিবারণের উদ্দেশ্যে আমরা দেশীয় লোকদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করিব। (দেশের লোকের জন্য কেবল জিহ্বা আন্দোলন নহে, যথার্থ স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিব। বিদেশীয়ের হস্তে দেশের লোকের বিপদ নিজের অপমান ও

নিজের বিপদ বলিয়া জ্ঞান করিব। নহিলে একে, ইংরাজেরা আমাদের বিধাতৃ-পুরুষ, মফস্বলে তাহাদের অসীম প্রভাব, তাহারা সুশিক্ষিত সতর্ক, তাহাতে আবার ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ইংরাজ জুরি তাহাদের বিচারক; কেবল তাহাই নয়, তাহাদের স্বজাতি সমস্ত অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ন তাহাদের সহায়—এমন স্থলে একজন ভীত ত্রস্ত অশিক্ষিত স্বদেশী-সহায়বর্জ্জিত দরিদ্র কৃষ্ণকায়ের আশা ভরসা কোথায়!)

আমাদের দেশের বাগীশবর্গ বলেন, agitate কর, অর্থাৎ বাক্যযন্ত্রটাকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম দিও না। ইল্‌বর্টবিল্ ও লোকল্-সেল্‌ফগবর্মেন্ট সম্বন্ধে পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াও। তাহার একটা ফল এই হইবে যে, লোকেদের মধ্যে পোলিটিকল্ এডুকেশন্ বিস্তৃত হইবে। স্বদেশের হিত কাহাকে বলে লোকে তাহাই শিখিবে। ইত্যাদি। কিন্তু ইন্দ্রদেবের ন্যায় আকাশের মেঘের মধ্যে থাকিয়া মর্ত্তবাসীদের পরম উপকার করিবার জন্য কন্‌ষ্টিটুশনল্‌হিষ্ট্রি-পড়া ইংরাজি বক্তৃতার শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তাহাদের মাথা ভাঙ্গিয়া দিলেও তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে "পোলিটিকল্ এডুকেশন" প্রবেশ করে কি না সন্দেহ। আমি বোধ করি, এ সকল শিক্ষা ঘরের ভিতর হইতে হয়, অত্যন্ত পরিপক্ক লাউ কুমড়ার মতন চালের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে না! যতবার মফস্বলে এক জন ইংরাজ এক জন দেশীয়ের প্রতি অত্যাচার করে, যতবার সেই দেশীয়ের পরাভব হয়, যতবার সে অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া সেই অত্যাচার ও পরাভব নীরবে সহ্য করিয়া যায়, যতবার সে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে অসহায় বলিয়া অনুভব করে, ততবারই যে আমাদের দেশ দাসত্বের গহ্বরে এক-পা এক-পা করিয়া আরও নাবিতে থাকে। কেবল কতকগুলা মুখের কথায় তুমি তাহাকে আত্মমর্য্যাদা শিক্ষা দিবে কি করিয়া। যাহার গৃহের সম্ভ্রম প্রতিদিন নষ্ট হইতেছে, তুমি তাহাকে লোকল্ সেল্‌ফ্ গবর্মেন্টের মাচার উপর চড়াইয়া কি আর রাজা করিবে বল! ঘরে যাহার হাঁড়ি চড়ে না, তুমি তাহার ছবির হাতে একটা টাকার তোড়া আঁকিয়া তাহার ক্ষুধার যন্ত্রণা কিরূপে নিবারণ করিবে! যাহারা নিজের সম্ভ্রম রক্ষার বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে, শাসনকর্ত্তাদের ভয়ে যাহাদের অহর্নিশি নাড়ি ঠক্‌ঠক্ করিতেছে, তাহাদের হাতে শাসনভার দিতে যাওয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হয়। (শিক্ষা দিতে চাও ত এক কাজ কর; একবার একজন ইংরাজের হাত হইতে একজন দেশীয়কে ত্রাণ কর, একবার সে বুঝিতে পারুক্ ইংরাজ ও অদৃষ্ট একই ব্যক্তি নহে, একবার সে হৃদয়ের মধ্যে জয়গর্ব্ব অনুভব করুক, একবার তাহার হৃদয়ের ন্যায্য প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হউক্! তখন আমাদের দেশের লোকের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান বাস্তবিক হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে।) সে জ্ঞান যদি হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধমূল না হয় তবে জাতির উন্নতি

কোথায়! ইংরাজেরা যে আমাদের পশুর ন্যায় জ্ঞান করে, ও তাহা ব্যবহারে ক্রমাগত প্রকাশ করে, ড্যাম নিগর বলিয়া সম্বোধন করে, ও কটূক্তি পাতে কাঁপাইয়া তোলে, ইহার যে কুফল তাঁহার প্রতিবিধান কিসে হইবে! Agitate করিয়া দরখাস্ত করিয়া একটা সুবিধাজনক আইন পাস্ করাইয়া যে টুকু লাভ, তাহাতেও এ লোকসান পূরণ করিতে পারে না। (ইংরাজের প্রতিদিনকার ব্যবহারগত যথেচ্ছাচারিতা দমন করিয়া যখন দেশের লোকেরা আপনাদিগকে কতকটা তাহাদের সমকক্ষ জ্ঞান করিবে, তখনই আমাদের যথার্থ উন্নতি আরম্ভ হইবে, দাসত্বের থরহরভীতি দূর হইবে, ও আমরা নতশির আকাশের দিকে তুলিতে পারিব! সে কখন্ হইবে, যখন আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও ইংরাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার প্রত্যাশা করিতে পারিবে। সে শুভদিনই বা কখন্ আসিবে? (যখন স্বদেশের লোক স্বদেশের লোকের সাহায্য করিবে! এ যে শিক্ষা, এই যথার্থ শিক্ষা, এ জিহ্বার ব্যায়াম শিক্ষা নহে,ইহাই স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চ্চা।)

আমরা যখন স্বদেশীয় বিপন্নদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইব, তখন আমাদের আর-এক মহৎ উপকার হইবে। তখন আমাদের দেশের লোক স্বদেশ কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে! স্বদেশ-প্রেম প্রভৃতি কথা আমরা বিদেশীদের কাছ হইতে শিখিয়াছি, কিন্তু স্বদেশীদের কাছ হইতে আজিও শিখিতে পাই নাই। তাহার কারণ, আমরা স্বদেশপ্রেম দেখিতে পাই না। আমাদের চারিদিকে জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, হৃদয়ের অভাব। কেহ কাহারো সাড়া পাই না, কেহ কাহারো সাহায্য পাই না, কেহ বলে না মাভৈঃ! এমন শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া ইহাকেও গৃহ মনে করা অসাধারণ কল্পনার কাজ! (আমি উপবাসে মরিয়া গেলেও যে জনমণ্ডলী আমাকে এক মুঠা অন্ন দেয় না, আমাকে বাহিরের লোক আক্রমণ করিলে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে, আমার পরম বিপদের সময়েও আমার সম্মুখে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নৃত্যগীত উৎসব করে, তাহাদিগকে আমার আত্মীয় পরিবার মনে করিতে হইবে!) কেন করিতে হইবে! না, সহরের কালেজ হইতে একজন বক্তা আসিয়া অত্যন্ত উর্দ্ধকণ্ঠে বলিতেছেন তাহাই মনে করা উচিত! আমাকে যদি একজন ইংরাজ পথে অন্যায় প্রহার করে, তবে সেই বক্তাই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান। সে সময়ে কি আমরা আমাদের স্বদেশের কোন লোকের সাহায্য প্রত্যাশা করি! স্বদেশীয়দের মধ্যে আমরা যেমন অসহায় এমন আর কোথাও নহি! এই জন্যই বলিতেছি, যদি স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিতে হয় তবে সে পিতামহদের নাম উল্লেখ করিয়া সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র বিকম্পিত করিয়া agitate করিয়া বেড়াইলে হইবে না। (হাতেকলমে এক একজন করিয়া স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতে হইবে। যে কৃষক, নাগরিক মহাশয়ের উদ্দীপক বক্তৃতা ও জাতীয় সঙ্গীত শুনিয়া

প্রথমে হাঁ করিয়াছিল, তাহার পর হাই তুলিয়াছিল, তাহার পরে চোক বুজিয়া ঢুলিয়াছিল, ও অবশেষে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে সংবাদ দিয়াছিল যে কলিকাতার বাবু সত্যিপিরের গান করিতে আসিয়াছেন; সেই যখন বিপদের সময়, অকূলপাথারে ডুবিবার সময় দেখিবে তাহার স্বদেশীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তখন তাহার যে শিক্ষা হইবে সে শিক্ষার কোন কালে বিনাশ নাই। আমাদের সন্তানরা যখন দেখিবে চারিদিকে স্বদেশীয়েরা স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতেছে, তখন কি আর স্বদেশপ্রেম নামক কথাটা তাহাদিগকে ইংরাজের গ্রন্থ হইতে শিখিতে হইবে! তখন সেই ভাব তাহারা পিতার কাছে শিখিবে, মাতার কাছে শিখিবে, ভ্রাতাদের কাছে শিখিবে, সঙ্গীদের কাছে শিখিবে। কাজ দেখিয়া শিখিবে, কথা শুনিয়া শিখিবে না। তখন আমাদের দেশের সম্ভ্রম রক্ষা হইবে, আমাদের আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে; তখন আমরা স্বদেশে বাস করিব স্বজাতিকে ভাই বলিব। আজ আমরা বিদেশে আছি, বিদেশীয়দের হাজতে আছি, আমাদের সম্ভ্রমই বা কি, আস্ফালনই বা কি! আমাদের স্বজাতি যখন আমাদিগকে স্বজাতি বলিয়া জানে না, তখন্ কাহার কাছে কোন্ চূলায় আমরা "agitate" করিতে যাইব।

তবে agitate করিতে যাইব কি ইংরাজের কাছে! আমরা পথে সসঙ্কোচে ইংরাজকে পথ ছাড়িয়া দিই; আফিসে ইংরাজ প্রভুর গালাগালি ও ঘৃণা সহ্য করি, ইংরাজের গৃহে গিয়া যোড় হস্তে তাহাকে মা বাপ বলিয়া তাহার নিকটে উমেদারী করি, ও তাহার খানসামা রসুলবক্সকে সেলাম করিয়া খাঁ-সাহেব বলিয়া চাচা বলিয়া খুসী করি, ইংরাজ আমাদিগকে সরকারী বাগানের বেঞ্চিতে বসিতে দেখিলে ঘাড় ধরিয়া উঠাইয়া দিতে চায়, ইংরাজ তাহাদের ক্লবে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে চায় না, ইংরাজ রেলগাড়িতে তাহাদের বসিবার আসন স্বতন্ত্র করিয়া লইতে চায়, Gentleman শব্দে ইংরাজ ইংরাজকে বোঝে ও বাবু অর্থে মসীজীবী ভীরু দাসকে বোঝে, ইংরাজ আমাদের প্রাণ তাহাঁদের আহার্য্য পশুর প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে না, ইংরাজ আমাদের গৃহে আসিয়া আমাদিগকে অপমান করিয়া যায় আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে পরি না, সেই ইংরাজের কাছে আমরা agitate করিতে যাইব যে, তোমরা আমাদিগকে তোমাদের সমকক্ষ আসন দাও! মনে করি, কেবল মাত্র আমাদের হাঁক শুনিয়া তাহারা ত্রস্ত হইয়া তাহাদের নিজের আসন তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবে! কেতাবে পড়িয়াছি ইংরাজেরা স্বদেশে কি করিয়া agitate করে, মনে করি তবে আর কি, আমরাও ঠিক অমনি করিব ফলও ঠিক সেইরূপ হইবে; (কিন্তু একটা constitutional সিংহচর্ম্ম পরিলেই কি ক্ষুরের জায়গায় নখ উঠিবার সম্ভাবনা আছে!) গল্প আছে একটা গরু রোজ তাহার গোয়াল হইতে দেখিত তাহার মনিবের কুকুরটি লম্ফ-

ঝম্ফ করিয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপর দুই পা তুলিয়া দিত এবং পরমাদরে প্রভুর পাত হইতে খাদ্যখণ্ড খাইতে পাইত; গরুটা অনেক দিন ভাবিয়া, অনেক খড়ের আঁটি নীরবে চর্ব্বণ করিয়া স্থির করিল, মনিবের পাত হইতে দুই এক টুকুরা সুস্বাদু প্রসাদ পাইবার পক্ষে এই চরণ উত্থাপন এবং সঘনে লাঙ্গুল ও লোলজিহ্বা আন্দোলনই প্রকৃত Constitutional agitation; এই স্থির করিয়া সে তাহার দড়িদড়া ছিঁড়িয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপরে লম্ফ ঝম্প আরম্ভ করিল। কুকুরের সহিত তাহার ব্যবহার সমস্ত অবিকল মিলিয়াছিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথাপি গোষ্ঠবিহারীকে নিরাশ হইয়া অবিলম্বে গোয়াল ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ আহার হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই বাহ্যিক আহারে পেট না ফুলিয়া পিঠ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। আমরাও agitate করি, বাহ্যিক পিট-থাব্‌ড়াও খাই, কিন্তু তাহাতে কি পেট ভরে? আর, ইংরাজের সমকক্ষ হইবার জন্য ইংরাজের কাছে হাত যোড় করিতে যাওয়া এই বা কেমনতর তামাসা! সমকক্ষ আমরা নিজের প্রভাবে হইব না? আমরা নিজের জাতির গৌরব নিজে বাড়াইব না? নিজের জাতির শিক্ষা বিস্তার করিব না? নিজের জাতির অপমানের প্রতিবিধান করিব না, অসম্মান দূর করিব না? কেবল ইংরাজের পায়ের ধূলা লইয়া যোড়হাতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া গলবস্ত্র হইয়া বলিতে থাকিব, "দোহাই সাহেব, দোহাই হুজুর, ধর্ম্মাবতার, আমরা তোমাদের সমকক্ষ, আমরা তোমাদের ঐ উনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতার অতি পরিপক্ক কদলী লোলুপ, আমাদিগকে তোমাদের লাঙ্গুলে জড়াইয়া উঠাও, তোমাদের উচ্চ শাখার পাশে বসাও, আমরা তোমাদের উক্ত পরহিতৈষী লাঙ্গুলে তৈল দিব!" যদি বা ইংরাজ অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্তে আমাদিগকে বসিবার আসন দেয় ও আমাদের পিঠে হাত বুলাইয়া দেয়, তাহাতেই কি আমাদের প্রতি দিনকার নেপথ্যপ্রাপ্য লাথি ঝাঁটার অপমানচিহ্ন একেবারে মুছিয়া যাইবে! ইংরাজের প্রসাদে আমাদের যখন পদবৃদ্ধি হয়, সে পায়া কাঠের পায়া মাত্র, সহজ পদের অপেক্ষা তাহাতে পদশব্দ বেশী হয় বটে, কিন্তু সে জিনিষটা যখনই খুলিয়া লয় তখনই পুনশ্চ অলাবুর মত ভূতলে গড়াইতে থাকি। কিন্তু নিজের পদের উপরে দাঁড়াইলেই আমরা ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হই। ভিক্ষালব্ধ সম্মানের তাজ না হয় মাথায় পরিলাম, কিন্তু কৌপীন ত ঘুচিল না; এইরূপ বেশ দেখিয়া কি প্রভুরা হাসে না! ঢেঁকিরা দরখাস্ত করিতেছেন স্বর্গস্থ হইবার দুরাশায়, কিন্তু ধানভানাই যদি কপালে থাকে তবে স্বর্গে গেলে তাঁহারা এমনিই কি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন!

নিজের সম্মান যে নিজে রাখে না, পরের এমনিই কি মাথাব্যথা তাহাকে সম্মানিত করিতে আসিবে? আমরাই বা কেন আমাদের স্বজাতিকে ঘৃণা করি, অভাগায়

কথা কই না, স্ববস্ত্র পরিতে চাই না, ইংরাজের রুমালটা কুড়াইয়া দিতে পারিলে গোলোকপ্রাপ্তিসুখ অনুভব করিতে থাকি! আমরা আমাদের ভাষার, আমাদের সাহিত্যকে এমন উন্নতি করিতে চেষ্টা না করি কেন যাহাতে আমাদের ভাষা আমাদের সাহিত্য পরম শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠে! যে স্বদেশীয়েরা আমাদের জাতিকে, আমাদের ব্যবহারকে, আমাদের ভাষাকে, আমাদের সাহিত্যকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া নিজের উন্নতিগর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠেন, তাঁহারাই হয়ত সভা করিয়া জাতীয় সম্মানের জন্য ইংরাজের কাছে নাম-সহি-করা দরখাস্ত পাঠাইতেছেন; নিজে যাহাদিগকে সম্মান করিতে পারেন না, প্রত্যাশা করিতে থাকেন ইংরাজেরা তাহাদিগকে সম্মান করিবে! সে স্থলে স্বজাতি বলিতে বোধ হয় তাঁহারা আপনাদের গুটি কয়েককে বুঝেন, ও নিজেদের সামান্য অভিমানে আঘাত লাগাতে স্বজাতির অপমান হইয়াছে জ্ঞান করেন।) আমাদের গলার শৃঙ্খলটা ধরিয়া ইংরাজ যদি আমাদিগকে তাহাদের কড়িকাঠে অত্যন্ত উঁচু জায়গায় লট্‌কাইয়া দেয় তাহা হইলেই কি আমাদের চরম উন্নতি আমাদের পরম সম্মান হইল! যথার্থ স্থায়ী ও ব্যাপক উন্নতি কি আমাদের নিজের ভাষা নিজের সাহিত্য নিজের গৃহের মধ্য হইতে হইবে না! নহিলে পেটের মধ্যে ক্ষুধা লইয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইলে কিরূপ স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে! (হৃদয়ের মধ্যে আত্মাবমান বহন করিয়া অনুগ্রহলব্ধ বাহিরের সম্মান খুঁটিয়া খুঁটিয়া মোরগপুচ্ছ বিস্তার করিলে মহত্ত্ব কি!) যেমন তেলা মাথায় লোকে তেল দেয়, তেম্‌নি টাকগ্রস্ত মাথা হইতে লোকে চুল ছিঁড়িয়া লয়। যে অবমানিত, তাহাকে আরও অবমানিত করিতে লোকে কুণ্ঠিত হয় না। আমরা ঘরে অবমানিত, সেই জন্যই আমাদিগকে পরে অবমান করে। (সেই জন্য বলিতেছি, আইস আমরা ঘরের সম্মান রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হই; স্বহস্তে আমাদের উৎকর্ষ সাধন করি; আমাদের গৃহের মধ্যে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করি; তবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বল সঞ্চয় হইবে। তখন এমন মহত্ত্ব লাভ করিব যে পরের কাছে সামান্য সম্মানটুকু না পাইলে দিন রাত্রি খুঁৎখুঁৎ করিয়া মারা পড়িব না।)

যাহা বলিলাম, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই—ইংরাজেরা আমাদিগকে সম্মান করে না, তাহাদের অপেক্ষা হীন জ্ঞান করে এই জন্য সর্ব্বত্র শ্বেত কৃষ্ণের প্রভেদ রাখিতে চায়। এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার প্রতিবিধানের জন্য সকলেই প্রস্তাব করিতেছেন, আমরা ইংরাজের নিকটে খুব গলা ছাড়িয়া বলিতে থাকি, তোমরা আমাদিগকে হীন-জ্ঞান করিও না, তাহা হইলেই তাহারা আমাদিগকে সম্মান করিতে আরম্ভ করিবে।

আমি বলিতেছি প্রথমতঃ এ প্রস্তাবটা অসঙ্গত, দ্বিতীয়তঃ, যদি বা ইংরাজরা আমাদিগের প্রতি সম্মানের ভান করে, তাহাতেই বা আমাদের লাভ কি! বিকারের

রোগী কতকগুলা প্রলাপ বকিতেছে দেখিয়া তুমি না হয় তাহার মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিলে কিন্তু তাহার রোগের উপায় কি করিলে! আমাদের দেশের দুরবস্থার কারণ তাহার অস্থি মজ্জার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, বাহ্যিক লক্ষণ যে সকল প্রকাশ পাইতেছে তাহা ভাল বই মন্দ নহে, কারণ, তাহাতে রোগের নির্ণয় হয়। আমি তাহার রীতিমত চিকিৎসার জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা করিতেছি। আর, রোগও ত এক-আধটা নহে; আমাদের দেশের শরীরং ভবব্যাধি মন্দিরং নহে এযে একেবারে ব্যাধি-ব্যারাকং।

যদি আমার এই কথা কাহারো যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, যদি দৈবক্রমে আমার এ সকল কথা কাহারও হৃদয়ের মধ্যে স্থান পায়, তিনি সহসা এমন স্থির করিতে পারেন যে, একটা সভা আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়া দেশের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। কিন্তু আমার বলিবার অভিপ্রায় তাহা নহে।

এখন্ আমাদের কি কাজ!' এখন কি "সভা" নামক একটা প্রকাণ্ডকায় যন্ত্রের মধ্যে আমাদের সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব? মনে করিব যে, আমাদের স্বদেশকে একটা এঞ্জিনের পশ্চাতে জুড়িয়া দিলাম, এখন এ উর্দ্ধশ্বাসে উন্নতির পথেই ছুটিতে থাকুক্! এখন কি Public নামক একটা কাল্পনিক ভাঙ্গা-কুলার উপরে দেশের সমস্ত ছাই ফেলিবার ভার অর্পণ করিব, ও যদি তাহাতে ত্রুটি দেখিতে পাই, তবে সেই অনধিগম্য উপ-ছায়ার প্রতি অত্যন্ত অভিমান করিয়া ঘরের ভাত বেশী করিয়- ৎব! অর্থাৎ, কর্ত্তব্য কাজকে কোন মে গৃহের মধ্যে না রাখিয়া অনাবশ্যক ৗইমার মত অবসর পাইবামাত্র সুদূরে ' ৗরে সমর্পণ করিয়া আসিব, ও তাহার প৷ম সদ্গতি করিলাম মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ সুখ অনুভব করিব! তাহা নয়। জিজ্ঞাসা করি, Public কোথায়, Public কি! চারিদিকে মরুভূমির এই যে বালুকাসমষ্টি ধুধূ করিতেছে দেখিতেছি, ইহাই কি Public! ইহার মধ্য হইতে কয়েক মুষ্টি একত্র করিয়া স্তূপ করিয়া একটা যে মূর্ত্তির মত গড়িয়া তোলা হয়, তাহাই কি Public! তাহারই মাথার উপরে আমরা যত পারি কার্য্যভার নিক্ষেপ করি, ও তাহা বার বার ধসিয়া যায়। তাহার মধ্যে অটল স্থায়িত্বের লক্ষণ কি আমরা কিছু দেখিতে পাইতেছি!

কথায় কথায় সভা ডাকিয়া Public নামক একটা কাল্পনিক মূর্ত্তির হৃদয় হাতড়াইয়া বেড়াইবার একটা কুফল আছে। তাহাতে কোন কাজই হইয়া উঠে না; একটা কাজ উঠিলেই মনে হয়, আমি কি করিব, একটা বিরাট সভা নহিলে এ কাজ হইতে পারে না! আমি একলা যতটুকু কাজ করিতে পারি, ততটুকুও কোন কালে হইয়া উঠে না। মনে করি, হয় একটা অত্যন্ত কলাও ব্যাপার করিব, নয় কিছুই করিব না! ক্ষুদ্র কাজ মনে করিলেই হাসি আসে। তাহা ছাড়া হয়ত এমনও মনে হয়,

সভা করিয়া তোলা সভ্যদেশপ্রচলিত একটা দস্তুর; সুতরাং সভা না করিয়া কোন কাজ করিলে মনের তেমন তৃপ্তি হয় না! ইহা ব্যতীত, নিজের উদ্যম নিজের উৎসাহ, নিজের দায়িকতা, অতলস্পর্শ সভার গর্ভে অকাতরে জলাঞ্জলি দিয়া আসা যায়।

আমাদের দেশের অবস্থা কি, তাহাই প্রথমে দেখা আবশ্যক। এখানে Public নাই। উপন্যাসের দুয়ারাণী যেমন কুল-গাছের কাঁটায় আঁচল বাধাইয়া স্বামী-কর্তৃক অবরোধসুখ কল্পনা করিত, আমরা তেমনি কাপড়চোপড় পরাইয়া একটা ফাঁকি পব্‌লিক সাজাইয়া রাখিয়াছি, কখন তাহাকে আদর করিতেছি, কখন তিরস্কার করিতেছি, কখন বা তাহার প্রতি অভিমান প্রকাশ করিতেছি এবং এইরূপে মনে মনে ঐতি-হাসিক সুখ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এখনও কি খেলার সময় ফুরায় নাই, এখনো কি কাজের সময় আসে নাই! মনে যদি কষ্ট হয়ত হৌক্, কিন্তু এই পুত্তলিকাটাকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এখন এই মনে করিতে হইবে, আমরা সকলেই কাজ করিব। যেখানে প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিরুদ্যমী, সেখানে ব্যক্তিসমষ্টির কার্য্য-তৎপরতা একটা গুজবমাত্র। আমি উনি তুমি তিনি সকলেই নিদ্রা দিব, অথচ আশা করিব "আমরা" নামক সর্ব্বনাম শব্দটা জাগ্রত থাকিয়া কাজ করিতে থাকিবে! সর্ব্বত্রই সমাজের প্রথম অবস্থায় ব্যক্তি-বিশেষ, ও পরিণত অবস্থায় ব্যক্তিসাধারণ। প্রথম অবস্থায় মহাপুরুষ, পরিণত অব-স্থায় মহাম গুলী। জলনিমগ্ন শৈশব পৃথিবী-তেও আভ্যন্তরিক গূঢ়বিপ্লবে বিচ্ছিন্ন উন্নত শিখর সকল জলের উপর ইতস্তত জাগিয়া উঠিত। তাহারা একক মাহাত্ম্যে চতুর্দ্দিকের কল্লোলময় মহাপ্লাবনের মধ্যে জীবদিগকে আশ্রয় দিত। সমলগ্ন সমতল উন্নত মহাদেশ, সে ত আজ পৃথিবীর পরিণত অবস্থায় দেখি-তেছি। এখনই যথার্থ পৃথিবীর ভূ-পব্‌লিক তৈরি হইয়াছে। আগে যেখানে ছিল মহা-শিখর, এখন সেখানে হইয়াছে মহাদেশ। আমাদের এই তরুণ সমাজে, আমাদের এই ভাবিতে হইবে, কবে আমাদের সেই সামাজিক মহাদেশ সৃজিত হইবে! কিন্তু সেই মহাদেশ ত একটা ভুঁইফোঁড় ভেল্কি নহে! সেই মহাদেশ সৃজন করিবার উ-দ্দেশে আমাদের সকলকেই আপনাকে সৃজন করিতে হইবে, আপনার আশপাশ সৃজন করিতে হইবে। আপনাকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেকে উঠিব, প্রত্যেকে উঠাইব, এই আমাদের এখনকার কাজ। কিন্তু সে না কি কঠোর সাধনা, সে না কি নিভৃতে সাধ্য, সে না কি প্রকাশ্য-স্থলে হাঙ্গাম করিবার বিষয় নহে, সে প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের সমষ্টি, সে কঠিন কর্ত্তব্য বটে, অথচ ছায়াময়ী বৃহদাকৃতি দুরাশা নহে, এই নিমিত্ত উদ্দীপ্ত হৃদয়দের তাহাতে রুচি হয় না। এরূপ অবস্থায় এই সকল ছোট কাজই বাস্তবিক দুরূহ, প্রকাণ্ডমূর্ত্তি কাজের ভান ফাঁকি মাত্র! আমাদের চারিদিকে, আমাদের আশে পাশে, আমাদের গৃহের মধ্যে আমা-

দের কার্য্যক্ষেত্র। সমস্ত কাজই বাকী রহিয়াছে, এমন স্থলে সমস্ত ভারতবর্ষকে একেবারে উদ্ধার করা, সে বরাহ বা কূর্ম্ম অবতারই পারেন; আমাদের না আছে নাসার পার্শ্বে তেমন দন্ত না আছে পৃষ্ঠের উপরে তেমন বর্ম্ম।

এখন আমাদের গঠন করিবার সময়, শিক্ষা করিবার সময়। এখন আমাদিগকে চরিত্র গঠন করিতে হইবে, সমাজ গঠন করিতে হইবে, পব্লিক গঠন করিতে হইবে। বিদেশীয়দের দেখাদেখি আগে ভাগে মনে করিতেছি, সমস্ত গঠিত হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য গঠনশালার গোপনীয়তা নষ্ট করিয়া কতকগুলি কুগঠিত কাঠখড়-বাহির-করা অসম্পূর্ণ বিরূপ মূর্ত্তি জনসমাজে আনয়ন করিয়া আমরা তামাসা দেখিতেছি। শত্রু পক্ষ হাসিতেছে।

এতক্ষণে সকলে নিশ্চয় বুঝিয়াছেন পব্লিকের উপযোগিতা স্বীকার করি বলিয়াই আমি এত কথা বলিতেছি। এখন দেখিতে হইবে পব্লিক গঠন করিতে হইবে কি উপায়ে! সে কেবল পরস্পরকে সাহায্য করিয়া। হাতেকলমে প্রকৃত সাহায্য করিয়া। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস করা চাই, পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভর করা চাই। মমতাসূত্রে সকলের একত্রে গাঁথা থাকা চাই। নতুবা, কাজের বেলায় কে কাহার তাহার ঠিকানা নাই, অথচ বক্তৃতা করিবার সময় বক্তা ওঝা মহাশয় মন্ত্র পড়িয়া কোন্ বটবৃক্ষ হইতে যে পব্লিক ব্রহ্মদৈত্যটাকে সভা-স্থলে নাবান্ তাহা ঠাহর পাওয়া যায় না! পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, পরস্পরের মধ্যে মমতা, পরস্পরের প্রতি নির্ভর—এ ত চাঁদা করিয়া রেজোলুশন পাস্ করিয়া হয় না। প্রত্যেকের ক্ষুদ্র কাজের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। এবং সে সকল কাজ সকলেরই আয়ত্তাধীন। এখন সেই উদ্দেশ্যের প্রতি আমরা সকলে লক্ষ্য স্থির করি না কেন! অর্থাৎ যেখানে বাস করিতেছি, সেখানটা যাহাতে গৃহের মত হয় তাহার চেষ্টা করি না কেন! নহিলে যে, বাহির হইতে যে-সে আসিয়া আমাদের সম্ভ্রম হানি করিয়া যাইতেছে; এমন একটু স্থান পাইতেছি না যাহা নিতান্ত আমাদেরই, যেখানে পরের কোন অধিকার নাই, যেখানে আত্মীয়দের স্নেহের অমৃতে পুষ্টিলাভ করিয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিদিন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করিতে যাই, বাহির হইতে সঞ্চয় করিয়া যেখানে আনয়ন ও বিতরণ করি, আমাদের পিতামাতারা যেখানে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, আমাদের সন্তানেরা যেখানে আশ্রয় পাইবে বলিয়া আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, যেখানে কেহ আমাদিগকে হীন জ্ঞান করিবে না কেহ আমাদিগের প্রতি অবিচার করিবে না, কেহ আমাদিগের ম্লানমুখ নতশির সহ্য করিতে পারিবে না, যেখানকার রমণীরা আমাদিগের লক্ষ্মীস্বরূপিনী আনন্দবিধায়িনী অন্নপূর্ণা, যেখানকার বালক বালিকারা আমাদেরই গৃহের আলোক আমাদেরই গৃহের ভাবী আশা, যেখানে কেহ আমাদের মাতৃভাষা আমাদের দেশীয় সাহিত্য আমা-

দের জাতির আচার ব্যবহার অনুষ্ঠানকে কঠোরহৃদয় বিদেশীয়ের ন্যায় অকাতরে উপহাস ও উপেক্ষা করিবে না। আর কিছু নয়, সেই গৃহপ্রতিষ্ঠা, স্বদেশে সেই স্বদেশপ্রতিষ্ঠা, স্বদেশীয়ের প্রতি স্বদেশীয়ের বাহু প্রসারণ, এই আমাদের এখনকার ব্রত, এই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইংরাজেরা আমাদিগকে সোহাগ করে কি না করে তাহারই প্রতীক্ষা করা তাহার জন্য আবদার করিতে যাওয়া—সে ত অনেক হইয়া গেছে, এখন এই নূতন পথ অবলম্বন করিয়া দেখা যাক্ না কেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খাদ্য।

স্বাস্থ্য রক্ষা ও আহার।

আমাদিগের দেশে স্বাস্থ্য রক্ষা ও আহার সম্বন্ধে যেরূপ কুসংস্কার আছে এমন কুত্রাপি দেখা যায় না। একটি কথা আছে যে নিজের মনোমত আহার করিবে অন্যের মনোগত পরিচ্ছদ পরিধান করিবে। ইহার অর্থ সকলেই অন্যভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। নিজের মনোমত আহার করার অর্থ যাহা, তাহা খাওয়া নহে; যে যে ভক্ষ্য দ্রব্য সহজে পরিপাক করিতে পারিব জানি তাহাই খাইব। কিয়দংশ লোক অনেক বিচার করিয়া আহার করেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে বিশেষ কোন উপকার দর্শে না। তাঁহারা আহার সম্বন্ধে তিনটি বিষয় ভাবেন যথা অমুক দ্রব্য পিত্ত, বায়ু ও কফ্ নাশক বা বর্দ্ধক কি না। বায়ু, পিত্ত, কফ্ যে বাস্তবিক কি তাহা অনেক বিদ্যাভিমানী কবিরাজও বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন না। এমত অবস্থায় সাধারণ লোক যে ইহাদিগের তাৎপর্য্য বুঝিবে তাহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে?

খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত যে কত অনিষ্ট উৎপাদন হইতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে আমাদিগের দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। শিক্ষিত বাঙ্গালী জাতি দিন দিন যেরূপ হীনবল হইয়া আসিতেছে, আরও শত বৎসর এইরূপ ভাবে চলিলে এ জাতির নিশ্চিত ধ্বংশ হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুমূত্র, অজীর্ণ, শিরঃপীড়া ও স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যতা (Nervous debility) এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে তাহার ঠিক নাই। কোন এক

জন ইউরোপীয় ডাক্তার প্রস্তাব করিয়াছেন যে বহুমূত্র রোগের জন্য একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসাগার কলিকাতায় স্থাপিত করিলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ উপকার দর্শিবে। এই সকল পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব কেন? অন্যান্য কারণের মধ্যে আহার সম্বন্ধে অমনোযোগ তাহার একটি প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অনেকে হয়ত বলিবেন, জল বায়ুর দোষে আমাদের পরিপাক শক্তি কম। জল বায়ুর দোষ অনেক স্থলে থাকিতে পারে। কিন্তু জল বায়ুর দাষ ঘোষণা করার পূর্ব্বে নিজের দোষটি স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আমরা এ স্থলে অজীর্ণ ও অন্যান্য রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি না কিন্তু এই মাত্র বলিতেছি যে আমাদের মধ্যে অনেকেই খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ জানেন না বলিয়াই অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হয়েন। কোন্ খাদ্যদ্রব্য কিরূপ পরিপাচ্য, কিরূপে আহার করা কর্ত্তব্য, কতক্ষণে পরিপাক হয়, কিরূপ রন্ধন করিলে অপরিপাচ্য ভক্ষ্যদ্রব্যও পরিপাচ্য হয় তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত ও সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিরই জানা কর্ত্তব্য। পৃথিবীস্থ অধিকাংশ সভ্য জাতিরা আহারের বিস্তর আড়ম্বর করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুর আহার অতি সামান্য ও আড়ম্বর বিহীন। তিনি আহারটা অনেক সময় আবশ্যকই মনে করেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত আমাদিগের আহারের [illegible] হইয়াছে [illegible] আড়ম্বর বৃদ্ধি [illegible] কিন্তু আহার সম্বন্ধে কুসংস্কার এখনও অপনয়ন হয় নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়দিগের আহার সম্বন্ধে রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাঁহারা নূতন নূতন ভক্ষ্য দ্রব্য আহার করিতে শিখিয়াছেন, অথচ এই নূতন নূতন ভক্ষ্য দ্রব্য সমূহ বাঙ্গালীর পক্ষে কিরূপ উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর তাহা অনেকেই অবগত নহেন এবং জানিতে ইচ্ছাও করেন না।

দুর্ব্বল বাঙ্গালীর পক্ষে বলবর্দ্ধক আহার যে কতদূর প্রার্থনীয় তাহা দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতেছেন। যথা নিয়মে উত্তম আহার দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ ও মানসিক শক্তির তেজোবর্দ্ধন হয়। আহার সম্বন্ধে সামান্য ব্যতিক্রমে যে কত ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমরা একবারও ভাবি না। নিয়ম পূর্ব্বক আহারের আবশ্যকতা সকলেই বুঝেন কিন্তু অতি অল্প লোকেই আহার সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম রক্ষা করেন। পাশ্চাত্য আহার অনুকরণ করিতে শিখিয়া সমাজে আমরা আরও কুদৃষ্টান্তের বীজ রোপণ করিতেছি। আমি এস্থলে পাশ্চাত্য আহারের দোষ গুণ বিচার করিতেছি না কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে আমরা পাশ্চাত্য আহার অনুকরণ করিয়া থাকি কিন্তু পাশ্চাত্য লোকেরা আহার পরিপাক করিবার জন্য যে সকল নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও অনুকরণ করি না। ইউরোপীয়দিগের ক্রিকেট, ব্যাড্‌মিন্‌টন্, লনটেনিস, পোলো ১ ও অশ্বা-

১ ইহা হইতে যদি কেহ পোলো খেলা ইয়োরপীয়দিগের বলিয়া ভুল বুঝেন, সেই

রোহণ ২ প্রভৃতি ব্যায়াম সকল অনুকরণ না করিয়া তাহাদিগের আহার মাত্র কেবল অনুকরণ করিয়া উহার পরিপাকের কোন উপায় অবলম্বন করি না। শরীররক্ষার্থ আহার ও ব্যায়াম উভয়ই অত্যাবশ্যক। আমাদের সব উল্টা। যিনি পড়িবেন তিনি "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" করিয়া পড়িতেই থাকিবেন। যিনি ব্যবসা করিবেন তিনি কেবল ব্যবসায়েরই উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিবেন অন্য দিকে চাহিয়া দেখিবেন না—আহারের নিয়ম পালন কি শরীর রক্ষার্থ একটু যত্ন, সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করিবেন না। যিনি ধনী তাঁহার ত কথাই নাই—তিনি দিনকে রাত ও রাতকে দিন করিয়া স্বাস্থ্যে

জন্য এখানে বলা ভাল, যে উহা ইয়োরোপের খেলা নহে। আমাদের দেশে মণিপুরে উহার সৃষ্টি, ইয়োরোপীয়গন এখনো মণিপুরীদিগের মত এ খেলায় দক্ষ হয়েন নাই। ভারতের কোন কোন খণ্ডের রাজাদিগকেও এ খেলায় নিপুণ দেখা যায়। এ খেলায় দুই দলে ঘোঁড়ায় চড়িয়া গোলা মারামারি করিতে হয়। ইহাতে অশ্বারোহণে অতিশয় নিপুণতা থাকা আবশ্যক। উত্তমের অনুকরণে গুণ ব্যতীত দোষ নাই, এই জন্যই ইয়োরপীয়গণ আমাদের দেশের এই পোলো খেলার অনুকরণ করিয়াছেন। ভা-সং

২ অশ্বারোহণ করিলে যে ইয়োরোপীয়দের অনুকরণ করিতে হইবে এমনও নহে।

ভারতবর্ষীয়গণ বহুকাল হইতে অশ্বারোহণে নিপুণ। ভারতবর্ষও এ প্রথা ইয়োরোপীয়দিগের নিকট গ্রহণ করে নাই—ইয়োরোপীয়েরাও ইহা আমাদের কাছে শিক্ষা করে নাই। ভা সং

একবারে জলাঞ্জলী দিয়া থাকেন। এমন কি চিকিৎসকগণ যাঁহাদিগের নিকট জনসাধারণে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষালাভ করিবে তাঁহারাও স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া আপনাদিগের কুদৃষ্টান্তে আমাদের দেশে বিষময় ফলোৎপাদন করিতেছেন। অধিকাংশ চিকিৎসক মনে করেন যে তাঁহারা যদি দিনের বেলায় একটা ও রাত্রে ১২ টার পূর্ব্বে বাটি আসিয়া যথানিয়মে আহার করেন তাহা হইলে সাধারণে মনে করিবে যে তাঁহাদের পশার নাই। কোন কার্য্য না থাকিলেও ডিস্পেন্সরিতে কিম্বা বন্ধু বান্ধবের বাড়িতে গিয়া গুড়ুক ফুঁকিয়া ও গল্প করিয়া বেলা একটা বাজাইয়া বাড়িতে আসিবেন। লোককে দেখান চাই যে তাঁহার ভারি পসার, একটু মাত্রও অবসর নাই। সকল শ্রেণীর মধ্যেই দেখা যায় স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রায়ই কেহ যত্নবান নহেন। শিক্ষিত লোকদিগের আহারের বিষয় ভাবিবার সময় নাই এবং চেষ্টাও নাই। ছাত্রদশা হইতেই ইঁহারা আহারে অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন। ছাত্রদশায় প্রাতঃকালে উঠিয়াই পড়িতে বসিলেন। নয়টার সময় তাড়াতাড়ি নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। বিকালে বাড়ি আসিয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পড়িতে বসিলেন। রাত্রে পুনরায় আহার করিয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে স্বাস্থ্যে অবহেলা করিয়া এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ভাল ছাত্রেরা প্রায় অন্যান্য কার্য্য

অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। সংসারে তাঁহাদের সুখ ও উন্নতি কম্। কালেজে যেরূপ চমক্ দেখাইয়া থাকেন কার্য্যক্ষেত্রে তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারেন না। পঠদ্দশায় কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইবার জন্যই ব্যস্ত—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কখন ভাবেন নাই; আহার ও ব্যায়াম যাহা দ্বারা শরীর পালন হয় তাহাতে বিশেষ অমনোযোগ করিয়া পাঠান্তে এবং কেহ কেহ পঠদ্দশাতেই একবারে ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। এই কারণে তাঁহারা উপাধি দ্বারা শোভিত হইয়া মৃত্তিকা-পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া থাকেন। যাহা কলেজে অধ্যয়ন কালে শিখিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অনেকে আর অধিক শিখিতে পারেন না, বরং অনেকে পূর্ব্বশিক্ষাও ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যান। কর্ম্মচারীরাও কতকগুলি কারণে শরীর পালনে অক্ষম হয়েন। এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোকেই অজীর্ণ-রোগবশতঃ ভগ্ন-স্বাস্থ্য হয়েন। ছাত্রদিগের ন্যায় ইহাঁদিগকেও তাড়াতাড়ি আহার করিয়া আফিস্ যাইতে হয়—সন্ধ্যার সময় বাটি আসিয়া আফিসের কাগজ পত্র লইয়া কার্য্য করিতে হয়,কেননা এক এক জনকে দুই জন বা ততোধিকের কার্য্য করিতে হয়। এই সকল কারণে ইহাঁদিগের মস্তিষ্কের অবকাশ নাই, নিয়ম পূর্ব্বক আহার নাই,ব্যায়ামের সময় নাই, শরীরপালনে যত্ন নাই, সময়ও নাই। এই অবহেলা হেতু ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই আজীবন রোগ ভোগ করেন। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইহাঁদিগের বংশজাত। অসুস্থ পিতা মাতার যে অসুস্থ সন্তান হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? এই অসুস্থ সন্তানগণ পাঠাবস্থায় শরীরপালনের নিয়ম সমূহ একবারে অবহেলা করিয়া আরো অসুস্থ হয়েন এবং কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াও শরীরপালনে যত্নবান হয়েন না সুতরাং ইহাদের সন্তান সন্ততিও যে কিরূপ বলিষ্ঠ ও সুস্থ হইবে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। যদি আর একশত বৎসর এইরূপ ভাবে চলে তাহা হইলে শিক্ষিত বঙ্গবাসী নাম যে জগত হইতে লোপ প্রাপ্ত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অস্মদ্দেশীয় আধুনিক রাজ-নৈতিক আন্দোলনকারীরা বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা যে বীজ রোপণ করিতেছেন তাহা দুই শত বৎসর পরে অঙ্কুরিত হইয়া ফলোৎপাদন করিবে এবং তাঁহাদের বংশ-জাতগণ সেই ফল ভোগ করিবেন। আমি বলি যে দুই শত বৎসর পরে হয়ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর নামই থাকিবে না। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদিগের নিকট নিবেদন এই যে যদি তাহারা বাস্তবিক দেশের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়া থাকেন তাহা হইলে কিসে বাঙ্গালী বলিষ্ঠ ও সুস্থশরীর হয় সেই চেষ্টা প্রথমে করুন। কোন্ কালে কোন্ দেশে দুর্ব্বল ভীরু লোকেরা জাতীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমরা নিজ দোষে ভীরু ও দুর্ব্বল সেই জন্য পরপদ দলিত হইয়া কেবল বাগাড়ম্বরে বিশেষ উন্নতি সাধন করিতেছি। স্বদেশহিতৈষীগণ যদি জাতীয়

উন্নতি দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে স্বদেশবাসীদিগকে বিদ্যাশিক্ষার সহিত শরীরপালনে শিক্ষা দিয়া বিদ্বান ও সবলকায় করুন—জাতীয় উন্নতি সত্বরই হইবে।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা অর্থাৎ পূর্ব্বতন হিন্দুরা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম উত্তমরূপে জানিতেন। তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি অতি সুন্দর। সেই হিন্দুবংশজাত হইয়া আমরা স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অযত্ন করিয়া এত ভীরু ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি যে আর্য্যবংশজাত বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করা উচিত। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সুনিয়ম—বিশেষতঃ আহারের সুনিয়ম অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বতন হিন্দু ঋষিগণ কত দীর্ঘায়ু হইয়া জনসাধারণের মঙ্গলার্থে জীবন যাপন করিতেন। শরীরের সহিত মনের উন্নতির যে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা আছে তাহা আমরা উপলব্ধি করি না। পূর্ব্বতন মহাত্মারা জানিতেন যে সুস্থশরীর না হইলে এমন কি অধ্যাত্মিক কোন উন্নতিও হইতে পারে না। শরীর সুস্থ না হইলে মন প্রস্ফুটিত হয় না—আত্মোন্নতি হয় না। শরীর সুস্থ রাখিতে গেলে শরীর-সঞ্চালন-ক্রিয়া অর্থাৎ ব্যায়াম যেরূপ অত্যাবশ্যক সেইরূপ আহার সম্বন্ধীয় নিয়ম তদপেক্ষা আরও প্রয়োজনীয়। নিয়ম পূর্ব্বক অতি সামান্য আহার দ্বারা মুনিগণ কেমন সুস্থশরীর ভোগ করিতেন।

ধন ও মান অনেকে উপার্জ্জন করিয়া থাকেন—পারিবারিক সুখও অনেকে লাভ করিয়া থাকেন—বিদ্যাও অনেকে উপার্জ্জন করিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহার স্বাস্থ্য নাই তাঁহার উপরিউক্ত উপার্জ্জন সত্ত্বেও কোন সুখ নাই। স্বাস্থ্য অপেক্ষা মূল্যবান আর কিছুই নাই। একবার ভগ্নস্বাস্থ্য হইলে পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্য লাভ দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। বিদ্যা, মান, ধন, ও পারিবারিক সুখ সত্ত্বেও ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তি যৎপরোনাস্তি অসুখী। যদি পরলোক বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে ইহ ও পর উভয় লোকের উন্নতির জন্যই উত্তম স্বাস্থ্য অত্যাবশ্যক।

অধুনাতন শিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীরা সংসারে প্রবেশ করিয়া কেন উন্নতি লাভ করিতে পারেন না? সুশিক্ষা সত্ত্বেও কেন ইহাঁদের মধ্যে অনেকে পশুবৎ জীবন যাপন করেন। ইহাঁরা কেন স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বনে অক্ষম? ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই অল্পায়ু কেন? শিক্ষিতদিগের শিশু সন্তানেরা কেন এত অধিক পরিমাণে অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়? স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মভঙ্গই ইহার প্রধান কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষা-গৃহ (Senate House) হইতে যখন পরীক্ষার্থীরা বাহির হইয়া আইসেন তখন তাঁহাদিগের চেহারা দেখিলে বোধ হয় তাঁহারা মেডিক্যাল্ কলেজের হাঁসপাতাল ভ্রমে সিনেট হাউসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক অধিকাংশ পরীক্ষার্থীদিগকে এত রুগ্ন ও পীড়িতের ন্যায় দেখায় যে তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে হাঁস্পাতালে থাকিবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই

যে এই সকল রুগ্ন ও দুর্ব্বলেরা কিরূপে দেশের অভীষ্ট আশা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন ?

কেন আমরা আহার করি ?

একটি বিলাতী যুবতীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে তুমি প্রত্যহ আহার কর কেন?

"আহার করি কেন? আহার না করিলে মাতা ডাক্তার ডাকাইবেন এবং ডাক্তার অমনি একটি কটু তিক্ত কষায় "টনিক" পাঠাইয়া দিবেন"। অনেকে বলেন যে আমরা আহার করি কেবল জীবন-ধারণ জন্য। আবার কতকগুলি পেটুক বলেন যে আমরা খাইবার জন্য বাঁচিয়া থাকি। বাস্তবিক ঊনবিংশ শতাব্দীতে আহারটি একপ্রকার সূক্ষ্ম শিল্পের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। জীবন ধারণ ব্যতীত আহার একটি সামাজিক কর্ত্তব্য মধ্যে পরি-গণিত হইয়াছে। অশিক্ষিত আদিম নিবাসীরাও কেবল প্রাণধারণার্থে আহার করে না। সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে সকল প্রকার মঙ্গলজনক কার্য্যোপলক্ষে আহারের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে বাস্তবিক শিশুদিগের ন্যায় শুদ্ধ প্রাণধার-ণার্থে আমরা আহার করি না। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, ব্রত, পূজা, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার সময় ক্ষুধা না থা-কিলেও অনুরোধ বশতঃ যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতে হয়। বন্ধু ও কুটুম্বের আগমন হ-ইলেও তৎক্ষণাৎ আহারের উদ্যোগ হয়। হিন্দুর বাটীতে আত্মীয় স্বজন আসিলেই আহারের নিমিত্ত অনুরোধ করা হয়।

ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশেও প্রায় সমস্ত মঙ্গলজনক কার্য্যে ভোজের আয়োজন হয়। আমাদিগের দেশের অ-পেক্ষা ইহাদিগের ভোজের নিয়মগুলি অতি পরিপাটি। নিমন্ত্রণের নাম শুনিলেই আ-মরা একেবারে নাচিয়া উঠি। পাড়াগাঁয়ে পাকা ফলারের সংবাদ রাষ্ট্র হইলে মহা ধুম পড়িয়া যায়। ভদ্র, গণ্যমান্য ব্যক্তি-গণ স্বহস্তে লুচি ভাজিয়াও থাকেন। সহ-রের লোকেরা নিমন্ত্রণ রক্ষার বিষয় অতিশয় কুদৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। নিমন্ত্রণ রক্ষাটা তাঁহারা সামাজিক কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরি-গণিত করেন না। কি সহরে কি পাড়া-গাঁয়ে নিমন্ত্রণের দিন আহারের অতিশয় অনিয়ম হইয়া থাকে। নিমন্ত্রণের পরদিন দশ বিশ জন নিশ্চয় পীড়িত হইবেন। দিনের বেলা আহারের নিমন্ত্রণ থাকিলে বেলা দুটার কম্ আহার সমাপ্ত হয় না। রাত্রের আহারও এত অধিক রাত্রে হইয়া থাকে যে অনেকে পরদিন অজীর্ণতার জ্বালায় অস্থির হইয়া শতবার শপথ ক-রেন যে আর কখন রাত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন না। এই কারণে নিমন্ত্রণ রক্ষা আজ কাল মহা দায় হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিতদিগের এরূপ নিমন্ত্রণ রক্ষা করা, নিমন্ত্রণে বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সহিত আহার করা একটি আমোদের বিষয়, কিন্তু যদি সেই আমোদ দুঃখ জনক ও রোগোৎপাদনের মূল হয় তাহা হইলে সে আমোদ হইতে বরং বঞ্চিত হওয়াই ভাল। সকল অবস্থায়, কি পা-

ঠের দশায় কি কর্ম্মক্ষেত্রে—কি ভ্রমণ কালীন্—কি নিমন্ত্রণে—সকল সময়েই স্বাস্থ্যের প্রতি অগ্রে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যদি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্ষতি সহ্য করিতে হয় তাহা হইলে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করাই উচিত।

আমাদের দেশে নিমন্ত্রণে আহারের সময় সমাজহিতকর বা রাজনৈতিক বিষয় আন্দোলন করি না। কেবল আহারের ভাল মন্দ ও অমুকের বাটিতে বেশ পরিপাটি ভোজ হইয়া থাকে ইত্যাদি বিষয়ের সমালোচনা হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে ঠিক ইহার বিপরীত। ভোজগুলি প্রায়ই বিশেষ ফলদায়ক হয়। অমুক চিকিৎসালয়ে মূল ধন কমিয়া গিয়াছে বা একটি নূতন বাটীর আবশ্যক, একটি ভোজের আয়োজন হইল। এমন কি রাজপুত্রেরাও ইহাতে যোগ দিয়া অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। প্রকাশ্য ভোজে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন একটি গুরুতর রাজকীয় বিষয়ে কোন দলের কি মত তাহা ভোজ শেষে বক্তৃতাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভারতবর্ষে রাজপুরুষেরা কোন বিষয়ে নিজের মত প্রায়ই প্রকাশ করেন না কিন্তু কোন প্রকাশ্য ভোজে নিমন্ত্রিত হইলে আহারশেষে বক্তৃতার সময় মতামত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। একত্র ভোজনে ইংরাজের বন্ধুতা যেরূপ বদ্ধমূল হইয়া থাকে এমত আর কিছুতেই হয় না। পারিবারিক ভোজ গুলিও ইংরাজ সমাজে বিশেষ আদরণীয়। অবিবাহিতা কন্যাদিগের পক্ষে এই ভোজ গুলি স্বয়ম্বর সভার ন্যায় কার্য্য করে। যাঁহার অবিবাহিতা যুবতী কন্যা আছে তিনি অবিবাহিত নিজ মনোমত যুবকদিগকে প্রায়ই পারিবারিক ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। এই উপায় দ্বারা অবিবাহিত যুবক যুবতীদিগের মিলন প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে সামাজিক সকল কাজেই আহার একটি প্রধান অঙ্গ হইয়াছে। অতএব ভক্ষ্য দ্রব্যের বিশেষ জ্ঞান ও আহারের নিয়ম যে ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আবশ্যক তাহার আর সন্দেহ কি?

ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
এল্, এম্, এস্।

হিমালয়ে প্রকৃতি দর্শন।

স্থান—ধবলগিরির উপত্যকা।

সময়—অন্ধকার রাত্রি।

উঃ কি গভীর নিশি, ঝাঁ ঝাঁ করে দিশি দিশি
দেব-মন্ত্রে মুগ্ধ চারি ধার,
সহসা মনেতে ভয়, এ যেন পৃথিবী নয়,
ধরার নাহিক ধারে ধার।
স্বন্‌ঃস্বন্ বহি বায়, নীহার কাঁপায়ে যায়,
এ ত নহে ধরার পবন,
এই যে আঁধার ঘন, ছিদ্র তাহে নাহি যেন,
কে দেখেছে ভূতলে এমন।
এ ঘোর গগণ-গায়, কি ওই মহান ছায়
দিগন্ত ক'রেছে আবরণ!
ও কি রে বিরাট মূর্ত্তি—অনন্তের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি—
কল্পনার অসাধ্য সাধন!
কটাক্ষে পৃথ্বিরে ঠেলি, ব্যোমমার্গ ঢেকে ফেলি
সপ্তম স্বরগে ওঠে শির,
বক্ষে ভ্রমে মেঘরাশি, বিকট হাসিয়ে হাসি
নেচে যায় চপলা অধীর।
অহো কি কঠোর ঠাঁই, শব্দ সাড়া কিছু নাই,
অনির্দ্দেশ—মহান—গম্ভীর!
প্রকৃতি! পেয়েছি তোরে, আর না ঘুরিব ঘোরে
এই তোর তপস্যা-মন্দির?
উর তবে মহামায়া! দেহ গো চরণ ছায়া,
কাতরে কর গো কৃপাদান,
আকুল ব্যাকুল হোয়ে দুর্ব্বল পরাণ লোয়ে
করেছি তোমার বহু ধ্যান!

মা গো মা! খুঁজেছি তোরে, শ্মশান-মশান ঘোরে
দেদীপ্য বিভীষিকা মাঝে,
ও প্রতিমা হেরিবারে, বসি মহাসিন্ধু ধারে
উপেক্ষা করেছি বৃষ্টি-বাজে!
কে জানিত এই স্থলে, এই মহা হিমাচলে
তুমি মা গো পেতেছ আসন,
উরঃ তবে মহামায়া, মাগি ও চরণ-ছায়া
একবার দেহ দরশন!
একবার কহ মাতঃ কিছুই ত বুঝিনা ত
কেন এ ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিলে,
বিশাল মশান ভূমি এই যে এ বিশ্ব এ তুমি
কোন প্রাণে কহ বিরচিলে?
আঁধারে আবৃত মা গো—কিছুই ত দেখনাগো
কি হতেছে শূন্য জলে স্থলে,
অধিক শকতি যার দুর্ব্বল শীকার তার,
মমতার গন্ধ নাহি মূলে।
বাজ পক্ষী ছিড়ে খায় হীনশক্তি চটিকায়,
শার্দ্দুল চিবায় হরিণীরে,
মকরে মমতা নাই, ক্ষীণ ক্ষুদ্র মাছে তাই
অকাতরে গ্রাসে সিন্ধু নীরে!
কি আর বলিব হায়, মানুষে মানুষ খায়,
হৃদয়ে হৃদয় করে গ্রাস,
যদি সে শকতি পায়, পরাণ চিবায়ে খায়
দেখিয়ে গৃধিনী পায় ত্রাস।

বাজ পক্ষী রূঢ় অতি, বিষধর ক্রুরমতি
শার্দ্দূল নৃশংস অতিশয়,
হিংস্রক মকরগণ, মানুষ পাষাণ মন
এই ত কলঙ্ক দেশময়।
কিন্তু মা প্রকৃতি তোরে, জিজ্ঞাসি কহ ত মোরে
কার দোষ কাহারে চাপাই!
জীব জন্তু কে সৃজিল, কেই বা প্রবৃত্তি দিল
সে প্রবৃত্তি কোথা পায় ঠাঁই?
নিজে সব বিরচিলে, নিজেই প্রবৃত্তি দিলে
বল দেবি! অপরাধ কার?
স্বাধীন কে আছে ভবে, ঘোর পরাধীন সবে
ইচ্ছা শক্তি প্রকৃতি বিকার;
জনম-মন্দিরে মা গো জানি নাই কিছু যে গো
হাসিনু কাদিনু মন্ত্র বলে,
কিসে যে হাসিতে হয়, কিসে যে কাঁদিতে হয়
কহ তা আমারে কে শিখালে!
যৌবন, মোহের মায়া, স্বপনের উপছায়া
দীপ্ত প্রাণ দগ্ধ দুরাশায়,
ফুটন্ত না হতে ফুল, কীটে করে ছিন্নমূল,
শুষ্ক পাপ্‌ড়ী ঝরে ঝরে যায়।
বার্দ্ধক্যে শিথিল অঙ্গ, জীবন স্বপন ভঙ্গ
ঔদাস্য বৈরাগ্যময় প্রাণ,
মরণ আসিলে ক্রমে, তরুটী লুটায় ভূমে,
মাটীতে মাটীর অবসান!
এই ত জীবন লীলা, তোমার সখের খেলা,
আমি ত গো পুত্তলিকা তার,
যেমন খেলাও তুমি তেমনি ত খেলি আমি
নাহি স্বত্ব আমাতে আমার!
এ ঘোর ভবের ঘোরে, তুমিই ফেলিলে মোরে
উঠি পড়ি তোমারই শাসনে,
ক্ষুদ্র শক্তি এ আমার, তৃণ-বাঁধ ঝটিকার,
চলিবে ত তোমারি চালনে!
বুদ্ধি—সেত বল-হীন, জ্ঞান—সেত ভ্রমাধীন
বিবেক ত অহঙ্কারময়,
আমি ত প্রবৃত্তি-দাস, পরায়েছ মায়াফাঁস
এ আমি তোমারি বই নয়!
এ ঘোর মরুভূ ভবে, তুমি না রাখিলে তবে
কে আর রাখিবে, মহামায়া!
কিন্তু গো পাষাণ মেয়ে (কঠোর পাষাণ চেয়ে)
কই তোর মাতৃস্নেহ ছায়া?

* * *
* * *

(পরদিন সন্ধ্যাকালে
স্থান ধবলগিরি—)

একি গো প্রকৃতি এবে মূরতি তোমার!
ভয়ে রুদ্ধ হৃদে মোর রুধিরের ধার।
এই ছিলে উল্লাসিনী, কেন হলে উন্মাদিনী,
মৌন মুখে কেন দেবি বজ্রের হুঙ্কার?
মহামায়া কেন এবে এ মূর্ত্তি তোমার!
এই যে সুন্দরী-সাজে, শত ইন্দ্রধনু মাঝে,
প্রশান্ত হরষ দীপ্তি করি বিকীরণ
নীরবে গাহিয়ে গান, মাতালে ভক্তের প্রাণ,
জাগালে মর্ত্তের মাঝে নন্দন কানন,
গভীর রক্তিম ঘটা, অস্তমিত ভানুছটা,
এই যে গো পরেছিলে সীমন্ত প্রদেশে,
জড়ায়ে রতন বাস হাসিয়ে মধুর হাস,
রেখেছিলে পা দুখানি মেঘের উরসে!
সে মূর্ত্তি এখন দেবি, লুকালে কোথায়,
একি লীলা, লীলাময়ী, কহ গো আমায়!
একেবারে চারিধার, ঘনঘোর অন্ধকার,
জমাট বেঁধেছে মেঘে ছিদ্র নাহি তার,

নদ নদী গাছ পালা, হিমাদ্রি শিখর মালা
লুকায়েছে, হারায়েছে, ডুবেছে কোথায় !
চপলা বিকট হাসি, বিদারি নীরদ রাশি
লহরে লহরে ঘন ঘনীভূত করে,
প্রলয়ের পরমাদ কড় কড় বজ্রনাদ
লাফায়ে লাফায়ে ছোটে শিখরে শিখরে।
শত গুণ প্রতিশব্দ, দিগঙ্গনা ভয়ে স্তব্ধ
সুকুমার বুকে রাখে আটকি নিঃশ্বাস,
বাসুকি অধীরপ্রায়, ঘন ভূকম্পন তায়
ব্রহ্মাণ্ডের আজ বুঝি হয় সর্ব্বনাশ !
ইন্দ্রকরী কর পারা, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা
আকাশ উজাড়ি যেন হতেছে বর্ষণ,
উথলি উঠেছে হ্রদ, উচ্ছ্বসিত নদী নদ
ঐক্যতানে করে সবে বিকট গর্জ্জন।
আছাড়িয়ে পাছাড়িয়ে, গিরি খণ্ড বিচূর্ণিয়ে
বিদরিয়ে বীরদর্পে ক্ষীণ ধরাতলে
অধীর উন্মত্ত পারা, ছুটেছে নির্ঝর-ধারা
সক্রোধে পশিছে যেন রসাতল তলে।
সর্ব্ব সংহারিতে যেন, ভয়ঙ্করী রূপে হেন
কেন গো প্রকৃতি আজি সাজিলে এ বেশে,
ক্ষান্ত হও মহামায়া ! সংহর প্রলয় ছায়া,
গেল যে এ তৃণ ধরা রসাতল দেশে !
তুমি ত চলিলে ক্রোধে,কে তব ও গতি রোধে
কে পারে রাখিতে তব প্রতাপ ভীষণ !
ক্ষীণ এ পৃথিবী অতি তার কেন এ দুর্গতি
তার প্রতি কেন দেবি তাড়না এমন !
না ভ্রূক্ষেপি আগুপিছু, কটাক্ষ না করি কিছু
তুমি ত আপন তেজে চল গো গরবে—
উথলি সহস্র ধারা—বিচূর্ণিয়ে গ্রহ তারা
আকুল করিয়ে তোল দেবতা দানবে,
তোমার বিক্রম দেবি কেবা জানে ভবে।

বুঝি নাকি দেবি, তব মাতৃমমতায়
ভেবেছ কি চণ্ডালিনী চিনি না তোমায় !
কহ মাতঃ সত্য করি—বিদীর্ণিয়ে অগ্নিগিরি
ছাইয়ে বসুধা ব্যোম অনল শিখায়—
জীব জন্তু কত প্রাণ, রত্নশালী কত গ্রাম
বিসর্জ্জিলে অকাতরে জ্বলন্ত চিতায় !
ভীষণ ঝটিকা ঝড়ে—নির্ম্মম বন্যার তোড়ে
সর্ব্বনাশা ভূকম্পনে মাতিয়ে, জননি !
অবনীর স্তরে স্তরে প্রলয় বিপ্লব করে
কে খেলে রাক্ষসী লীলা সর্ব্ব সংহারিণী ! ২
ছুঁড়িয়ে অনন্ত শূন্যে ভীম ধূমকেতু
একটী সমগ্র গ্রহ চূর্ণিলে কি হেতু ?
বুঝি নাকি দেবি তব মাতৃমমতায় !
ভেবেছ কি চণ্ডালিনি চিনি না তোমায় !
যুগ যুগান্তর ধ'রে এত যে যতন করে
তুচ্ছ এক তৃণগাছি করিলে প্রকাশ,
এত কোটী কোটী কল্পে, প্রাণপণে অল্পে অল্পে
জড়ে প্রাণ, প্রাণে বুদ্ধি, করিলে বিকাশ,
পরিণাম কিবা তার—যদি তুমি বার বার
ভাঙ্গ গড় গড় ভাঙ্গ, সৌখীন লীলায়,
সৃষ্টি নাশে যদি তোর, এতই আমোদ ঘোর,
ব্রহ্মময়ি ! ধিক তব ব্রহ্মাণ্ড গড়ায় !
করিছ মরণ-বৃষ্টি, যাহে লয় হয় সৃষ্টি
যাহে বিশ্ব রসাতলে লণ্ড ভণ্ড যায়—
গড়িতেছ গড় আরো, ভাঙ্গিতেছ যত পারো,
প্রণমি, প্রকৃতি তব মাতৃ মমতায় !

* * *

* * *

* * *

* * *

(সময়—পূর্ণিমা নিশি।)

আজি এ পূর্ণিমা নিশি, স্বপ্রকাশ দিশি দিশি
জোছনায় দিগন্ত ঘুমায়—
আপনি স্বপন রাণী, বরণ বরণ রঙ্গে
বিশ্বপট সোহাগে সাজায়।
ধরায় ঝরিছে নদী, সুবর্ণ সূত্রটী যেন,
পশিতে পশে না যেন চোখে ;
ঝক ঝক জ্বলে তন্বী, আধ' স্বপনের রেখা
আধ' আঁধারে তনু ঢেকে।
ও দিকে উঠেছে শৃঙ্গ, কত উচ্চে কত দূর—
কল্পনার স্বপন ভেদিয়ে—
এদিকে পাতালপুরি, ওদিকে সপ্তম স্বর্গ
কোন্ দিকে থাকিব চাহিয়ে !
এদিকে অনন্ত তল, ওদিকে অনন্ত শৃঙ্গ
অনন্ত শয়ান দুই ধারে,
পাতাল ত মহাশূন্য মহাশূন্য ব্যোম দেশ
কে আমি এ অনন্ত মাঝারে !
উর্দ্ধে ফোটে পূর্ণশশী, চারিদিক মোহে ঢাকি
ঘুমন্ত জোছনা আবরণে,
গাছ পালা পুলকিত, দিগঙ্গণা উলসিত
উলসে আলস লাগে প্রাণে।
ধবল শিখরে বসি—নীলাম্বরে চরণ রাখি
ঝলকিত মুকুট মাথায়,
আজি মা প্রকৃতি দেবি, রাজ-রাজেশ্বরী রূপে
কি মধুর হাসিছ হেথায় !
অদূরে সুধীরে ঝরে, নির্ঝরের শত ধারা
চূর্ণিত হীরক-স্রোত প্রায়,
অন্নপূর্ণা হোয়ে আজি, ঢালিতেছ রত্ন রাশি
যেন এই দরিদ্র ধরায় !
শূন্যে শূন্যে ওড়ে মেঘ আলোক আঁধার মাখি
স্বরগের প্রজাপতি সম—
উড়ে উড়ে যায় চোখে ধরি ধরি ধরিব না
পাছে দাগ লাগে স্পর্শে মম।
এ ঘোর ঘুমের মাঝে নিস্তব্ধতা চমকিয়ে
কি বোল বলিল ওই পাখী——
"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো"
গীতিময় সব যেন দেখি !
একটী বিহঙ্গ গানে ব্রহ্মাণ্ডের মহাগীতি
কহ মাতঃ কেমনে জাগিল,
একটী কোকিল স্বরে বাসন্তিক কুঞ্জে যেন
বিহঙ্গম মণ্ডলী মাতিল !
গ্রহ উপগ্রহ মাঝে উথলে স্বর্গীয় গীতি
স্তরে স্তরে শূন্যে ভেসে যায়,
শব্দ শূন্য বায়ু শূন্য বর্ণ শূন্য মহা শূন্য,
সে সঙ্গীত তরঙ্গিয়ে ধায়।
এই এ সঙ্গীত মাঝে, অনন্ত সঙ্গীত মাঝে
কেন মাগো আনিলে আমায়,
সহিতে পারিনে আর—দুর্ব্বল মানব হৃদি
আনন্দে বা অনন্তে মিশায়।
এই মহা ঐক্যতান ইহার মাঝারে বসি
তোমারে মা দেখিতে দেখিতে—
কেন না এ ছার প্রাণ অবসান হইতেছে
প্রশান্ত এ সহাস নিশীথে !
আছি আমি থাকি আমি চাও মোরে—যাব
আমি,
বিমুক্ত করেছি মোহ ফাঁস,
জীবন স্বপন ময়, স্বপন প্রমোদ ময়—
প্রমোদেতে স্বর্গের আভাস !
সে স্বর্গ যে মর্ত্ত ভূমে, মন্ত্রবলে আসে নেমে
বুঝেছি এখন তাহা সার,
জন্ম জন্ম এই সুখে, জনম কাটায়ে যাব'
এই তব উদ্দেশ্য উদার।

বিষ্ণুপুরের রাজবংশের ইতিহাস।

ডাক্তার হন্টার সাহেব তাঁহার Statistical Report মধ্যে প্রত্যেক জেলায় কি কি আশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে, কি কি ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়াছিল অনেক যত্নের সহিত সঙ্কলন করিয়াছেন। হন্টার সাহেব তজ্জন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তাঁহার Report এ অনেক বিষয় নাই ও যাহা আছে তাহাও অনেকে জানিতে ইচ্ছা করিলেও জানিতে পারেন না। এই সমস্ত কারণে আমি বাঙ্গালায় মুরসিদাবাদ ও বিষ্ণুপুরে যে সকল অতি আশ্চর্য্য প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিয়াছি তাহা সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

এক সময়ে বিষ্ণুপুরে হিন্দুরাজারা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া ছিলেন। কিন্তু সম্রাট আকবরের সময় বঙ্গদেশ মুসলমানাধিকৃত হইলে তাঁহার সনন্দানুসারে বিষ্ণুপুরের রাজা মুরসিদাবাদের নবাবের অধীন হন। কিছুদিন মুরসিদাবাদের নবাবের অধীন থাকিয়া বিষ্ণুপুরের রাজা পুনরায় স্বাধীন হইয়াছিলেন। বোধ হয় লোকে বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বিদিত আছেন। কিন্তু আমি রাজবংশীয়দিগের নিকট হইতে তাঁহাদিগের বংশের সকল রাজার নাম, রাজত্বকাল ও তৎসাময়িক ঘটনা সমূহের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাইয়াছিলাম; এবং তাহার সাহায্যে প্রচলিত বঙ্গদেশের ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া নিম্নলিখিত ইতিহাস লিখিয়াছি। ইহাতে কোন ঐতিহাসিক ভ্রম দর্শিত হইবে না। শুনিয়াছি মাননীয় মাজিষ্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্ত ইহাঁদের ইতিহাস স্বতন্ত্র প্রকাশ করিবেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন অনুষ্ঠান দেখিতে পাই নাই। সেই জন্য আশা করি পাঠকবর্গ এই ইতিহাস মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। বিষ্ণুপুরের ইতিহাস একটি নূতন বিষয়। বিশেষতঃ এখন মুরসিদাবাদের নবাবদিগের কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের ভগ্নাবশেষ দেখিলে বোধ হয় যেন বিষ্ণুপুরই বঙ্গদেশের প্রধান রাজ্য ছিল। হন্টার সাহেব মুরসিদাবাদের কথা যাহা লিখিয়াছেন সে অনুপাতে বিষ্ণুপুরের কথা কিছুই লেখেন নাই। বোধ হয় হন্টার সাহেব উপযুক্ত সাহায্য পান নাই। এই জন্য আমি প্রথমে বিষ্ণুপুরের সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি সেইগুলি লিখিতে আরম্ভ করিলাম। আমি ঐতিহাসিক বিষয় ইতিহাসের ভাষায় লিখিব। পাঠকগণ ইহাতে কাব্যের কোন রসই পাইবেন না। আমার এ দোষ মার্জ্জনীয়।

১০২ মল্লাব্দে অর্থাৎ ৬৯৬ খৃষ্টাব্দে

আদিমল্ল বিষ্ণুপুরে রাজত্ব আরম্ভ করেন। ইনি মল্লবংশীয়। ইনিই এই মল্লরাজ বংশের স্রষ্টা। ইহাঁর সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে ইনি একজন ক্ষত্রিয়ের সন্তান। ইহাঁর মাতা বানপ্রস্থাবলম্বী স্বামী সমভি-ব্যাহারে পশ্চিম দেশ হইতে জগন্নাথ-যাত্রা-কালে বিষ্ণুপুরের নিকট আদিমল্লকে প্রসব করিয়া সকল মায়া মমতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পথপ্রান্তে পরিত্যাগ করিয়া যান। সদ্য-প্রসূত অনাথ বালক একটী ব্রাহ্মণের নয়ন-পথে পতিত হইলে ব্রাহ্মণ তাঁহার লালন পালনের উপায় করিয়া দেন। পরে বালক যৌবনে পদার্পণ করিলে অসাধারণ বল বিক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ এই বালকে অনেক সুচিহ্ন দেখিয়া তাহাকে বড় যত্ন করিতেন। একদা ব্রাহ্মণ তত্রস্থ রাজার বাটী নিমন্ত্রিত হইয়া এই বালককে দাস-স্বরূপ সঙ্গে লইয়া যান। সকলে আহারে বসিলেন। আদিমল্লও প্রাঙ্গনে আহার করিতে বসিলেন। ইতিমধ্যে বৃষ্টি আসিল। অতিথিপ্রিয় রাজা স্বয়ং আদিমল্লের মস্তকে ছত্র ধরিয়া বৃষ্টি নিবারিত করিলেন। আদিমল্ল তখন বলিলেন মহারাজ যখন স্বয়ং আমার মস্তকে ছত্র ধরিলেন তখন যাহাতে ইতঃপর অন্যে ছত্র ধরিতে পারে এরূপ করুন। রাজা এই কথা শুনিয়া আদিমল্লকে জমিদারী স্বরূপ একটি পরগণা দিলেন এবং রাজা উপাধি প্রদান করিলেন। আদিমল্ল ক্রমে ক্রমে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা আপনার রাজ্য বিস্তৃত করিলেন। কিন্তু তিনি কাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন জানা যায় না। ইনি লাউগ্রামে একটি অতি উচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত দেবালয় প্রস্তুত করিয়া দেন। এখনও এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইতি আপনার নামের মুদ্রা ও মল্লাব্দ নামে একটি সাল প্রচলিত করেন। ১৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া আদিমল্ল পরলোক গত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল রাজা হইলেন। ইহাঁদের বংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হইতেন। জয়মল্ল হইতে ১৯ জন রাজা ক্রমান্বয়ে ৩১১ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহাদের রাজত্ব কালে .টী প্রস্তরনির্ম্মিত দেব-মন্দির নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে ৬ টী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও বিষ্ণুপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ১৯ জন রাজার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের সময়ের কোন ঐতিহাসিক বিষয় জানা যায় না। একবিংশ রাজা রূপমল্ল ১০০৩ সালে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহাঁর সময়ে নিকটবর্ত্তী রাজারা বিষ্ণুপুরের উন্নতি লক্ষ্য করিয়া ঈর্ষাপরবশ হইয়াছিলেন। ইনি আপনাদিগের বাসস্থান সুরক্ষিত করিবার জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত করিয়াছিলেন। এই প্রাচীর উর্দ্ধে ৪১ হাত ও প্রস্থে ১২ হস্ত পরিমিত। এখনও ইহার কিয়দংশ অক্ষুণ্ণ ভাবে আছে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা রূপমল্ল দুইটী প্রস্তরময় প্রবেশদ্বার নির্ম্মিত করিয়া বিষ্ণুপুরের দুর্গের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই দুইটি দ্বার আজও প্রায় অবিকৃত ভাবে রহিয়াছে। ইহার মধ্যে বহির্দ্বারটি অতিশয় উচ্চ ও অপরটির নির্ম্মাণ অতি আশ্চর্য্য।

শুনা গিয়াছে ভরতপুরের কেল্লা নির্ম্মাণ-কৌশলতা প্রযুক্ত অজেয় ছিল। বিষ্ণুপুরের রাজা অজেয় দুর্গ নির্ম্মাণের সূত্রপাত করিয়া যান। তিনি যে দ্বার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা ভরতপুরের কেল্লার দ্বারের অনুরূপ। বাস্তবিক যাঁহারা ভরতপুরের কেল্লার দ্বার দেখেন নাই তাঁহারা বিষ্ণুপুরের এই দ্বার ও তথাকার গড় নির্ম্মাণের প্রণালী দেখিলেই কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন কিজন্য ভরতপুরের কেল্লা অজেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা যে ভাবে দুর্গ প্রাকারের মধ্যে স্থাপিত, ইহাতে যে ভাবে শত শত সৈন্য গোপনে রাখিবার উপায় আছে, ইহাতে যে ভাবে কামান স্থাপন করিবার স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা দেখিলে বোধ হয় কোন রূপে এক জন সৈন্যও এই দ্বার অতিক্রম করিতে সক্ষম হইত না। ইহার মধ্যে এরূপ গুপ্ত ভাবে সোপানশ্রেণী অবস্থিত যে বহু আয়াস ব্যতীত সহজে কোন ব্যক্তি তাহা অনুসরণ করিতে পারেনা। বঙ্গদেশীয়েরা যে যুদ্ধপ্রণালী বিশেষ জানিত বিষ্ণুপুরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ তাহার অন্যতম প্রমাণ। ইনি ১৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোকগত হইলে সুন্দরমল্ল রাজা হইলেন। ইনি রাজা রূপমল্লকৃত গড় সুদৃঢ় করিবার জন্য গড়ের দুই দিকে ক্রমান্বয়ে পাঁচশ্রেণী অত্যুচ্চ প্রাচীর ও তৎপার্শ্বে পাঁচশ্রেণী গভীর পরিখা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গড়ের দক্ষিণদিকে এই সময়ে একটী কেয়ারাখানা প্রস্তুত করা হয়। এটী ইষ্টক নির্ম্মিত ও অতি উচ্চ দুর্গপ্রাচীরের উপর অবস্থিত। এখনও এই কেয়ারাখানা দেখিলে নূতন বলিয়া বোধ হয়। শুনা যায় গ্রীষ্মকালে রাজারা কোন প্রকার কল সংযোগ নিকটস্থিত জলাশয় হইতে জলোত্থিত করিয়া সেই জল আপনাদিগের বাসস্থানের চতুষ্পার্শ্বে বিন্দু বিন্দু করিয়া বৃষ্টির ন্যায় পাতিত করিবার জন্য ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ত্রয়োবিংশ রাজা কুমুদমল্ল ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তৎপুত্র দুইজনে ক্রমান্বয়ে ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজত্ব কালে বিষ্ণুপুরের দুর্গ সম্পূর্ণ হয়। দুর্গের দুই পার্শ্ব ইতিপূর্ব্বেই সুরক্ষিত হইয়াছিল। বিড়াই নদী এক সীমা রক্ষা করিয়াছিল। এক্ষণে অবশিষ্ট একপার্শ্ব অবরোধ করিবার জন্য ইঁহারা বাঁধ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল বাঁধ বিড়াই নদীর জলে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিত। ইহাঁদের সময়ের শ্যাম বাঁধ ও কৃষ্ণবাঁধ নামক দুইটি বাঁধ দেখিলে মনুষ্যকৃত বলিয়া বোধ হয় না। এখন ইহাদের যে অবস্থায় দেখা যায় ইহারা তদপেক্ষা অনেক অধিক বিস্তৃত ছিল। ১১০৯ খৃষ্টাব্দ প্রকাশমল্ল রাজা হন। ইনি কোন স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিতে পারেন নাই। ইঁহার সময়ে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল কি না তাহাও জানা যায় না। তদনন্তর প্রতাপ মল্ল রাজা হইয়া লাল বাঁধ প্রস্তুত করাইয়া দুর্গসীমার আরও কিয়দংশ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। লাল বাঁধ এক আশ্চর্য্য জলাশয়। একটী কাচের গ্লাসে কলের জল রাখিলে

তাহাতে কোন দ্রব্য ফেলিয়া দিলে যেরূপ দেখা সম্ভব লাল বাঁদের জলে তৃণের ন্যায় দ্রব্যও থাকিলে সেইরূপ দেখা যায়। আজও দেখা যায় স্ত্রীলোকে লালবাঁদে স্নান করিতে সঙ্কুচিত হয়। ইহার তলদেশে এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা জলের ভিতর দিয়া স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার জল অতি সুস্বাদু। ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত ও উত্তর দক্ষিণে ১ মাইলের ন্যূন নয়। লাল বাঁদ বিষ্ণুপুরের একটী মহৎ কীর্ত্তি। প্রকাশ মল্লের পর ৪ জন রাজা ১২১৭ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাঁরা প্রত্যেকে চৌকান, গাঁড়াইত, যমুনা, ও কালিন্দী নামক ৪টী বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় প্রস্তুত করিয়া বিষ্ণুপুরের দুর্গ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। এখন দেখিতে পাওয়া যায় এই ৪টী জলাশয়ের মধ্যে অনেক আবাদী জমী হইয়াছে। এই বাঁদ গুলির অবস্থানের ভাব দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় রাজারা ইহা দ্বারা গড়ের এক পার্শ্ব শত্রুআক্রমণের উপায়শূন্য করিয়াছিলেন। এই রূপ প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত দুর্গের মধ্যে বিষ্ণুপুর নগর অবস্থিত ছিল। আধুনিক বিষ্ণুপুর প্রাচীন বিষ্ণুপুর হইতে স্বতন্ত্র স্থান। আধুনিক বিষ্ণুপুর প্রাচীন দুর্গের বহির্দ্দেশে স্থাপিত হইয়াছে। ইঁহাদের পর ১৭ জন রাজা ৩৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সকল রাজাদের রাজত্ব কালে যে ১০টী অতি উচ্চ ও সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দশটী দেবালয়ের মধ্যে ২ টী একেবারে নির্ম্মূল হইয়াছে। বিষ্ণুপুর রাজ্যের স্থাপনাবধি ৮৯১ বৎসরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ৪৫ জন রাজা রাজত্ব করিলেন। কিন্তু আমি যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে এই পর্য্যন্ত সঙ্কলন করিয়াছি তাহাতে ইহাদের সময়ের—কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা পাই নাই। কেবল জানা গিয়াছে যে ইহাদের শেষ ২৪ জন রাজা ৫৮৪ বৎসরে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অনন্তর খৃষ্টীয় ১৫৮৭ সালে বীর হাম্বীর আপনার পিতা বীড়িমল্লের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহাঁর সময়েই বঙ্গদেশ প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের অন্তর্ভুত হইল। বীর হাম্বীর একজন বীরপুরুষ ছিলেন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট আকবর বঙ্গদেশ জয় করিবার জন্য মানসিংহকে প্রেরণ করেন। যদিও বীর হাম্বীরের সহিত মানসিংহের কোন যুদ্ধ হইয়াছিল কি না জানা যায় না তথাপি বিষ্ণুপুর যে দিল্লীর সম্রাটের অধীন হইয়াছিল ইহার প্রমাণ আছে। এবং দিল্লীর সম্রাটের সনন্দানুসারে ইহাঁদিগকে মুরসিদাবাদের নবাবকে কর দিতে হইয়াছিল! বীর হাম্বীর সন্ধিরূপে মুরসিদাবাদের নবাবকে বৎসর ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা করস্বরূপে দিতে স্বীকার করেন। এই সময়ে মুরসিদাবাদের নবাব বিষ্ণুপুরের রাজাদিগকে "সিংহ" উপাধি দেন। সেই জন্য বীর হাম্বীরের উত্তরাধিকারীরা মল্ল উপাধি ত্যাগ করিয়া সিংহ উপাধি ধারণ

করেন। বিষ্ণুপুরের রাজারা স্থপতি বিদ্যার যে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন অ-দ্যাপি তাহার প্রমাণস্বরূপ বীর হাম্বীর কৃত একটী রাশমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আধুনিক অবস্থা বড় হীন। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বেও এই মঞ্চে সমারোহের সহিত রাসলীলা হইয়া গিয়াছে। এই মঞ্চে স্থপতি বিদ্যার একশেষ হইয়াছে। তৎ-কালে স্থপতি বিদ্যার এরূপ উৎকর্ষ দে-খিলে অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হয়। মানসিংহ বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগমন করি-লেন। আকবরের চক্ষু দাক্ষিণাত্যে চাঁদ বিবির রাজত্ব আমেদ নগরের উপর পতিত হইল। বিষ্ণুপুরের রাজারাও কর দিতে হস্ত সঙ্কোচন করিলেন। বীর হাম্বীর ২৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র ৫ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইনিও এ পর্য্যন্ত কর দেন নাই। অনন্তর ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথসিংহ রাজা হইলেন। ইহাঁর বীরত্বের সম্বন্ধে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কর না দেওয়া দোষে রঘুনাথসিংহ নবাব কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মুরসিদাবাদে যান। তিনি যে সময় তথায় উপস্থিত হন সেই সময় দেখিলেন নবাব যুবতী রমণীগণে বেষ্টিত হইয়া নৃত্য-গীতে আমোদ করিতেছেন। সে সময়ে কোন ব্যক্তি নবাবকে রঘুনাথসিংহের আগ-মনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে অগ্রসর হইল না। রঘুনাথসিংহ আপনার আগমনবার্ত্তা নবা-বের গোচর করিবার জন্য যে তাঁবুর মধ্যে নবাব বসিয়াছিলেন তাহার একটী বন্ধন-কাষ্ঠ স্বহস্তে তুলিয়া ফেলিলেন, তাঁবু হেলিল; নবাব কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া শুনিলেন, বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথসিংহ আসিয়াছেন। তখন নবাব নিঃস্তব্ধ হই-লেন। পরদিন প্রাতে নবাবের সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইল। নবাব রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ঘোড়ায় চড়িতে পার। রাজা বলিলেন "পারি।" তৎপরে নবাব একটী দুর্দ্দমনীয় ঘোড়া নির্দ্দেশ করি-লেন। কিন্তু রঘুনাথসিংহ বলিলেন "আমি চড়িলে ঘোড়া মরিয়া যাইবে। বাস্তবিক তাহাই হইল, দেখিয়া নবাব রঘুনাথসিংহের দেয় কর মথুব করিলেন। অন্য এক সময়ে রঘুনাথসিংহ একটী মত্ত হস্তীর শুণ্ড স্বহস্তে উৎপাটন করিয়া আপনার অসীম বলের পরিচয় দিয়াছিলেন। রঘুনাথসিংহ সত্যের অনুরোধে না করিয়াছেন এমন কার্য্যই নাই। একবার তিনি কর না দিয়া মুর-সিদাবাদের নবাবের নিকট বলিলেন আমি কর সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু তৎপরেই বিষ্ণুপুর হইতে দেয় কর মুর-সিদাবাদে পৌঁছিল। রঘুনাথসিংহ এই কথা শুনিবামাত্র সমস্ত অর্থ গঙ্গাগর্ভে নিহিত করিলেন। সত্যের অনুরোধে এই-রূপ কার্য্য করিয়াছেন শুনিয়া নবাব এবারও রাজার কর মাপ করিয়াছিলেন। এইরূপে ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া রঘুনাথসিংহ প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। ইহাঁর পর বীরসিংহ, দুর্জ্জনসিংহ, রঘুনাথসিংহ (২য়) ও গোপাল-সিংহ নামক ৪ জন রাজা ক্রমে রাজত্ব করেন। বীরসিংহ ৬১ বৎসর রাজত্ব করিয়া-

ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা হয় নাই। ইনি পূর্ব্বকালীন রাজাদিগের কৃত অনেক দেবালয়, গড়ের দুই প্রাচীর ও প্রবেশ-দ্বার সংস্কার করেন এবং নিজে ৫১৬টী দেবালয় সংস্থাপন করেন। ও জোড় বাঙ্গালা নামক আর একটী দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। জোড় বাঙ্গালা আজও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁর সময়ে পোকাবাঁদ নামক আরও একটী অতি বৃহৎ বাঁদ খাত হইয়াছিল। এই বাঁদ গ্রীষ্মকালে এক প্রকার পোকায় এরূপ পূরিয়া যায় যে তখন ইহার জল ব্যবহার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। পোকা ছাঁকিয়া ফেলিলে ইহার জল অতি পরিষ্কার ও সুসেব্য। পণ্ডিত ও বহুদর্শী ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই পোকাগুলি কি, ও কিরূপে হয় জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সফল-প্রয়াস হন নাই। অবশিষ্ট তিন জনে ৬১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা দুর্জনসিংহের সময় একটী চমৎকার ইন্দারা প্রস্তুত হয়। ইন্দারাটী আজও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গভীরতা নিরূপণ করা সুকঠিন। বোধ হয় ইহার তলদেশ পর্য্যন্ত সোপান-শ্রেণীর দ্বারা অবতরণ করিবার উপায় করা হইয়াছিল। রঘুনাথ সিংহের পুত্র না হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতা গোপালসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। গোপালসিংহের সময় বর্গির হাঙ্গামে সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। গোপালসিংহ স্বয়ং একজন ভীরু রাজা ছিলেন। প্রায় অগণনীয় মহারাষ্ট্র সৈন্য বিষ্ণুপুরের দুর্গের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল। রাজা ভয়ে কাতর হইলেন। ইনি অনন্তর রাজাদিগের জাগ্রত দেবতা মদনমোহনের শরণাপন্ন হইলেন, এবং আপনার সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। যাহা হউক রাজা কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে দলমদল কামানধ্বনের জলদ গম্ভীর—স্বর শুনিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমার অনুমতি ব্যতীত কে কামান প্রয়োগ করিল। সকল সেনাপতিই আপনাদের কামান প্রয়োগ বিষয়ে নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিলেন। তখন রাজা দূত দ্বারা শুনিলেন মদনমোহন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বীতালঙ্কৃত শরীরে সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। রাজা বুঝিলেন মদনমোহন স্বয়ং কামান ছুড়িয়াছেন। এই গল্পটী চির-প্রসিদ্ধ। কিন্তু কি ঘটনা হইতে যে এই গল্পের উৎপত্তি হইল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, অবশেষে সংবাদ পাইলেন যে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য কামানের ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। এই স্থানে দলমদল কামানের একটী বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক। দলমদল দুইটী কামান। ইহাদের মধ্যে একটী আজও দেখিতে পাওয়া যায়। এই কামানটী দৈর্ঘ্যে ১৩ হস্ত পরিমিত। ইহার পরিধি ৬ হস্তের কম নয়। এই কামানটী দক্ষিণ দিকের দুর্গপ্রাচীরের উপর অবস্থিত ছিল। কিন্তু অধুনা সেই

স্থান হইতে নিম্নভূমির উপর পতিত আছে। লেফটেনাণ্ট গর্ভনর কাম্বেল সাহেব এইটীকে কলিকাতায় আনিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু আনিতে লক্ষ টাকার অধিক খরচ হইবে দেখিয়া আপাততঃ সে অভিলাষ ত্যাগ করেন। প্রায় দেড় শত বৎসর এই কামানটী এরূপ অযত্ন ভাবে থাকাতেও সম্পূর্ণ মসৃণ আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ইহাতে একবার শব্দ করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা হইয়াছিল। শুনা যায় সেই সময় গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা গর্ভপাতের ভয়ে গৃহমধ্যে দ্বারাদি রুদ্ধ করিয়াছিল। বিষ্ণুপুরের লোকে এই কামানটীর পূজা করিয়া থাকে। ইহার আর একটী কামান লালবাঁদের মধ্যে পড়িয়া আছে। লোকে বলে সেটী ইহার অপেক্ষা বৃহৎ।

বন্দীকৃত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে গোপালসিংহ দুর্গ মধ্যে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া থাকিতে দিয়াছিলেন। ঐ স্থান অদ্যাপি মহারাষ্ট্রী পাড়া বলিয়া খ্যাত। গোপালসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কৃষ্ণসিংহ ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। ইনি ৪৯ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহাঁর ভ্রাতা দামোদর সিংহের সহিত ইহাঁর রাজ্য লইয়া বিবাদ হয়। দামোদর সিংহ একজন অতিশয় বুদ্ধিমান ও ধূর্ত্ত ব্যক্তি ছিলেন। ইনি প্রায় লক্ষ মহারাষ্ট্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজার দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য দুর্গ প্রাকারের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাঁহার সৈন্যেরা অর্থের জন্য তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি তখন রাজার শরণাপন্ন হইয়া লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। আর বলিলেন যে আপনার প্রধান সেনাপতিকে আজ্ঞা করুন আমার এই সমস্ত সৈন্যকে বিষ্ণুপুরের বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আইসে।" রাজা অর্থ দিলেন, এবং ভ্রাতার কথায় বিশ্বাস করিয়া সেনাপতিকে ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা সত্বেও যাইতে আজ্ঞা করিলেন। দামোদরসিংহ সৈন্যদিগকে অর্থদিয়া বশীভূত করিলেন। এবং সেনাপতি (চৈতন্যসিংহের) যেমন তাঁহার শিবিরের নিকট উপস্থিত হইল, অমনি তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন। রাজা ভয় পাইলেন। এদিকে দামোদরসিংহ দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজার হাবসি সৈন্যগণও যুদ্ধসজ্জা করিল। কিন্তু অসংখ্য মহারাষ্ট্র সেনার নিকট সেই অল্প মাত্র সৈন্যে কি হইবে। তথাপি দুর্ভেদ্য দুর্গের ভরসায় রাজার ৫০০শত সৈন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই উভয় পক্ষে বন্দুক ব্যবহার করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। ধূর্ত্ত ও কপটাচারী দামোদর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল না। কিন্তু সত্যপরায়ণ রাজার সৈন্যেরা বন্দুক ব্যবহার করিল না। কাজেই ৫০০ শত লোক কতক্ষণ লক্ষ লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে? ক্রমে ক্রমে, একে একে, যুদ্ধ করিতে করিতে সেই কয়েক শত অসমসাহসী লোক নিধন প্রাপ্ত হইল। রাজা গুপ্ত দ্বার দিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দামোদর সিংহ দুর্গ অধিকার

করিয়া ৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বহুদিনের পর দিল্লীর সম্রাট, চৈতন্য সিংহকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত মুরসিদাবাদের নবাবের প্রতি আদেশ করিলেন। তখন বঙ্গদেশে ইংরাজ-পতাকা উঠিয়াছে। রাজা চৈতন্য সিংহ নবাবের নিকট উপস্থিত হইলে নবাব সম্রাটের আজ্ঞানুযায়ী ১০০০০ দশ সহস্র পদাতিক, ১০০০ সহস্র অশ্বারোহী, হস্তী, ও ৩২ কামান দিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু ক্লাইব সমস্ত ঘটনা শুনিয়া কেবল দুই দল ইংরাজসৈন্য কাপ্তেন মাউডের অধীনে প্রেরণ করিলেন। দামোদর সিংহ ইতি পূর্ব্বে স্বচক্ষে পলাসীর যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজদিগের নাম শুনিয়া ভয় পাইলেন, এবং বহুকাল হইতে সঞ্চিত রাজাদিগের অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া পলায়ন করিলেন। চৈতন্য সিংহ ৮ বৎসর পরে পুনরায় রাজত্ব পাইলেন বটে, কিন্তু কিছুমাত্র অর্থ পাইলেন না। বিষ্ণুপুরের রাজাগণ মুরসিদাবাদের নবাবের অধীন হওয়া পর্য্যন্ত যদিও রাজা বলিয়া অভিহিত হইতেন ও রাজার ন্যায় সৈন্য, অস্ত্র শস্ত্র রাখিতে পারিতেন তথাপি তাঁহারা একরূপ জমীদার মাত্র ছিলেন। এদিকে ক্রমে ক্রমে মীরজাফরের পর মীরকাশিমের রাজত্ব শেষ হইল। ইংরাজেরা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিলেন। ১৭৬৫ সালে ইংরাজেরাই বঙ্গদেশের দেওয়ানী পাইলেন। ক্রমে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়া ১৭৯৩ সালে জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা হীনবল; তিনি যেমন নবাবদের কর দিতে বাধ্য ছিলেন, সেইরূপ ইংরাজদের কর দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এখন কর দিবার সে বন্দোবস্ত নাই। এখন সূর্য্যাস্তের দিন অতীত হইলে, দেয় করের কিছু মাত্র বাকি থাকিলে জমীদারী নিলামে উঠিবে। বিষ্ণুপুরের রাজারা ৩৬০টী দেবালয় স্থাপন করেন। এই সকলের রীতিমত বন্দোবস্ত করিবার জন্য অনেক লাখরাজ দিয়াছিলেন; তাহাতে আবার তাঁহাদের ধনাগার দামোদর কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের ঘরে অনেক টাকা সঞ্চিত ছিল না। খাজনাও অধিক আদায় হইত না। এখন প্রতি বৎসর খাজানা দাখিল করা বড় বিপদ হইল। রাজারা কখনও নিয়মিত রূপে কর দেন নাই। যথাসময়ে কর দাখিল করা অনভ্যাস বশতঃ এবং দেয় কর সমস্ত সংগ্রহ করিতে না পারায় রাজারা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে খাজানা দাখিল করিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে দুই একটী করিয়া পরগণা নিলাম হইতে আরম্ভ হইল। ইতি পূর্ব্বে হইতেই রাজাদিগের বীরত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এখন হইতে তাঁহারা অর্থহীন হইতে চলিলেন। চঞ্চলা লক্ষ্মী আর পুরাতন স্বামীতে পরিতৃপ্ত হইলেন না। রাজ সরকারে যাঁহারা কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহাদের প্রতিই লক্ষ্মী প্রসন্ন হইলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। রাজারা ক্রমেই বিমর্ষ হইতে লাগিলেন।

রাজা চৈতন্য সিংহ প্রায় অর্দ্ধেক জমিদারী নষ্ট করিয়া ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গত হইলেন। তাঁহার পুত্র রাজা মদনমোহন সিংহ ১৫ দিন রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র মাধব সিংহ ৮ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়েই ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে, সূর্য্যাস্তের দিন খাজনা দিতে অসমর্থতা হেতু সমস্ত সম্পত্তি রাজাদিগের হস্তান্তর হইল। ইঁহারা নিঃসম্বল হইলেন। দিল্লীর সম্রাট নাম মাত্র। বাঙ্গালার নবাবও নাম মাত্র। ইংরেজই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহারাই বঙ্গদেশে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সৌভাগ্য ক্রমে ইংরাজ গবর্ণর রাজা মাধব সিংহকে পেন্সন্ দিলেন। এই সামান্য পেন্সনের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত করিতে হইল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মাধব সিংহের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপাল সিংহ পিতার পেন্সনের উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি আর রাজা উপাধি পাইলেন না। গোপাল সিংহ রাজত্ব বা জমিদারী বিহীন হইয়া ৬৬ বৎসর পেন্সন্ ভোগ করিয়া পরলোকগত হইলেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজাদিগের একষষ্টিতম রাজা। রামকৃষ্ণ সিংহদেব ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পেন্সন্ ভোগ করিতেছেন। রামকৃষ্ণসিংহের পুত্র নাই, বোধ হয় ইঁহার মৃত্যুর পরই এই বংশ লোপ হইতে চলিল।

রামকিশোর সিংহ দেব রামকৃষ্ণ সিংহের উত্তরাধিকারী হইবেন। এই বংশের একটী সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিত হইতে পারে। তাহাতে অনেক বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যাইবে। জামকুড়ী, কুচিয়াকোল প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের বংশীয়েরা জমীদার আছেন। বিষ্ণুপুরের দুর্গ প্রাকারের মধ্যে একটী গড় আছে। সেটি অতি সুদৃঢ়। কিম্বদন্তী আছে রাজারা যুদ্ধকালে স্ত্রীলোকদিগকে এই গড়ে রাখিতেন। এটী কোন সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা আমি জানিতে পারি নাই।

আর একটী কথা বলিয়া শেষ করিব। আজও সাহেব মহোদয়গণ ও এদেশীয় প্রায় সকলে রামকৃষ্ণ সিংহ দেবকে "রাজা" বলিয়া থাকেন। কিন্তু সরকারী কাগজ পত্রে "রাজা" লিখিবার নিয়ম নাই। অনেকেই এখন রাজা মহারাজা; কিন্তু যিনি পঞ্চদশ শত বৎসর স্বাধীন রাজা ছিলেন তিনি কিছুই নন। এ মহিমা বুঝিলাম না।

উপসংহারে এই মাত্র বলিতেছি যে বিষ্ণুপুর দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এক সময়ে বিষ্ণুপুর একটী বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রাচীন দুর্গ এক্ষণে বনাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যদি ইংরাজেরা সেই বন সকল পরিষ্কার করিয়া দুর্গটী সংস্কার করেন তাহা হইলে বঙ্গদেশের একটী আশ্চর্য্য কীর্ত্তি রাখিবেন। মুরসিদাবাদ ও ঢাকা যদিও বাঙ্গালার রাজধানী ছিল কিন্তু মানসিংহের বঙ্গদেশে আসিবার অনেক পূর্ব্ব হইতে বিষ্ণুপুরে স্বাধীন রাজগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন ও তাঁহাদের কীর্ত্তির যে সমস্ত ভগ্নাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বঙ্গ-

দেশের অন্য কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। আশা করি সকলেই বিষ্ণুপুরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে ইচ্ছা করিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সভ্যতার উন্নতি সহকারে নরজাতির শারীরিক পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে কি না।

এই বিষয়ের নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ সভ্যতা কাহাকে বলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া উচিত। আমাদিগের বোধ হয় যে সেই আভাস নিম্ন লিখিতরূপে পাওয়া যাইতে পারে। ইয়োরোপের পশ্চিমাঞ্চলে এক্ষণে যে নরজাতির বাস অর্থাৎ ইংরাজ, ফরাসি, জর্ম্মণ, স্পেনীয়, ও ইটালীয় এই পাঁচ জাতিকে আমরা সভ্যতা-মঞ্চের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে অবিস্থিত বলিয়া জ্ঞান করি। এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার কতিপয় জাতি সেই মঞ্চের অধস্তন শ্রেণী অধিকার করিয়া আছে বলিতে হইবেক! পাঠকবর্গ মনে মনে রাগ করিবেন না যে আমরা স্বজাতি অর্থাৎ হিন্দুজাতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যশ্রেণী মধ্যে পরগণিত করিতে পারিলাম না। তাঁহারা হয়ত মনে মনে ভাবিবেন 'কি আমরা আসল আর্য্যজাতি হইতেছি, আমাদিগের মধ্যে ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির পুরুষরত্ন সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য নহি?" সত্য, কিন্তু ইহার উত্তর এক কথায় হয়, সভ্য যে জাতি, সে কখন পরাধীন হইবার নহে, অথচ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে আমরা অদ্য আটশত বৎসর হইল বৈদেশিকদিগের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছি। এই একটী বিষয়ই আমাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে খাট করিবে। পরাধীন হওয়ার মানে কি? কেবল দুএক যুদ্ধে হারিয়া যাওয়া নহে। তবে কি না, মনের সেই তেজ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়া, যাহাতে করিয়া পরজাতির শাসনে থাকা অপেক্ষা প্রাণ পরিত্যাগ পর্য্যন্ত শ্রেয়স্কর বোধ থাকে। এই বোধ কিংবা এই তেজ দুটী একটী পুরুষের থাকিলে হয় না যদি আপামর সাধারণের স্বভাবসিদ্ধ অন্তঃকরণবৃত্তি তাদৃশ হয়, তাহা হইলে কোন বিজেতা জাতিই তাহাদিগকে করতলগত করিয়া রাখিতে পারে না, অর্থাৎ কোন বিজেতা জাতির পক্ষে তাদৃশ লোকদিগকে শাসন করা পোষায় না। পরজাতির শাসন যাহারা যাহারা করিয়া থাকে, সকলেই কোন কোন